তাওহীদের ডাক

মার্চ-এপ্রিল ২০১০

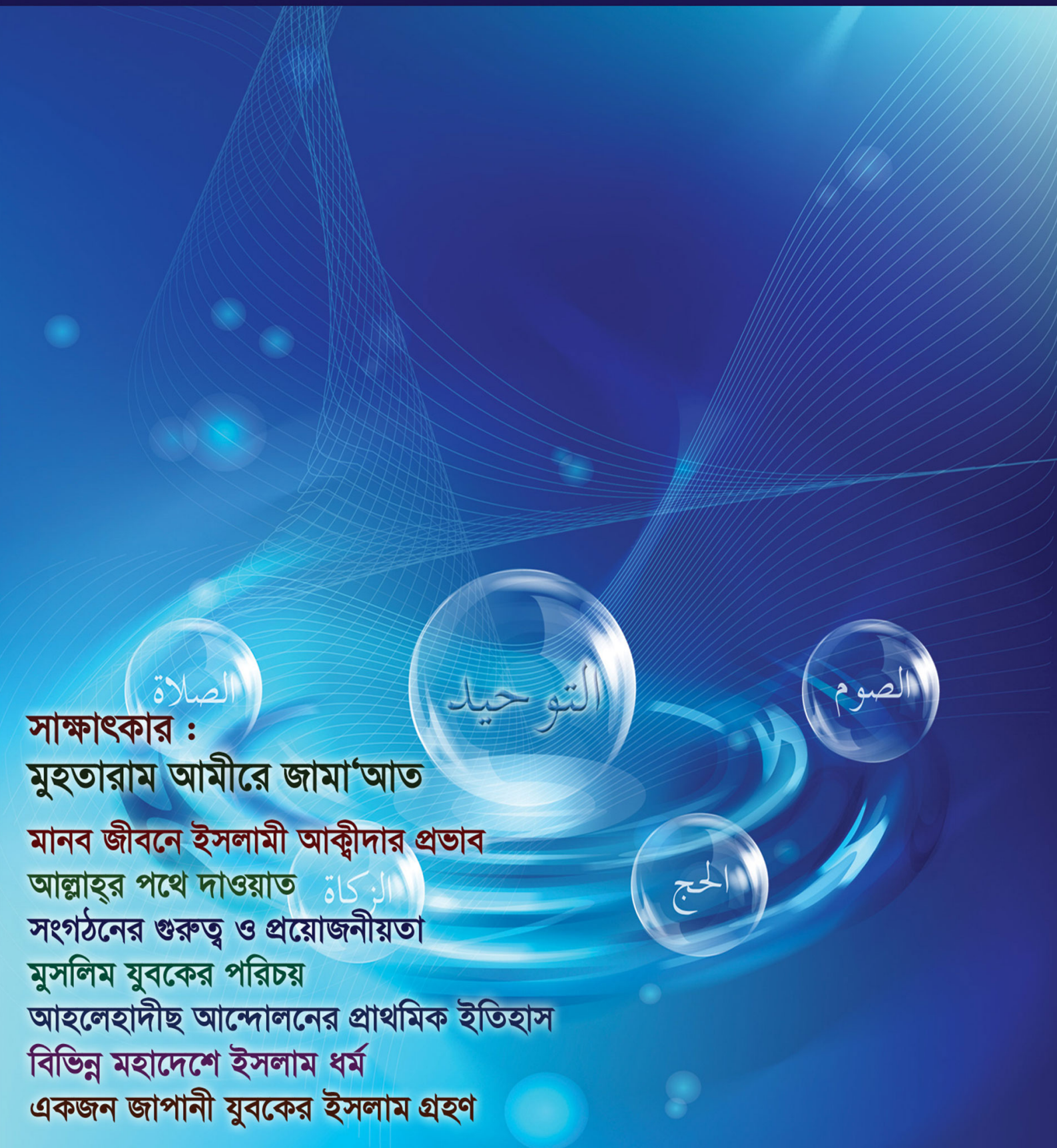

সাক্ষাৎকার :
মুহতারাম আমীরে জামা'আত

মানব জীবনে ইসলামী আক্বীদার প্রভাব
আল্লাহ্র পথে দাওয়াত
সংগঠনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা
মুসলিম যুবকের পরিচয়
আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রাথমিক ইতিহাস
বিভিন্ন মহাদেশে ইসলাম ধর্ম
একজন জাপানী যুবকের ইসলাম গ্রহণ

Contents

তাওহীদের ডাক

৪র্থ সংখ্যা

মার্চ-এপ্রিল ২০১০

উপদেষ্টা সম্পাদক
অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম
সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
মুযাফফর বিন মুহসিন
নির্বাহী সম্পাদক
আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

যোগাযোগ
তাওহীদের ডাক
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩।
ফোন: ০৭২১-৮৬১৬৮৪
মোবাইল: ০১৭৩৭৪৩৮২৩৪
ই-মেইল : tawheederdak@gmail.com
ওয়েব : www.at-tahreek.com/tawheederdak

মূল্য : ১৫ টাকা

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার বিভাগ, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী- ৬২০৩ থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও সোনালী প্রিন্টিং এ্যান্ড প্যাকেজিং, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয়** — ২
- **কুরআন ও হাদীছের পথ-নির্দেশিকা** — ৩
- **আক্বীদা**
  মানব জীবনে ইসলামী আক্বীদার প্রভাব ॥ সানাউল্লাহ নজির আহমদ — ৫
- **তাবলীগ**
  আল্লাহ্র পথে দাওয়াত : গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ॥ আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব — ৮
- **তানযীম**
  সংগঠনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ॥ ড. এ এস এম আযীযুল্লাহ — ১১
- **তারবিয়াত**
  আত্মশুদ্ধি অর্জনে বর্জনীয় বিষয় সমূহ ॥ মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলাম — ১৪
- **তাজদীদে মিল্লাত**
  মুসলিম যুবকের পরিচয় ॥ নূরুল ইসলাম — ১৭
- **আহলেহাদীছ আন্দোলন**
  আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রাথমিক ইতিহাস ॥ ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম — ১৯
- **বিশেষ নিবন্ধ**
  তাওহীদের শিক্ষা ও আজকের সমাজ — ২১
- **সাক্ষাৎকার**
  মুহতারাম আমীরে জামা'আত — ২৬
- **সাময়িক প্রসঙ্গ**
  পার্বত্য চট্টগ্রামে সংঘাত : নাটের গুরু কারা ॥ শেখ আব্দুছ ছামাদ — ৩০
- **ধর্ম ও সমাজ**
  বিভিন্ন মহাদেশে ইসলাম ॥ হোসাইন আল-মাহমূদ — ৩২
- **গ্রন্থ-পর্যালোচনা**
  ইসলাম ও প্রাচ্যবাদ ॥ আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব — ৩৪
- **পরশ পাথর**
  একজন জাপানী যুবকের ইসলাম গ্রহণ — ৩৭
- **ভ্রমণ**
  সৌন্দর্যের লীলাভূমি সিলেটে তিনদিন ॥ মুকাররম বিন মুহসিন — ৩৯
- **শিক্ষাঙ্গন**
  বাংলা অভিধানের কথা ॥ রায়হানুল ইসলাম — ৪২
  The Thief And The Three Homes — ৪৩
- **আলোকপাত** — ৪৫
- **জীবনের বাঁকে বাঁকে** — ৪৬
- **ভিন দেশের চিঠি** — ৪৯
- **কবিতা** — ৫০
- **সংগঠন সংবাদ** — ৫১
- **সাম্প্রতিক মুসলিম বিশ্ব** — ৫২
- **সাধারণ জ্ঞান** — ৫৩
- **আইকিউ** — ৫৬

সম্পাদকীয়

আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে যুবসমাজ

কোন আদর্শ প্রতিষ্ঠায় যুবসমাজ যেমন নির্ভরযোগ্য মাধ্যম, তেমনি সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণে যুবসমাজের উপরই নির্ভর করতে হয়। আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে যুবসমাজের প্রতি গুরুত্বারোপ করার কারণ হল শক্তি ও দায়িত্বের মধ্যে পারস্পরিক সামঞ্জস্যতা। মানবজীবনের প্রতিটি স্তরে এমন কিছু সময় থাকে যা বিশেষ কোন দায়িত্ব পালনের যোগ্য হলেও সব রকমের দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত হয় না। কিন্তু এক্ষেত্রে যুবসমাজই যথোপযুক্ত। যৌবনকাল সীমাহীন আশা-আকাংখা, নিরলস কর্মতৎপরতা এবং রক্তে জোয়ার বয়ে যাবার বয়স। আত্মদান ও আত্মত্যাগের বয়স। গঠন ও সংস্কারসাধন করার বয়স। যৌবনকালকে গুরুত্ব দেওয়ার আরেকটি কারণ হচ্ছে এটা কর্মসংশোধন, চরিত্র গঠন এবং হেদায়াত লাভের উপযুক্ত সময়। বৃদ্ধ বয়সে পূর্ববর্তী কর্ম ও আচার-আচরণ এত শক্তভাবে শিকড় গেড়ে বসে যে, যতই এর বিপরীত সত্য পরিস্ফুট হোক না কেন শত চেষ্টায়ও তা থেকে বের হয়ে আসা দুরূহ হয়ে পড়ে। কিন্তু যৌবনকাল এক্ষেত্রেও এক আদর্শ সময়।

আদর্শ সমাজ গঠনের লক্ষ্যে কঠিন দায়িত্ব পালন ও শক্ত বাধা অপসারণে নিবেদিত যুবকদের হতে হবে স্বতন্ত্র গুণাবলী ও অনুপম বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। ১. তাদেরকে হতে হবে ঈমানী বলে বলীয়ান। এ বল তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি একনিষ্ঠ বিশ্বাসী করবে। শিরক বিমুক্ত খালেছ তাওহীদী চেতনায় উজ্জীবিত পূর্ণাঙ্গ মুমিন হতে সহায়তা করবে। ২. তাদেরকে হতে হবে তাক্বওয়াশীল। কেননা তাক্বওয়া দ্বারা মানুষের মর্যাদা নিরূপিত হয়। এর মাধ্যমে মানুষ সংযমী হয় এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা লাভ করে। তাক্বওয়া মানুষকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করে। ফলে এটা তাকে মর্যাদাশীল পরিপূর্ণ মানুষ তথা ইনসানে কামেলে পরিণত করে। আর তাক্বওয়াহীনতা সমাজে অকল্যাণ ও ধ্বংস ডেকে আনে। তেমনি তাক্বওয়াহীন যুবকও হয় আদর্শহীন। এ ধরনের যুবক সহজেই শয়তানের খপ্পরে পড়ে বিভ্রান্ত হয়, লিপ্ত হয় বিভিন্ন গর্হিত কাজে। ৩. তাদেরকে হতে হবে পর্যাপ্ত ইসলামী জ্ঞানের অধিকারী। এ জ্ঞান তাকে সঠিক পথের দিশা দিবে। ৪. নিজেদের অজ্ঞাত আয়ুষ্কালের ব্যাপারে সচেতন থেকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের নিমিত্তে তাঁর ইবাদতসহ সকল কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন করতে হবে। ৫. আমানতদার হতে হবে। এটা তাদের অর্থনৈতিক জীবনে ইনছাফ ও স্বনির্ভরতা আনয়ন করবে। এর ফলে তারা কোন কাজের দায়িত্ব প্রাপ্ত হলে তা আমানতের সাথে পালন করতে পারবে এবং আর্থিক বিষয়েও বিশ্বস্ততা বজায় রাখতে সক্ষম হবে। এটা সৎ ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র কায়েমে সহায়ক হবে। ৬. তাদেরকে আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকারের কাজে সদা সোচ্চার হতে হবে। মূলতঃ সৎকাজের আদেশ দান ও অসৎকাজে বাধা প্রদানই তাদের মূল দায়িত্ব ও কর্তব্য। এজন্য তাদেরকে সময় ও শ্রম ব্যয় করতে হবে। ৭. তাদেরকে উদ্ভাবনী ক্ষমতা ও প্রতিভা সম্পন্ন হতে হবে। যাতে সমাজকে কিছু দান করার ও সমাজের জন্য কিছু সৃষ্টি করার যোগ্যতা তাদের থাকে। আর এ যোগ্যতা তাদেরকে নেতৃত্বের আসনে বসাবে, কর্মতৎপর ও কর্মঠ করে তুলবে। তাদেরকে অর্পিত দায়িত্ব পালনে তড়িৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ও বিচক্ষণ-বুদ্ধিমান বানাবে। ৮. তাদেরকে ত্যাগী মানসিকতা সম্পন্ন হতে হবে। যাতে প্রয়োজনে জান, মালসহ সবকিছু কুরবানী করার মানসিকতা তাদের মধ্যে তৈরী হয়। এ বিশেষণ তাদেরকে আল্লাহ্র প্রিয় বান্দায় পরিণত করবে। ৯. তাদেরকে উদার নৈতিক আদর্শের মূর্তপ্রতীক হতে হবে। তারা তাদের ঔদার্য দিয়ে সকলকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করবে। কখনও অহংকার ও গোঁড়ামি বা যিদের বশবর্তী হয়ে কোন কাজ করবে না। এটা তাদেরকে সর্বমহলে প্রিয়ভাজন করে তুলবে। ১০. নফসে আম্মারা তথা কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদে লিপ্ত থাকতে হবে। অনর্থক পানাহার, অপ্রয়োজনীয় পোশাক-পরিচ্ছদ ও কথা-বার্তা, নাজায়েয বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ ও অবৈধ জিনিস শ্রবণ থেকে নফসকে বিরত রাখতে হবে। সমাজ সংস্কার ও নির্মাণের পূর্বে নিজের নফস ও ব্যক্তিত্বে সংস্কার নিয়ে আসতে হবে। দুনিয়া হারালেও নিজ নফসের উপর যারা বিজয় অর্জন করতে সক্ষম, তারাই প্রকৃত বিজয়ী। আর যারা দুনিয়া অর্জন করেও নিজ নফসের নিকট পরাজয় বরণ করে তারাই প্রকৃত পরাজিত। ১১. আত্মিক পরিশুদ্ধি অর্জন করতে হবে। অন্তরকে যাবতীয় পাপ-পংকিলতা, শিরক-কুফর, নিফাক, কঠোরতা, নিষ্ঠুরতা থেকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করতে হবে। আর এর উপরেই সমস্ত শরীরের পরিশুদ্ধতা নির্ভরশীল।

দেশ ও জাতি আজ তাকিয়ে আছে এমন কিছু যুবকের দিকে যারা সমাজ সংস্কারে ব্রতী হবে, দেশ ও জাতির কল্যাণে অবদান রাখবে। আমাদের যুবসমাজ উপরোক্ত গুণাবলী অর্জনে সক্ষম হলে জাতির সেই আশা-আকাংখা পূরণ হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের যুবসমাজকে এসব গুণাবলী সম্পন্ন হওয়ার তাওফীক্ব দান করুন।

তাওহীদের ডাক এ মহান লক্ষ্য নিয়েই এগিয়ে চলেছে। প্রথম সংখ্যা প্রকাশ করার পর সর্বমহল থেকে আমরা ব্যাপক সাড়া পেয়েছি। সবাই এটির উত্তরোত্তর উন্নতি-অগ্রগতি ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য জোর তাকিদ দিয়েছেন। সকলের আন্তরিক সহযোগিতায় আমরা এর গতিকে অব্যাহত রাখার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করছি। আল্লাহ আমাদের এ প্রত্যাশাকে কবুল করুন-আমীন!

আমলে ছালেহ (সৎ আমল)

আল-কুরআনুল কারীম

১– وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ–

১. ‘আর যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, তারা জান্নাতের অধিবাসী। তারা সেখানে হবে স্থায়ী’ *(বাকারাহ ৮২)*।

২– إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيْهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيْمَانِهِمْ–

২. ‘নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে, তাদের রব ঈমানের কারণে তাদেরকে পথ দেখাবেন’ *(ইউনুস ৯)*।

৩– وَالْعَصْرِ– إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ– إِلَّا الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ–

৩. ‘মহাকালের শপথ! মানুষ অবশ্যই ক্ষতিতে আছে। তবে তারা ব্যতীত যারা ঈমান আনে, সৎকাজ করে, পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় এবং পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দেয়’ *(আছর ১-৩)*।

৪– مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كانُوْا يَعْمَلُوْنَ –

৪. ‘যে মুমিন অবস্থায় নেক আমল করবে, পুরুষ হোক বা মহিলা,আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং তারা যা করত তার তুলনায় অবশ্যই আমি তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেব’ *(নাহল ৯৭)*।

৫– الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَياةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا–

৫. ‘যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন যাতে তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন যে, কে তোমাদের মধ্যে আমলের দিক থেকে উত্তম’ *(মুলক ২)*।

৬– قُلْ يا قَوْمِ اعْمَلُوْا عَلَى مَكانَتِكُمْ إِنِّيْ عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ مَنْ تَكُوْنُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُوْنَ –

৬. ‘বল, হে আমার কওম, তোমরা তোমাদের অবস্থানে থেকে কাজ কর, নিশ্চয় আমিও কাজ করছি। অচিরেই তোমরা জানতে পারবে কার জন্য হবে আখিরাতের পরিণতি। নিশ্চয় যালিমরা সফল হয় না।’ *(আন‘আম ১৩৫)*।

৭– وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِيْ ارْتَضى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً–

৭. ‘তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে আল্লাহ তাদেরকে এ মর্মে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি নিশ্চিতভাবে তাদেরকে যমীনের প্রতিনিধিত্ব প্রদান করবেন, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব প্রদান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদের এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য শক্তিশালী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দ্বীনকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তিনি তাদের ভয়-ভীতি শান্তি-নিরাপত্তায় পরিবর্তিত করে দেবেন’ *(মুজাদালাহ ১১)*।

৮– وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمى وَالْبَصِيْرُ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيْلًا مَا تَتَذَكَّرُوْنَ–

৮. ‘আর সমান হয় না অন্ধ ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন এবং যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আর যারা অপরাধী। তোমরা খুব সামান্যই উপদেশ গ্রহণ করে থাক’ *(মু’মিন ৫৮)*।

৯– مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ–

৯. ‘যে সৎকর্ম করে সে তার নিজের জন্যই তা করে এবং যে মন্দকর্ম করে তা তার উপর বর্তাবে। তারপর তোমরা তোমাদের রবের প্রতি প্রত্যাবর্তিত হবে’ *(জাসিয়া ১৫)*।

১০– فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَّرَهُ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ –

১০.‘অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখতে পাবে’ *(যিলযাল ৭-৮)*।

হাদীছে নববী

১– إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، عن عمر بن الخطّاب–

১. রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘নিয়তের উপর সমস্ত আমল নির্ভর করে’ *(মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/১)*।

২–إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلاَمَهُ ، فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ ، وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ بِمِثْلِهَا حَتَّى يَلْقَى اللهَ عَزَّوَجَلَّ، عن ابي هريرة–

২. রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘যখন তোমাদের কেউ উত্তমরূপে মুসলিম হয় তখন প্রতিটি সৎকাজ যা সে করে থাকে, তার দশগুণ হতে সাত শত গুণ পর্যন্ত তার জন্য লেখা হয়ে থাকে। আর অসৎকাজ যা সে করে থাকে, তার অনুরূপই (অর্থাৎ এক গুণ) লেখা হয় যে পর্যন্ত না সে আল্লাহর দরবারে পৌঁছে যায়’ *(মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/৪৪)*।

৩- إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا اِسْتَعْمَلَهُ ، قِيلَ : كَيْفَ يَسْتَعْمِلُهُ ؟ قَالَ : يُوَفِّقُهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ قَبْلَ الْمَوْتِ، عن أنس–

৩. রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘আল্লাহ যখন কোন বান্দার কল্যাণ কামনা করেন তখন তাকে ভালো কাজে নিয়োজিত করেন। জিজ্ঞাসা করা হল, হে রাসূল (ছাঃ)! কিভাবে তার দ্বারা ভাল কাজ করান? তিনি বললেন, মৃত্যুর পূর্বে তাকে ভাল কাজ করার তাওফীক দান করেন’ *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫২৮৮, সনদ ছহীহ)*।

৪– وَأَنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا ، وَإِنْ قَلَّ ، عن عائشة –

৪. রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমল তা-ই যা নিয়মিত করা হয়, যদিও তা পরিমাণে কম হয়’ *(মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/১২৪১)*।

৫–جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ ؟ فَقَالَ : طُوْبَى لِمَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : أَنْ تُفَارِقَ الدُّنْيَا وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِنْ ذِكْرِ اللهِ ، عن عبد الله بن يسر–

৫. একদা এক বেদুঈন রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করল- সর্বপেক্ষা উত্তম ব্যক্তি কে? রাসূল (ছাঃ) বলেন, তার জন্যই উত্তম পরিণাম যার হায়াত দীর্ঘ হয়েছে এবং আমল নেক হয়েছে। অতঃপর সে বলল, কোন আমল সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি দুনিয়া ত্যাগ করবে এমতাবস্থায় যে, তোমার জিহ্বা আল্লাহর যিকিরে সিক্ত থাকবে’ *(আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২২৭০, সনদ ছহীহ)*।

٦- إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ ، وَأَمْوَالِكُمْ ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوْبِكُمْ ، وَأَعْمَالِكُمْ ، عن ابي هريرة-

৬. রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের বাহ্যিক আকৃতি ও সম্পদের প্রতি দেখেন না; বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও আমলের দিকে তাকান' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩১৪)*।

٧- بَادِرُوْا بِالْأَعْمَالِ فِتَناً كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِناً وَيُمْسِيْ كَافِراً ، وَيُمْسِيْ مُؤْمِناً وَيُصبِحُ كَافِراً ، يَبِيْعُ دِيْنَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا، عن أبي هريرة-

৭. রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা নেক আমলের দিকে দ্রুত অগ্রসর হও ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত্রির অংশ সদৃশ ফিতনায় পতিত হওয়ার পূর্বেই। যখন কোন ব্যক্তি ভোরে উঠবে ঈমানদার হয়ে এবং সন্ধ্যা করবে কুফরী অবস্থায় এবং সন্ধ্যা করবে মু'মিন অবস্থায় আর ভোরে উঠবে কাফের হয়ে। সে পার্থিব সামান্য সম্পদের বিনিময়ে নিজের দ্বীন ও ঈমানকে বিক্রি করে দিবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩৮৩)*।

٨- إِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ ، وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيْمِ، عن سهل بن سعد-

৮. রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কোন বান্দা জাহান্নামীদের মত কাজ করতে থাকে, অথচ সে জান্নাতের অধিবাসী, এভাবে কোন বান্দা জান্নাতীদের মত কাজ করতে থাকে অথচ সে জাহান্নামের অধিবাসী। বস্তুতঃ মানুষের আমল তার 'খাতেমা' বা সর্বশেষ অবস্থানের উপর নির্ভর করে' *(মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/৮৩)*।

٩- مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ ، فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ ، وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ ، وَيَنظُرُ بَيْنَ يَدَيهِ فَلا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلقَاءَ وَجْهِهِ ، فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَو بِشِقِّ تَمْرَةٍ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، عن عديّ بن حاتم-

৯. রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার সাথে তোমাদের রব কথা বলবেন না। তার ও তার রবের মাঝে কোন দোভাষী থাকবে না। সে তার ডানে তাকাবে, তখন পূর্বে প্রেরিত আমল ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। আবার বামে তাকাবে তখনও পূর্বে প্রেরিত আমল ছাড়া আর কিছুই দেখতো পাবে না। আর সম্মুখে তাকালে জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। সুতরাং খেজুরের বিনিময়ে হলেও জাহান্নাম থেকে বাচার চেষ্টা কর। অন্য বর্ণনায় এসেছে, একটি উত্তম কথা দিয়ে হলেও বাঁচার চেষ্টা কর' *(মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫৫০)*।

١٠- سَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا فَإِنَّ صَاحِبَ الْجَنَّةِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمَلٍ وَإِنَّ صَاحِبَ النَّارِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمَلٍ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص-

১০. রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা সত্য পথে অটল থাক এবং আল্লাহর নৈকট্যলাভের চেষ্টা কর। কেননা জান্নাতী ব্যক্তির অন্তিম কাজ জান্নাতীদের কাজই হবে, (পূর্বে) সে যে আমলই করে থাকুক না কেন। এভাবে জাহান্নামী ব্যক্তির অন্তিম আমল জাহান্নামীদের মতই হবে, (পূর্বে) সে যে আমলই করে থাকুক না কেন' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৯৬, সনদ ছহীহ)*।

বিদ্বানদের কথা

- আলী (রাঃ) বলেন, দুনিয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যাচ্ছে, আর আখেরাতের জীবন সামনে এগিয়ে আসছে। উভয়ের রয়েছে নিজ নিজ সন্তানাদি। তোমরা আখেরাতের সন্তান হও, দুনিয়ার নয়। কেননা আজ আমলের সময়, এখানে কোন হিসাব নেই। আর আগামী কাল হিসাব-নিকাশ হবে, সেখানে কোন আমল নেই *(বুখারী, মিশকাত হা/৫২১৫)*।

- হাসান (রাঃ) বলেন, ঈমান কোন প্রদর্শনযোগ্য অলংকার নয়, নয় কোন আকাংখার বস্তু। ঈমান হল তা-ই যা অন্তর পোষণ করে এবং আমল যা সত্যায়ন করে। যে ব্যক্তি সুন্দর কথা বলে কিন্তু অসৎ আমল করে আল্লাহ তাকে তার কথার দিকে ফিরিয়ে দেবেন। আর যে ব্যক্তি সুন্দর কথা বলে এবং আমলও সৎ করে আল্লাহ তাকে তার আমলের দ্বারা মর্যাদাবান করবেন। আল্লাহ এটাই কুরআনে বলেছেন 'তাঁরই দিকে আরোহণ করে সৎবাক্য এবং সৎকর্ম তাকে সমুন্নত করে'। *(ফাতির ১০) (খত্বীব বাগদাদী, ইকতিযাউল ইলমি ওয়াল আমাল, পৃঃ ৪৩)*।

- ইবনু শিহাব যুহরী বলেন, মানুষ ঐ ব্যক্তিকে পছন্দ করে না যে জ্ঞান অর্জন করেছে অথচ সে অনুযায়ী আমল করে না এবং যে ব্যক্তি আমল করে অথচ জ্ঞান রাখে না *(ঐ, পৃঃ ২৫)*।

- হাফসাহ বিন সীরীন বলতেন, হে যুবকরা! তোমরা আমল কর। যৌবন বয়সই আমলের প্রকৃত সময় *(ঐ, পৃঃ ১০৯)*।

- মালিক বিন দীনার বলেন, যে জ্ঞান অর্জন করা হয় আমল করার জন্য, তা জ্ঞানীকে অবনত করে। আর যে জ্ঞানার্জনে আমলের লক্ষ্য থাকে না, তা কেবল অহংকারই বৃদ্ধি করে *(ঐ, পৃঃ ৩৩)*।

- ফুযায়েল বলেন, কুরআন নাযিল করা হয়েছে আমল করার জন্য কিন্তু মানুষ কেবল তা পাঠ করাকেই আমল মনে করে নিয়েছে। বলা হল, এখানে আমল অর্থ কি? তিনি বললেন, সেখানে যা হালাল করা হয়েছে তা হালাল করা, যা হারাম করা হয়েছে তা হারাম করা, যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা পালন করা, যা নিষেধ করা হয়েছে তা থেকে বিরত থাকা এবং আশ্চর্যজনক ঘটনাসমূহে বিশ্বাস স্থাপন করা *(ঐ, পৃঃ ৭৬)*।

- ফুযায়েল বিন আয়ায বলেন, একজন আলেম ব্যক্তি জাহেলই থেকে যায় যদি না সে ইলম অনুযায়ী আমল করে, যখন সে আমল করা শুরু করে তখনই তাকে আলেম বলা যায় *(ঐ, পৃঃ ৩৭)*।

- আবু আব্দুল্লাহ আর-রাওযাবারী বলেন, ইলম আমলের উপর নির্ভরশীল, আমল নির্ভরশীল ইখলাছের উপর। আর ইখলাছের মাধ্যমেই মানুষ আল্লাহ সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধি লাভ করে *(ঐ, পৃঃ ৩২)*।

- মা'রূফ কারখী বলেন, যখন আল্লাহ কারো কল্যাণ চান তখন তার আমলের দরজা খুলে দেন এবং বিতর্কের পথ বন্ধ করে দেন। আর যখন আল্লাহ কারো খারাপ চান তখন তার জন্য বিতর্ক করার রাস্তা খুলে দেন এবং আমলের দরজা বন্ধ করে দেন *(ঐ, পৃঃ ৭৯)*।

সারবস্তু

১. ঈমানের বাহ্যিক প্রকাশ হল আমলে ছালেহ ।

২. আমলে ছালেহ আল্লাহ্‌র ভালবাসা ও সন্তুষ্টি লাভের উপায়।

৩. আল্লাহ মানুষের পরীক্ষা নেন আমলের শ্রেষ্ঠত্ব যাচাইয়ের জন্য।

৪. উত্তম আমলের মাধ্যমেই মানুষ জান্নাতে চিরস্থায়ী বসবাসের সৌভাগ্য লাভ করবে।

৫. সর্বশেষ আমলের উপর ভিত্তি করেই মানুষের জান্নাত ও জাহান্নাম নির্ধারিত হবে।

৬. কিয়ামতের কঠিন দিনে দুনিয়াতে কৃত আমলে ছালেহই হবে মানুষের একমাত্র সম্পদ।

৭. আমল হল জ্ঞানী ব্যক্তির জ্ঞানের মানদণ্ড।

৮.নিয়মিত যেকোন আমলই সর্বশ্রেষ্ঠ আমল, যদিও তা পরিমাণে স্বল্প হয়।

৯.আমলে ছালেহের মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত হয়।

১০. আমলে ছালেহের মাধ্যমে ঈমানদারগণকে আল্লাহ দুনিয়াবী ক্ষমতা ও কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত করবেন।

মানব জীবনে ইসলামী আক্বীদার প্রভাব

সানাউল্লাহ নজির আহমদ

ইসলামী আক্বীদার রয়েছে এক বর্ণাঢ্য ইতিহাস, যা অন্য কোনো ইজম বা বিশ্বাসের নেই। এ আক্বীদা ক্ষণিকের মধ্যেই ঘুরিয়ে দিয়েছে মানুষের গতিপথ, পাল্টে দিয়েছে তাদের জীবনযাত্রার পদ্ধতি। মুহূর্তে উন্নীত করেছে পৌত্তলিকতা থেকে একত্ববাদে, কুফর থেকে ইসলামে। মুক্ত করেছে মানুষের আনুগত্য আর দাসত্ব থেকে।

ইসলামী আক্বীদার মৌলিক দিকগুলো হচ্ছে : আল্লাহ, ফেরেশতা, আসমানী কিতাব, রাসূল, পরকাল ও তাক্বদীরের ভাল-মন্দের প্রতি বিশ্বাস। বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে আমরা মানব জীবনে এ আক্বীদার প্রভাব ও তার কার্যকারিতা সম্পর্কে আলোচনার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

মুসলিম জাতির ওপর আল্লাহ্র অশেষ করুণা যে, তিনি তাদের মনোনীত ধর্মের একটি সমৃদ্ধ ইতিহাস দান করেছেন। যে কারণে এ ধর্ম ও তার আক্বীদা কিছু প্রতীকী আনুষ্ঠানিকতা আর ধারণাপ্রসূত বিধি-বিধানে আবদ্ধ নয়; বরং ঐতিহাসিক সত্যতা নির্ভর দীপ্যমান এক মহা জীবনাদর্শ।

এ কথা কারো কাছে অস্পষ্ট নেই যে, মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি, আবার মানুষের মধ্যে সে–ই উত্তম যে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত। এ উত্তম কাজটি সম্পাদন করার জন্য যুগে যুগে বিভিন্ন ব্যক্তি নিজ নিজ জ্ঞান, ধর্ম, মত ও পরিসরের মধ্যে থেকে নানাভাবে প্রচেষ্টা চালিয়েছে। যা কখনো সফলতা বয়ে এনেছে, কখনও বা হিতে বিপরীত হয়েছে। এদিক থেকে ইসলামের কোনো জুড়ি নেই। কারণ ইসলাম মানব কল্যাণের জন্য পরিকল্পিত, নিখুঁত ও সুন্দর একটি বিধান দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা সর্বোত্তম উম্মত, যাদেরকে মানুষের (কল্যাণের) জন্য বের করা হয়েছে। তোমরা ভাল কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে, আর আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে। যদি আহলে কিতাব ঈমান আনত, তবে অবশ্যই তা তাদের জন্য কল্যাণকর হত। তাদের কতক ঈমানদার। আর তাদের অধিকাংশই ফাসিক' *(আলে ইমরান ১১০)*।

ইসলাম একমাত্র ধর্ম যার আদ্যপান্ত কল্যাণ আর কল্যাণ। কী ইহকালীন কী পরকালীন, কী শারীরিক, কী আত্মিক সব বিষয়ে ও সর্বক্ষেত্রে তার রয়েছে মানব কল্যাণের জন্য বিশুদ্ধ আক্বীদা, নিশ্চিত সিদ্ধান্ত ও সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা। যার মূল হচ্ছে কুরআন ও হাদীছ। এরই উপর পরিচালিত হয়েছেন মুসলিম মিল্লাতের প্রথম কাফেলা ছাহাবায়ে কেরাম। এঁরাই হলেন মানব ইতিহাসের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান। তারা নিজ জীবনে কুরআন ও সুন্নাহ বাস্তবায়ন করেছেন, প্রভাবিত হয়েছেন তাতে বর্ণিত আক্বীদা ও বিশ্বাসে। তাই মানবীয় জীবনে ইসলামী আক্বীদার প্রভাব প্রত্যক্ষ করার জন্য উম্মতের প্রথম সারির মানুষদের জীবনাচার ও কর্মধারা পর্যালোচনা করাই যথেষ্ট হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

তাওহীদ : এটি ইসলামী আক্বীদার মূল ভিত্তি। ইতিহাস পর্যালোচনার মাধ্যমে আমাদের নিকট স্পষ্ট হয়েছে যে, মানব জীবনে সবচেয়ে বেশী প্রভাব সৃষ্টিকারী হচ্ছে এ তাওহীদ। এ আক্বীদা গ্রহণকারী একজন মানুষ যে পরিমাণ ত্যাগ ও কঠিন কর্ম সম্পাদন করতে পারে, তা এ আক্বীদাশূন্য অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয়। তবে তাওহীদের প্রভাব সে ব্যক্তির মধ্যেই বিকশিত হবে, যে একে আলিঙ্গন করবে এবং এর রঙে রঙিন হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একটি ব্যাটারী বিদ্যুৎ থেকে যে পরিমাণ চার্জ সংগ্রহ ও ধারণ করতে পারবে, সে সে পরিমাণ-ই দায়িত্ব পালন করতে পারবে। এটাই খাঁটি তাওহীদে বিশ্বাসী একজন পূর্ণ ঈমানদার ব্যক্তির উদাহরণ। যে ব্যক্তি ইসলামী আক্বীদা থেকে শক্তি সঞ্চয় করে এবং প্রাণবন্তভাবে নিজ দায়িত্ব পালন করে, সেই হচ্ছে শাশ্বত দীক্ষায় দীক্ষিত প্রকৃত মুসলমান।

ইসলাম তার প্রথম যুগের অনুসারীদের দ্বারা যে দৃষ্টান্ত পেশ করেছে, তা সমগ্র মানব ইতিহাসে বিরল ও দুর্লভ। যা শুধু আবুবকর, ওমর, ওছমান, আলী কিংবা এদের মত উজ্জ্বল কতক নক্ষত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, যদিও তারা গৌরবময় মানব ইতিহাসের মধ্যমণি। তদুপরি তারা ছাড়াও হাযার ব্যক্তি ও উদাহরণ বিদ্যমান রয়েছে। ইতিহাস যাদের উপাখ্যান লিপিবদ্ধ করতে অক্ষম–অপরাগ। বোধ করি এ কারণেই ঐতিহাসিকগণ এ জাতির সমৃদ্ধ ইতিহাস আদ্যপান্ত লিপিবদ্ধ করার পরিবর্তে শুধু ইশারা-ইঙ্গিতের মাধ্যমে এক পর্বে থেকে অন্য পর্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছে। তাদের দৃষ্টিতে এ আকীদার উর্বর ভূমি থেকে এ ধরনের অস্বাভাবিক দৃষ্টান্ত বিকশিত হওয়া স্বাভাবিক নিয়মে পরিণত হয়েছিল। যেমন দেখা যায়- একজন মুজাহিদকে যিনি আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদের জন্য নিজ হাতে বিদ্যমান কয়েকটি খেজুর এ বলে ফেলে দিয়েছিলেন, 'এগুলো খাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা আমার জন্য দীর্ঘ জীবনের আশা করা বৈকি'। অতঃপর তা নিক্ষেপ করে শাহাদাতের অদম্য স্পৃহায় যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েন। একপর্যায়ে শাহাদাতের স্বর্গীয় সুধা পান করে পার্থিব জীবনের ইতি টানেন।

যানবাজ আরেক লড়াকু মুজাহিদ যিনি পারস্যের মোকাবিলায় জিহাদের জন্য বর্ম পরিধান করেন, অন্য সাথীরা বর্মে ছিদ্র দেখে সাবধান করে তা পাল্টাতে বললেন। উত্তরে তিনি হেসে বলে বললেন, এ ছিদ্রজনিত আঘাতে মারা গেলে অবশ্যই আমি আল্লাহ্র কাছে আদৃত হব। এরপর বিলম্ব না করে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সে ছিদ্র দিয়ে হঠাৎ আঘাত হানে একটি তীর, ফলে সহাস্যবদনে সেখানেই তিনি শাহাদাতকে আলিঙ্গন করেন। শাহাদাতের স্বতঃস্ফূর্ত আলিঙ্গনে এভাবেই তিনি আল্লাহ্র পানে ছুটে চলেন।

মানব কল্যাণ, পরার্থপরতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার বিবিধ ক্ষেত্রে এরূপ অনেক নযীর রয়েছে, যা অন্য আক্বীদায় বিশ্বাসী কোন মানুষের মধ্যে পাওয়া যায় না। ইতিহাস এমন নযীর গড়তে ব্যর্থ হয়েছে বারবার।

এ পর্যায়ে আমরা মুসলিম উম্মাহর জীবন থেকে নেয়া কয়েকটি ঘটনার মাধ্যমে এ আক্বীদার প্রভাব ও কার্যকারিতা সম্পর্কে আলোচনা করব। প্রসঙ্গত: যারা একে প্রত্যাখ্যান করেছে, তারাও যে এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, সে ব্যাপারেও কিছু উল্লেখ করার চেষ্টা হল।

১. ইসলামী আক্বীদার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হচ্ছে, আল্লাহভীতি ও ক্বিয়ামত দিবসের বিশ্বাস। এর ফলে স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ হয়, সর্বক্ষেত্রে আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং নিজ দায়িত্ববোধ সদা জাগ্রত থাকে। উদাহরণস্বরূপ ওমর (রাঃ)–এর কথা উল্লেখ করা যায়, তিনি ছিলেন খলীফাতুল মুসলিমীন। তিনি আল্লাহভীতি ও নিজ দায়িত্ববোধ থেকে বলেছিলেন, 'ইয়ামানের সানআ'তেও যদি কোন গাধার পা পিছলে যায়, তাহলে সে ব্যাপারে আমিই দায়ী, কেন তার রাস্তা সমতল করে দেইনি।'

২. এ আক্বীদায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা নিজ জান ও মালের মাধ্যমে আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদের যে নমুনা পেশ করেছেন, তার দৃষ্টান্তও বিরল। এর

ওপর নির্ভর করেই জগৎ সংসারে ইসলাম প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। সামান্য অস্ত্র ও সীমিত জনবল দিয়েই বিপুল অস্ত্রে-শস্ত্রে সজ্জিত, দ্বিগুণ–তিনগুণ বেশী শত্রু বাহিনীর মোকাবিলায় অবিশ্বাস্য বিজয় অর্জন করেছেন।

৩. এ আক্বীদায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ন্যায়ের পক্ষে ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম করেছেন, তারই সুবাদে এক সময় এ বসুন্ধরার সর্বত্র নিরাপত্তাময় পরিবেশ বিরাজমান ছিল।

৪. সামাজিক নিরাপত্তামূলক তহবিল গঠন। এ আক্বীদায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা সামাজিক নিরাপত্তামূলক তহবিল গঠন করেছেন। যার ফলে পরস্পরের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে, সহযোগিতার বন্ধন সুদৃঢ় হয়েছে। ঐক্য ও সম্মিলিত শক্তি বিনষ্টকারী মানবিক ব্যাধি হিংসা-বিদ্বেষমুক্ত সমাজ গঠন সম্ভব হয়েছে। পরার্থপরতা ও সহমর্মিতার সুবাতাস বয়ে বেড়িয়েছে পুরো ইসলামী সমাজে। যা আমরা বর্তমানে প্রত্যক্ষ করি বিভিন্ন কল্যাণমূলক কাজের জন্য ওয়াকফকৃত দান–অনুদানের ভেতরে।

৫. পারস্পরিক চুক্তির যথাযথ সংরক্ষণ। মুসলিম উম্মাহ এ ব্যাপারে যতটুকু এগিয়ে পূর্ণ মানব ইতিহাসে তার কোন দৃষ্টান্ত নেই ।

৬. ধরাপৃষ্ঠে ইনছাফের পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন। যা কোন জাতির ইতিহাসে বিদ্যমান নেই। তারা স্বজনপ্রীতি ও সর্বপ্রকার স্বার্থের ঊর্ধ্বে থেকে গরীব-ধনী, ছোট-বড়, মুসলিম-অমুসলিমদের মাঝে যে ন্যায়বিচার ও ইনছাফ প্রতিষ্ঠা করেছে, তার কোন দৃষ্টান্ত ইতিহাস আজও পর্যন্ত পেশ করতে পারেনি।

৭. ইসলামী রাষ্ট্রের অধীন অমুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতার হেফাযত। তারা অমুসলিমদের ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক যে স্বাধীনতা প্রদান করেছেন, তার নজির খোদ অমুসলিম রাষ্ট্রেও অনুপস্থিত।

৮. ইসলামী সমাজের আদর্শ ও ভাবমূর্তির যথাযথ সংরক্ষণ। ইসলামী সমাজে মাদকদ্রব্য, অনৈতিক কার্যকলাপের কোন প্রশ্রয় নেই। যে কারণে ইতিহাস সাক্ষ্য দিতে বাধ্য, মুসলিম সমাজে অন্য যে কোন সমাজের তুলনায় অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার উপস্থিতি ছিল একেবারেই গৌণ। নীতি–নৈতিকতা বিবর্জিত বর্তমান পাশ্চাত্য বিশ্ব যেসব মরণব্যাধি, যেমন এইডস, গণরিয়া, সিফিলিস ইত্যাদিতে আক্রান্ত, তার সিকি ভাগও মুসলিম সমাজে বিদ্যমান নেই। যদি কোথাও তার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, তাও তাদের অনুসরণে অভ্যস্ত, তাদের শিক্ষায় শিক্ষিত পরিবার ও সমাজে সীমাবদ্ধ।

৯. ইসলামী আক্বীদায় বিশ্বাসী মুসলিম জাতির মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক কর্মচাঞ্চল্যতার বৃদ্ধি ঘটে। যার প্রমাণ ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় স্বল্পতম সময়ে বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রসার। সঙ্গে সঙ্গে আরবী ভাষারও বিস্তার।

১০. ইসলামী আক্বীদায় বিশ্বাসী জাতির মধ্যে জ্ঞান আহরণ প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। যার প্রমাণ মুসলিম জাতির কুরআন ও হাদীছের ব্যাপক চর্চা। আরো প্রমাণ, তাদের বিজ্ঞানকে থিওরিগত বিদ্যা থেকে বের করে বাস্তব ও অভিজ্ঞতাপূর্ণ বিদ্যায় রূপান্তরকরণ। তাদের আবিষ্কার ছিল বাস্তবভিত্তিক, বস্তুনিষ্ঠ ও প্রমাণিত। ব্যক্তি ও দার্শনিকদের নিয়ন্ত্রিত দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

১১. এ আক্বীদার ফলে বিশ্বব্যাপী ইসলামী সভ্যতার আন্দোলন ঘটে। যে আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শারীরিক ও আত্মিক সাধনার মধ্যে সমন্বয় ঘটানো। ইহকাল ও পরকালের মাঝে যোগসূত্র স্থাপন করা।

১২. বিশ্বময় দেশ ও জাতির মধ্যে ঐক্যের সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করা। যার মূলভিত্তি ছিল এক আল্লাহ্র ওপর বিশ্বাস। তার মধ্যে ছিল না কোন ভাষা, বংশ ও জাতির ভেদাভেদ। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, তারা এক দেশ থেকে অন্য দেশে বিচরণ করেছে, তাতে ছিল না কোন বাধা, ভিসা কিংবা নিরাপত্তার নামে অন্য কোন হয়রানি। তাদের মধ্যে ছিল না কোন পরদেশির ভাবনা। অথচ তাদের সরকার ভিন্ন, দেশ ভিন্ন। আবার কোন কোন দেশের সঙ্গে রাজনৈতিক বিরোধ থাকলেও এক আক্বীদার ফলে পরস্পরের মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন অটুট ছিল।

এ হ'ল ইসলামী আক্বীদায় গঠিত ও এর রঙে রঙ্গিন মুসলিম জাতির বর্ণিল ইতিহাস। ইসলামী সমাজের সামান্য নমুনা। সংক্ষেপে বলতে পারি, এ আক্বীদার দ্বারা এমন একটি জাতি তৈরি হয়, যারা হয় বিশ্বস্ত –আমানতদার, সৎ-নীতিবান, আল্লাহভীরু ও মানবতার কল্যাণকামী। আরো একটু ব্যাপক করে বলা যায়, তারা আল্লাহ্র খাঁটি আবেদ–আনুগত্যশীল, তারা নিজ কর্ম, চিন্তা-চেতনা, বোধ ও অনুভূতিতে আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণকারী। পূর্ণ তৃপ্তির সঙ্গে উচ্চারণ করে, إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. لَا شَرِيْكَ لَهُ 'নিশ্চয় আমার ছালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ আল্লাহর জন্য, যিনি সকল সৃষ্টির রব, তাঁর কোনো শরীক নেই' *(আন'আম ১৬২-৬৩)*।

যে ব্যক্তি জাগতিক চাহিদার ওপর আপন নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম; প্রতিমা ও দেবদেবীর পূজা-অর্চনা ত্যাগ করে এক আল্লাহ্র এবাদত–আনুগত্যে আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম; স্বীয় চাল-চলন, চিন্তা-গবেষণা ও পার্থিব জগতের উন্নয়নে বোধ-বুদ্ধির ভারসাম্য রক্ষায় যত্নশীল, একমাত্র সে-ই পারে আল্লাহর সন্তুষ্টিকে পাথেয় বানাতে।

অমুসলিমদের ওপর ইসলামী আক্বীদার প্রভাব :

যারা ইসলামী আক্বীদা গ্রহণ করেনি; বরং বিরোধিতা করেছে সর্বতোভাবে, ক্রুসেডসহ অন্যান্য যুদ্ধে ইসলাম ও মুসলমানদের ওপর বারবার পৈশাচিক ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে, সেই পশ্চিমা গোষ্ঠীর ইসলাম ও মুসলমান থেকে শিক্ষণীয় কিছু বিষয় উল্লেখ করছি।

মধ্যযুগের পতনোন্মুখ ইউরোপ আন্তর্জাতিক নিয়ম-নীতি সম্পর্কে ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞ। মানুষের অন্তরাত্মায় ক্ষমতাসীন রাজত্বের প্রভাব ও মহিমা ধরে রাখতে সরকার ও পুরোহিতগণ গলদঘর্ম হচ্ছিল। রাজ্যগুলো ছিল প্রদেশ কেন্দ্রিক, খণ্ড-খণ্ড। নিজেদের মাঝে ছিল না কোন মিলন সূত্র। অথচ সম্পূর্ণটাই ছিল খৃষ্টরাজ্য। কারণ প্রাদেশিক সরকার নিজ রাজত্বে স্বতন্ত্রভাবে রাষ্ট্রীয় ও বিচার-বিভাগীয় আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নসহ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ছিল।

এরই মধ্যে তাদের সুযোগ হয় ইসলাম ও মুসলমানদের সঙ্গে সরাসরি দেখা-সাক্ষাতের ও আদান-প্রদানের। কখনো সন্ধির ফলে, যেমন মুসলিম স্পেন, উত্তর আফ্রিকা, সিসিলি দ্বীপ ও অন্যান্য দেশের সাথে। আবার কখনো যুদ্ধের ফলে, যেমন ক্রুসেড। এ ধরনের শান্তিচুক্তি ও যুদ্ধের ফলে ইউরোপ ইসলামের সংস্পর্শে আশার সুযোগ লাভ করে। তাদের আরো সুযোগ হয় ইসলাম সম্পর্কে জানার ও পর্যালোচনা করার। তারা কিভাবে ইসলাম সম্পর্কে জেনেছে ও ইসলাম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, নিম্নে তার কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হল :

১. ইসলামের সংস্পর্শে এসে ইউরোপ ইসলাম সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা লাভ করে। তারা স্বয়ং সাইন্টিফিক গবেষণায় ইসলামের প্রায়োগিক পদ্ধতি উদ্ভাবন ও অবলম্বন করে। তার উপর ভিত্তি করেই তাদের বর্তমান বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষতা।

২. তারা ইউরোপকে এক ও ঐক্যবদ্ধ রাখার জন্য ইসলামী খেলাফত পদ্ধতি অবলম্বন করে। কারণ তারা লক্ষ্য করেছে ইসলামের খেলাফত পদ্ধতির দ্বারাই পুরো মুসলিম বিশ্ব এক ও অভিন্নভাবে পরিচালিত

হচ্ছে। তবে সেটি সঠিক বিশ্বাস ও নির্ভুল আক্বীদার উপর নির্ভরশীল নয় বলে তারা সফলতা পুরোপুরি অর্জন করতে পারেনি। কারণ তাদের আক্বীদা ভ্রান্ত এবং তাদের পুরোহিতরাও ছিল দুর্নীতিগ্রস্ত। ফলে তারা পুরো ইউরোপকে ঐক্যবদ্ধ রাখার জন্য জাতীয়তাবাদকে প্রধান্য দেয় এবং ঐক্যের ভিত্তি হিসাবে একেই বেছে নেয়। আজ পর্যন্ত সে জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতেই পাশ্চাত্য রাষ্ট্রসমূহ পরিচালিত হচ্ছে। মূলত: তারা এ নীতিও ইসলাম থেকে শিখেছে।

৩. কালফন, মার্টিন লুথার ও অন্যান্য ব্যক্তিরা ইসলামের স্পর্শে এসে নিজেদের মধ্যে বিদ্যমান আক্বীদাগত ও গীর্জার ভ্রান্তিগুলো দূর করতে সচেষ্ট হয়। এজন্য বিভিন্ন আন্দোলনেরও সূচনা করে। তবে তাদের মধ্যে বিদ্যমান ভারসাম্যহীনতা ও অশ্লীলতার কারণে সফলতা খুব বেশি একটা দেখা যায়নি। কারণ সংস্কার ও সংশোধনের সঠিক পথ ইসলামকে তারা গ্রহণ করেনি।

৪. ইসলামের স্পর্শে এসে তারা ইসলামী বিদ্যাপীঠগুলোর নিয়ম-পদ্ধতি ও সিলেবাস রপ্ত করে এবং সে অনুসারে নিজেদের শিক্ষাঙ্গনে সংস্কার এনে সেখানে ইসলামী পদ্ধতির বাস্তবায়ন করেন।

৫. তারা মুসলমানদের বিচক্ষণতা, দুঃসাহসিকতা ও সাহসী অভিযান প্রত্যক্ষ করে নিজেদেরকে সেভাবে গড়তে শুরু করে। সাথে সাথে মুসলমানদের ন্যায় অশ্বারোহণ বিদ্যা শিক্ষা করে নিজেদের মাঝে তার বাস্তবায়নও ঘটায়।

৬. 'কুরআনুল কারীম' মুসলমানদের সংবিধান। এটা আল্লাহ্র বাণী এবং তার অনুমোদিত একমাত্র বিধান। এতে কোন ব্যক্তি স্বার্থ রক্ষা করা হয়নি; বরং এতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে সবার স্বার্থ ও কল্যাণকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। তারা এ কুরআনের পদ্ধতি থেকে ব্যক্তি স্বার্থের ঊর্ধ্বে থেকে সংবিধান রচনার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। যা আজ পর্যন্ত তাদের মধ্যে বিদ্যমান। তারা মালেকী ফিক্বহ থেকে নগর উন্নয়নের অনেক নীতি-ই গ্রহণ করেছে। বিশেষভাবে উল্লেখ্যযোগ্য-ফ্রান্স। ফ্রান্সের নগর উন্নয়নের অধিকাংশ নীতি ও নিয়ম গ্রহণ করা হয়েছে মালেকী ফিক্বহ থেকে।

৭. তারা ইসলামী নির্মাণ কৌশল ও স্থাপত্যশৈলী দ্বারা প্রভাবিত হয় ব্যাপকভাবে। তাইতো ধর্মীয় ও সাধারণ প্রাসাদসমূহে ইসলামের নির্মাণ কৌশল অনুপুঙ্খ অনুসরণ করে। তারা ইসলামের নিখুঁত পদ্ধতি দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। যেমন : ঘরের সঙ্গে বাথরুম নির্মাণ ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য গোসল করা। মুসলমানদের সংস্পর্শে আসার পূর্বে ইউরোপে এ সম্পর্কে কোন ধারণা ছিল না।

৮. ভৌগলিক রূপরেখা প্রণয়নেও তারা ইসলাম থেকে উপকৃত হয়েছে। ইসলামী মানচিত্র দেখে সে অনুপাতে নিজেরা নিজেদের মানচিত্র প্রণয়ন করে এবং তার মধ্যে ব্যাপক উন্নতি সাধনে ভূমিকা রাখে।

মোটকথা ইউরোপ তার বর্তমান প্রগতি ও উন্নতির মূল রসদ গ্রহণ করেছে ইসলাম থেকে। যদিও বর্তমান যুগে স্বার্থান্ধতায় ইসলামকে তারা দূরে নিক্ষেপ করেছে।

প্রশ্ন হল : বর্তমান যুগে মুসলমানদের মধ্যে কিংবা তাদের প্রতিবেশীদের মধ্যে এর কোন প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না। তাহলে কী ইসলামী আক্বীদা স্বীয় ঐতিহ্য ও কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলল?

কস্মিনকালেও নয়। ইসলাম কোন অংশেই তার কর্মক্ষমতা ও কার্যকারিতা হারায়নি। কারণ ইসলাম সর্বযুগের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত চিরন্তন জীবনবিধান। একমাত্র এর মাধ্যমেই মানবজাতি সঠিক পথে পরিচালিত হতে পারে এবং রাখতে পারে প্রতি পদে সাফল্যের শাশ্বত স্বাক্ষর।

তবে মূল ব্যাপার হল : এটি তখনই কাজ করবে মানুষ যখন নিষ্ঠাবানচিত্তে এ আক্বীদার বাস্তবায়ন করবে। পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হচ্ছে: إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوْا مَا بِأَنْفُسِهِمْ 'আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা ততক্ষণ পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে' *(রা'দ ১১)*।

এ হল আল্লাহ্র বিধান, যার কোন পরিবর্তন নেই। প্রচেষ্টা ব্যতীত এবং উপায়-উপকরণ গ্রহণ করা ছাড়া কখনো মানুষের অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব নয়। মানুষের জীবন অধ্যায় পরিচালনার জন্য ইসলামী আকীদার ন্যায় সফল অন্যকোন চালিকাশক্তি নেই। কিন্তু সে তাকে-ই পরিচালনা করবে যে ইসলামকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করবে, তার প্রতি মনোনিবেশন করবে এবং বাস্তব জীবনে তার বাস্তবায়ন কল্পে জীবন-মরণ পণ করবে। যেমন বিদ্যুৎ উপাদন কেন্দ্র। সর্বদাই সে সক্রিয় কিন্তু যদি কোন সংযোগ দানকারী না থাকে, তবে কি উপকারে আসবে? অথবা মনে করুন সে সক্রিয়। কিন্তু কেউ যদি তা থেকে শক্তি সঞ্চয় না করে তবে কি লাভ হবে? আমরা কি বলব– বিদ্যুৎ প্রভাব শূন্য হয়ে গেছে? না-কি বলব– মানুষ তার ব্যবহার ছেড়ে দিয়েছে?

এ হল ইসলামী আক্বীদার উদাহরণ। আর সেসব মুসলমানদের উদাহরণ যারা নামে মাত্র ইসলামের অনুসরণ করে। যে ইসলাম দুনিয়া-আখেরাতের কল্যাণের পরিবাহক তারা সে ইসলামকে প্রয়োগ করে না, তার প্রতি ধাবিত হয় না। ফলে তাদের জীবন পতনোন্মুখ। আবার কখনো এর থেকে উত্তরণের চিন্তা করলেও সত্যিকারার্থে ত্রাণকর্তার দিকে দৃষ্টি দেয় না। বরং যে পথ পতন ত্বরান্বিত ও গভীর করবে, তার প্রতি-ই ধাবিত হয়।

মুসলমানের সময় এসেছে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের এবং তার মনোনীত ইসলামের সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপনের। তাদের সময় এসেছে বাস্তব ইসলামের দিকে প্রত্যাবর্তন করার। শয়তানের আছরকৃত ব্যক্তির ন্যায় এদিক-সেদিক ঘুরা ফিরা ছেড়ে, ইসলাম থেকেই জীবনের সঠিক রূপরেখা গ্রহণ করা। যার উপর নির্ভর করে এগুবে অভীষ্ট লক্ষ্যপানে।

তবে মুসলিম যুবকদের ভেতর ইসলামী পুনর্জাগরণের যে ধারা দুনিয়াজুড়ে বিরাজ করছে, অদূর ভবিষ্যতের জন্য এটি একটি শুভ সংবাদ। যদিও এ ভবিষ্যত প্রচুর ত্যাগ-তিতীক্ষা আর কুরবানীর দাবীদার।

তবে যারা দ্বীন পরিত্যাগ করেছে কিংবা দ্বীন থেকে নিজেকে চিরতরে মুক্ত করে নিয়েছে, তাদের ব্যাপারে আল্লাহর ওয়াদা প্রযোজ্য নয়। বরং তাদের উপর প্রযোজ্য হবে আল্লাহর এ বাণী- وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوْا أَمْثَالَكُمْ- 'যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, আল্লাহ তোমাদের পরিবর্তে এমন এক জাতির সৃষ্টি করবেন যারা তোমাদের মত হবে না' *(মুহাম্মাদ ৩৮)*।

পক্ষান্তরে যারা এ দ্বীন আঁকড়ে আছে, এ দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে, তারা অতি সত্বর আল্লাহর ওয়াদা প্রত্যক্ষ করবে। পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে, 'তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎ কর্ম সম্পাদন করে, আল্লাহ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীর শাসন কর্তৃত্ব দান করবেন। যেমন তিনি শাসন কর্তৃত্ব দান করেছেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের ধর্মকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে শান্তি দান করবেন। তারা আমার এবাদত করবে আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না *(নূর ৫৫)*।'

আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াত : গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

ইসলাম মানবসমাজের জন্য এ বিশ্ব চরাচরের মহান সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মনোনীত ও নাযিলকৃত একমাত্র জীবনবিধান। মূলতঃ আসমান-জমীনের সমস্তকিছুই আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সুনির্দিষ্ট ও অবধারিত নিয়ম-বিধান দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে যাকে আমরা প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম বলে সচরাচর প্রকাশ করি। মানবসমাজের জন্যও এই প্রাকৃতিক নীতিবিধান সমভাবে ক্রিয়াশীল যা থেকে বেরিয়ে আসার ক্ষমতা মানুষের নেই। অনুরূপভাবে দ্বীনে ইসলামও মানবজাতির জন্য সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ নির্ধারিত অবশ্য পালনীয় প্রাকৃতিক নীতিবিধানের অংশ, তবে অন্যান্য বিধান থেকে এর পার্থক্য হল যে, এই নীতিবিধান পালন করা বা না করার ক্ষমতা আল্লাহ মানুষকে দিয়েছেন। অর্থাৎ সে ইচ্ছা করলে যেমন ইসলামকে নিজের চলার পথ হিসাবে বেছে নিতে পারে আবার অস্বীকারও করতে পারে। প্রকৃতির আর কোন বিধানকে লংঘন করার সামান্যতম সামর্থ্য না থাকলেও এই একটি ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র বিধানকে লংঘন করার পূর্ণ সামর্থ্য সে রাখে। এ ক্ষমতা আল্লাহ তাকে দিয়েছেন এজন্য যে, তিনি তাকে এ দুনিয়ার বুকে পাঠিয়েছেন পরীক্ষা নেওয়ার জন্য' *(হূদ ৭, কাহাফ ৭, মূলক ২)*। অর্থাৎ এই পরীক্ষা গ্রহণের জন্য যে, মানুষ তার প্রভূর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে কি না বা তাঁর প্রেরিত জীবনবিধানকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করছে কি না অথবা করলে কতটুকু গ্রহণ করছে এবং এর উপর ভিত্তি করে মৃত্যুপরবর্তী জীবনে তার জন্য জান্নাত বা জাহান্নাম নির্ধারণ করে রেখেছেন। আল্লাহ বলেন, 'আমি মানুষ ও জ্বিন জাতিকে কেবলমাত্র আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি' *(যারিয়াত ৫৬)*। 'তুমি বলে দাও (হে মুহাম্মাদ)! সত্য আসে তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে। অতএব যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করুক আর যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে তা অস্বীকার করুক। নিশ্চয় আমি যালিমদের জন্য জাহান্নামের আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি' *(কাহাফ ২৯)*।

যেহেতু আল্লাহ মানুষকে ইচ্ছার স্বাধীনতা দিয়েছেন আবার তাঁর দেয়া জীবনবিধানকে পূর্ণাঙ্গ অনুসরণের উপর মানুষের দুনিয়াবী কল্যাণ ও পারলৌকিক মুক্তি নির্ভরশীল করে দিয়েছেন, এজন্য তাকে সদাসর্বদা সচেতন ও সতর্ক থাকতে হয়। কেননা নিজের স্বাধীন ইচ্ছার প্রয়োগ করতে যেয়ে আল্লাহর বিধানকে অমান্য করে বসলে সে নিজের জ্ঞান ও বিবেকের অপূর্ণতা এবং অপরিণামদর্শীতার কারণে ন্যায় ও সত্যের পথ থেকে নিশ্চিতভাবে বিচ্যুত হয়ে যায়। ফলে আল্লাহকে ভুলে যেয়ে সে আপন প্রবৃত্তির দাসে পরিণত হয়। বিপরীতমুখী আকর্ষণ তথা শয়তানী প্ররোচনার কালো আঁধারে সে নিজেকে হারিয়ে ফেলে। এভাবে সে নিজের অজান্তেই দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত হয়ে পড়ে। বলা বাহুল্য, পৃথিবীতে মানুষের আগমনের পর থেকে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনেছে এবং ঈমানের উপর টিকে থাকতে পেরেছে এমন মানুষের সংখ্যা অতি অল্প। অধিকাংশই হয়েছে পথভ্রষ্টদের দলভুক্ত।

এই পথভোলা মানুষদেরকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার জন্য আল্লাহ যেমন যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূলকে প্রেরণ করেছেন, তেমনি আবার দায়িত্ব দিয়েছেন তাদেরকে যারা নবী-রাসূলদের অনুসরণ করার মাধ্যমে হেদায়েতপ্রাপ্ত হয়েছেন। আদম (আঃ) থেকে শুরু করে মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত সকল নবী-রাসূল এই দায়িত্ব নিয়েই তথা মানবসমাজকে আল্লাহর পথে প্রত্যাবর্তনের দাওয়াত নিয়ে দুনিয়ার বুকে আগমন করেছিলেন। আল্লাহ বলেন, 'আমি প্রতিটি কওমের মধ্যে রাসূল প্রেরণ করেছি মানুষের জন্য এই দাওয়াত নিয়ে যেন তারা আল্লাহর ইবাদত করে এবং ত্বাগূতকে বর্জন করে' *(নাহাল ৩৬)*। আল্লাহ বলেন, 'আমি তোমার পূর্বে কোন রাসূল প্রেরণ করি নি এই ওহী ব্যতীত যে, আমি ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ নেই; সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত কর' *(আম্বিয়া ৩৫)*। 'প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য পথপ্রদর্শক ছিল' *(রা'দ ৭)*।

শেষনবীর আগমনের মাধ্যমে নবুয়তের সিলসিলা শেষ হওয়ার পর এ দায়িত্ব এখন উম্মতে মুহাম্মাদীর। রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনে এযাম এবং পরবর্তী মুসলমানগণ ইসলামের দাওয়াত পৃথিবীর সর্বত্র পৌঁছানোর জন্য প্রাণান্ত প্রয়াস নিয়েছিলেন। তারই ফলশ্রুতিতে ইসলামের আলোকোজ্জ্বল জ্যোতির্মালা আজও পর্যন্ত বিকশিত হচ্ছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্‌র পুণ্যবান বান্দাদের মাধ্যমে তা অব্যাহত থাকবে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরাই সর্বোত্তম জাতি যাদের উত্থান ঘটানো হয়েছে মানবজাতির কল্যাণের জন্য। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে এবং অন্যায় কাজে নিষেধ করবে'..*(আলে ঈমরান ১১০)*।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনের বহু স্থানে দা'ওয়াত প্রদানের গুরুত্ব ও মর্যাদা এবং নীতিমালা উল্লেখ করেছেন। আধুনিক যুগে দাওয়াতের ক্ষেত্র বিস্তৃতি লাভ করায় 'দা'ওয়াহ' জ্ঞানচর্চার একটি স্বতন্ত্র শাখায় পরিণত হয়েছে। নিম্নে দা'ওয়াতের পরিচয় এবং এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উল্লেখিত হলঃ

দাওয়াতের পরিচয় :

আরবী الدعوة শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল কোন কিছুর প্রতি আহ্বান করা। যেমন- আল্লাহর দিকে দাওয়াত প্রদান করা যার অর্থ- মানুষকে আল্লাহ নির্ধারিত পথে চলার জন্য আহ্বান জানানো। পারিভাষিক অর্থে সাধারণভাবে দাওয়াত এমন আহ্বানকে বলা হয় যা মানুষকে আল্লাহ্‌র পথে আসার জন্য করা হয়। এ আহ্বানের অর্থ মানুষকে কল্যাণ ও সত্যপথের দিকে উৎসাহিত করা, তাদেরকে সৎকর্মের দিকে আহ্বান করা ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা, যাতে দুনিয়াবী জীবনে তারা সম্মানের অধিকারী হয় এবং আখিরাতে সৌভাগ্যবানদের দলভুক্ত হয়। আর বিশেষায়িত অর্থে ইসলামী দা'ওয়াতের অর্থ হল দ্বীনের প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে এবং তা অন্যের নিকট পৌঁছে দেয়ার জন্য নিজের বাকশক্তি এবং কর্মক্ষমতাকে সার্বিকভাবে প্রয়োগ করা। ড. রউফ সা'লাবী বলেন, দাওয়াহ হচ্ছে সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলন, যার দ্বারা মানবসমাজ কুফরী অবস্থা থেকে ঈমানী অবস্থায়, অন্ধকার হতে আলোর দিকে এবং জীবনকে সংকীর্ণতা থেকে প্রশস্ত অবস্থায় রূপান্তরিত করা হয়।

দাওয়াতের হাক্বীকত :

দাওয়াতের হাক্বীকত হল সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে প্রকৃত অর্থে চেনা এবং তার আদেশ ও নিষেধকে জানার মাধ্যমে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা' *(ইউসুফ ১০৮)*। সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ এটাই দাওয়াত প্রদানের সাধারণ মূলনীতি *(আলে ইমরান ১০৪)* এবং দ্বীন ইসলাম অর্থাৎ আল্লাহ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহের মাধ্যমে যে দ্বীন শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর রিসালত মারফত এ দুনিয়াবাসীর নিকট প্রেরণ করেছেন তা-ই দাওয়াতের বিষয়বস্তু।

দাওয়াত প্রদানের দিকসমূহ :

দা'ওয়াত প্রদান দ্বীনের নির্দিষ্ট কোন একটি দিকের সাথে সম্পৃক্ত নয়, বরং তা দ্বীনের সর্বাংশকে শামিল করে। অর্থাৎ যদি কোন ব্যক্তি মানুষকে বিশুদ্ধ আক্বীদা, দ্বীনের প্রতি নিখাদ আনুগত্য, তাওহীদকে সর্বতোভাবে ধারণ, শিরক ও তার যাবতীয় শাখা-প্রশাখা থেকে মুক্ত থাকার আহ্বান জানায় সেটাও দাওয়াত। আবার যদি সে তাওহীদ ও আক্বীদা বিষয়ে সৃষ্ট সন্দেহ দূর করার প্রচেষ্টা চালায় সেটাও দাওয়াত। যদি সে ফরয আমলসমূহ তথা ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত ও পিতামাতার সেবা, সত্যবাদিতা, আমানতদারিতা, অঙ্গিকারপূরণ ইত্যাদি বিষয়ে আহ্বান জানায় সেটাও দাওয়াত। আবার যদি আত্মার পরিশুদ্ধি, তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি, আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল ইত্যাদি বিষয়ে আহ্বান জানায় সেটাও দাওয়াত। এমনকি জিহাদও দাওয়াতের অন্তর্ভূক্ত।

ইবনু তাইমিয়া (রহঃ) বলেন, আল্লাহর পথে দাওয়াত প্রদানের দিকগুলো আপেক্ষিক। প্রয়োজন ও পরিবেশ-পরিস্থিতির চাহিদার সাথে তা পরিবর্তিত হয়। এজন্য পরিবেশ ও প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কেউ বিশুদ্ধ আক্বীদার দিকে, কেউ বাহ্যিক আমল-আখলাকের দিকে, কেউ বা আত্মার পরিশুদ্ধির দিকে দাওয়াত প্রদান করতে পারে।

দাওয়াত প্রদানের হুকুম :

দাওয়াত ইলাল্লাহ তথা আলাহ্‌র পথে আহ্বান অন্যান্য ফরযের ন্যায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে এ ব্যাপারে তাকীদ এসেছে। আল্লাহ বলেন, 'আর যেন তোমাদের মধ্য হতে এমন একটি দল থাকে, যারা কল্যাণের প্রতি আহ্বান করবে, ভাল কাজের আদেশ দিবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে। আর তারাই

সফলকাম' *(আলে ইমরান ১০৪)*। 'তুমি তোমার রবের পথে হিকমত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান কর এবং সুন্দরতম পন্থায় তাদের সাথে বিতর্ক কর। নিশ্চয় একমাত্র তোমার রবই জানেন কে তাঁর পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে এবং হিদায়াতপ্রাপ্তদের তিনি খুব ভাল করেই জানেন' *(নাহল ১২৫)*। 'তুমি তোমার রবের দিকে আহ্বান কর এবং কিছুতেই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না' *(সূরা কাসাস ৮৭)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আমার পক্ষ থেকে যদি একটি আয়াতও জানো, তবে তা অন্যের নিকট পৌঁছে দাও' *(বুখারী, মিশকাত হা/ ১৯৮)*।

শায়খ বিন বায বলেন, দায়ীগণ যে অঞ্চলে দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনা করেন সে অঞ্চল অনুপাতে দাওয়াত প্রদান করা ফরযে কিফায়া। যদি কোন অঞ্চলে প্রয়োজনীয়তা অনুপাতে যথেষ্ট পরিমাণ লোক দাওয়াতী কাজে আত্মনিয়োগ করেন তাহলে সে অঞ্চলে বসবাসকারী অন্যদের উপর থেকে আবশ্যকীয়তা রহিত হয়ে যাবে। তাদের ক্ষেত্রে এটা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা ও একটি অতি উত্তম আমল হিসেবে বিবেচিত হবে। আর যদি সে অঞ্চলে দাওয়াতী কোন তৎপরতাই না থাকে, কেহই এ দায়িত্বের প্রতি গুরুত্ব না দেয় তাহলে সকলেই অপরাধী বলে গণ্য হবে।

অতএব জ্ঞানবান ঈমানদার ব্যক্তিবর্গ ও নায়েবে রাসূলদের উপর অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে এ কাজে আত্মনিয়োগ করা, পরস্পর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আল্লাহ্র বার্তা তাঁর বান্দাদের নিকট পৌঁছে দেয়া। এ দায়িত্ব পালনকালে বড়-ছোট, ধনী-গরীব কোন ভেদাভেদ ও তারতম্য সৃষ্টি না করা। বরং আল্লাহ্র হুকুম যেভাবে আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন, ঠিক সেভাবে আলাহ্র বান্দাদের নিকট পৌঁছে দেয়া।

হ্যাঁ সামগ্রিকতার বিচারে সারা দেশের জন্যে একটি জামাআত থাকতে হবে; থাকা ওয়াজিব, যারা সর্বত্র আল্লাহ্র বাণী পৌঁছে দেবে, সাধ্যমত আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ সম্বন্ধে লোকদের অবহিত করবে। রাসূল (ছাঃ) বিভিন্ন নেতৃবর্গ ও রাষ্ট্র প্রধানের কাছে দায়ী প্রেরণ করেছেন, পত্র দিয়েছেন এবং তাদেরকে আল্লাহ্র দিকে আহবান করেছেন।

বর্তমান সময়ে দাওয়াত কর্মীর স্বল্পতা, অন্যায়-অশ্লীলতা বৃদ্ধি, অজ্ঞতার প্রাবল্য, ইসলামী আকীদা বিরোধী নানাবিধ ষড়যন্ত্র, নাস্তিকতার দিকে আহ্বান, রিসালাত ও পরকালকে অস্বীকার এবং বহুদেশে খৃষ্টধর্মের দিকে দাওয়াতের নানা কর্মসূচির বিস্তৃতিসহ বিবিধ চিন্তাধারা ও মতবাদের ব্যাপকতার কারণে দাওয়াত ইলাল্লাহ সকল মুসলমানের উপর অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

দাওয়াতী কাজের মাধ্যমসমূহ :

দাওয়াতী কাজের জন্য জুমআ'র খুৎবা ও সভা-সমাবেশে বক্তৃতা, স্কুল-মাদরাসা-বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদান, বই-পত্র লেখনী ইত্যাদি প্রচলিত নিয়মিত ক্ষেত্র ছাড়াও সম্ভব সকল প্রকার সুযোগকে ব্যবহার করা প্রয়োজন। আজকের যুগে ইসলাম প্রচার, দাওয়াতকর্ম পরিচালনা ও মানুষের কাছে দলীল-প্রমাণাদি উপস্থাপন অনেক দিক দিয়েই সহজ। বিশেষকরে তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়নের কারণে দাওয়াত ও প্রচারকর্ম অনেক সহজ হয়ে গেছে। বর্তমানে রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র, ইন্টারনেটসহ নানা মাধ্যমের সাহায্যে অতি সহজে মানুষের কাছে দাওয়াত পৌঁছান সম্ভব। রাসূল (ছাঃ) যেখানে যে অবস্থায় থাকতেন না কেন সে অবস্থাতেই মানুষকে দাওয়াত দিতেন।

দা'ওয়াত প্রদানের মূলনীতি :

দাওয়াত ইলাল্লাহ পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হেদায়েতবাণী তথা আল্লাহ্র কালাম এবং রাসূল (ছাঃ) প্রদর্শিত পথনির্দেশনা অনুসরণের জন্য একটি এলাহী দাওয়াত। এই মর্যাদাপূর্ণ দাওয়াত প্রদানের মৌলিক কিছু নীতি রয়েছে যা অবশ্য পালনীয়।

প্রথমত : দাওয়াত প্রদানের মানদণ্ড হবে কেবলমাত্র পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ। অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে, যে পথে আহ্বান করা হচ্ছে তা যেন আল্লাহ্র নির্দেশ বহির্ভূত না হয়ে যায়। তাওহীদ ও সুন্নাতের উপর ভিত্তিশীল এ দাওয়াতে কোন ভাবেই যেন শিরক বা বিদ'আতের সংস্পর্শ না থাকে। আল্লাহ বলেন, 'হে রাসূল! আপনি পৌঁছে দিন আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে। আর যদি আপনি এরূপ না করেন, তাহলে আপনি তাঁর পয়গাম কিছুই পৌঁছালেন না' *(মায়েদাহ ৬৭)*। রাসূল (ছাঃ)-এর দাওয়াত প্রদানের প্রাথমিক অবস্থায় যখন মক্কার মুশরিকরা কুরআনের প্রতি অভিযোগ করল যে, তা তাদের পুজনীয় মূর্তিসমূহকে পরিত্যাজ্য সাব্যস্ত করেছে এবং দাবী করে বসল, এই কুরআনের পরিবর্তে আরেকটি কুরআন নিয়ে আসতে; তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, এটা আমার জন্য কখনই সম্ভবপর নয়, কেননা এর মালিকানা আমার হাতে নেই, আমি তো আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রচারক মাত্র। পবিত্র কুরআনেও এসেছে- 'আর যখন তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন আমার সাক্ষাতের প্রতি অনাকাঙ্খী লোকগুলো বলে, এই কুরআনের পরিবর্তে অন্য কোন কুরআন নিয়ে এস অথবা একে পরিবর্তন করে দাও। আপনি বলে দিন, একে নিজের পক্ষ থেকে পরিবর্তন করার সাধ্য আমার নেই, আমি তো কেবল তারই অনুসরণ করি যা আমার কাছে অহি করা হয়। আমি ভয় করি কঠিন দিবসে আমার প্রভুর শাস্তির, যদি আমি তাঁর অবাধ্যতা করি' *(ইউনুস ১৫)*। আল্লাহ বলেন, 'সুতরাং আপনি এর প্রতিই দাওয়াত দিন এবং সুদৃঢ় থাকুন তার উপর যেভাবে আপনি আদ্দিষ্ট হয়েছেন; আপনি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেন না এবং বলুন আল্লাহ যে কিতাব নাযিল করেছেন, আমি তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি' *(আশ-শূরা ১৫)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করল যার উপর আমার কোন নির্দেশনা নেই তা প্রত্যাখ্যাত' *(মুসলিম হা/৪৫৯০)*। তিনি আরও বলেন, 'যে ব্যক্তি দ্বীনের মধ্যে এমন কিছু অনুপ্রবেশ করাল যা এর অন্তর্ভুক্ত ছিল না তা প্রত্যাখ্যাত' *(মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/১৪০)*। 'যে ব্যক্তি পথভ্রষ্টতার দিকে আহ্বান করে, তার যত অনুসরণকারী হবে, তাদের পাপ সমতুল্য পাপ তার উপর চাপানো হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৮)*।

দ্বিতীয়ত : দাওয়াত প্রদান করতে হবে সর্বপ্রথম তাওহীদের দিকে। তাওহীদী আক্বীদাকে সুদৃঢ় করার জন্য অর্থাৎ কেবলমাত্র আল্লাহকেই ইলাহ হিসাবে গ্রহণ করা এবং শিরক ও শিরকী প্রতিভূদের পরিত্যাগ করার এই দাওয়াত প্রাথমিকভাবে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। রাসূল (ছাঃ) যখন অহিপ্রাপ্ত হন তখন আরব সমাজ ছিল ঘোরতর জাহেলিয়াতে নিমজ্জিত। পূর্বপুরুষদের ভ্রষ্ট বিশ্বাস ও আচারকে তারা অন্ধভাবে অনুসরণ করে চলত। রাসূল (ছাঃ) যখন তাদেরকে তাওহীদের দিকে আহবান করলেন তখন তারা বলল, 'আমরা তো কেবল সে বিষয়েরই অনুসরণ করব, যার উপর আমাদের বাপ-দাদাদের পেয়েছি। যদিও তাদের বাপ-দাদারা কিছুই জানত না। জানত না সরল পথও' *(বাক্বারা ১৭০)*। তাদের বিশ্বাস ও আচরণের শুদ্ধতার জন্য তাদের নিকট কোনরূপ দলীল উপস্থিত ছিল না কেবলমাত্র পূর্বপুরুষদের প্রতি অন্ধ অনুসরণ ব্যতীত। এজন্য আল্লাহ সেই সময় তথা মাক্কী জীবনে তাওহীদের আহবান সূচক আয়াতসমূহ নাযিল করেন। হযরত আয়শা (রাঃ) বলেন, 'প্রথম পর্যায়ে কুরআনের দীর্ঘ সূরাসমূহ নাযিল হয়েছিল যেখানে ছিল জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা। অতঃপর মানুষ যখন ইসলামের দিকে ফিরে এল তখন একে একে হালাল-হারাম সম্বলিত আয়াত নাযিল হওয়া শুরু হয়' *(বুখারী হা/৪৯৯৩)*। এভাবে আখেরাতের প্রতি আগ্রহীকরণ ও শাস্তির ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে তাওহীদী আক্বীদাকে পরিশুদ্ধির মাধ্যমেই মক্কায় ইসলামের প্রারম্ভিক দাওয়াত শুরু হয়।

ইসলামী দাওয়াতের বৈশিষ্ট্য :

প্রথমত : ইসলামী দাওয়াতের বৈশিষ্ট্য হল আন্তর্জাতিকতা ও সার্বজনীনতা। যখন আল্লাহ ইসলামের বার্তা নিয়ে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে প্রেরণ করেছেন, অতঃপর এর দাওয়াত দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, তখন থেকে এ দাওয়াত আর কোন নির্দিষ্ট সময় বা স্থান, জাতি বা বর্ণের সাথে সীমাবদ্ধ নয়। বরং এই দাওয়াত সমগ্র বিশ্বের জন্য। আল্লাহ বলেন, 'আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপই প্রেরণ করেছি' *(আম্বিয়া ১০৭)*। 'এটি (আল কুরআন) সারা বিশ্বের জন্য উপদেশস্বরূপ' *(আনআম ৯০)*। 'পরম কল্যাণময় তিনি যিনি তাঁর বান্দার প্রতি ফয়সালার গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন, যাতে সে বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হয়' *(ফুরকান ১)*। '(হে রাসূল) আপনি বলে দিন, হে মানবমণ্ডলী! তোমাদের সবার প্রতি আমি আল্লাহ প্রেরিত রাসূল' *(আ'রাফ ১৫৮)*।

দ্বিতীয়তঃ এই দাওয়াত অতি স্বচ্ছ, সরল ও সুস্পষ্ট, যা কোন জোর জবরদস্তির অপেক্ষা রাখে না। কেননা এ দ্বীন হল মানবজাতির স্বভাবধর্ম যার উপর আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'প্রতিটি নবজাতক ইসলামের উপরই জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতামাতা তাকে ইহুদী, নাছারা বা অগ্নিপূজক বানিয়ে দেয়' *(মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/৯০)*। এজন্য এই দাওয়াত উপস্থাপনে কোন জবরদস্তি বা বাধ্যতামূলক নীতি অবলম্বনের প্রয়োজন নেই। আল্লাহ বলেন 'বলুন, আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না আর আমি লৌকিকতাকারীও নই' *(ছোয়াদ ৮৬)*। 'আপনি আপনার পালনকর্তার পথের দিকে আহবান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উত্তম উপদেশ শুনিয়ে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন পছন্দনীয় পন্থায়' *(নাহল ১২৫)*। 'যখন আমার বান্দারা আপনাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে; (বলে দিন) আমি রয়েছি অতি সন্নিকটে। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনাকে কবুল করি যখন সে প্রার্থনা করে। সুতরাং আমার হুকুম

পালন করা এবং আমার প্রতি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস স্থাপন করা তাদের জন্য একান্ত কর্তব্য, যাতে তারা সঠিক পথ পেতে পারে' *(বাক্বারা ১৮৬)*। 'আল্লাহ কাউকে সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না, সে তাই পায় যা উপার্জন করে এবং তাই তার উপর বর্তায় যা সে করে' *(বাক্বারা ১৮৬)*। 'তোমরা আল্লাহ্র জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাও যেভাবে প্রচেষ্টা চালানো প্রয়োজন, তিনি তোমাদেরকে নির্বাচন করেছেন এবং দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা রাখেননি' *(হজ্জ ৭৮)*।

দাওয়াতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা :

১. ইসলাম মানবতার স্বভাবধর্ম। ফলে সৃষ্টিগতভাবেই মানুষের মাঝে সত্য গ্রহণের যোগ্যতা বিদ্যমান। কিন্তু অসুস্থ ও প্রতিকূল পরিবেশ তাকে সত্য গ্রহণে বাধাগ্রস্থ করে। মানব সত্ত্বার সুস্থ এবং সুন্দরের পূজারী। এ সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করার জন্যই সত্য ও কল্যাণের পথে দাওয়াত দেয়া প্রয়োজন। আল্লাহ বলেন, 'এটা আল্লাহ্র দেয়া ফিৎরাত (স্বভাব) যার উপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্র সৃষ্টিতে কোন পরিবর্তন নেই' *(রূম ৩০)*।

২. আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন কেবল তাঁর ইবাদতের জন্যই। কিন্তু মানুষ তাঁকে না দেখেই তাঁর ইবাদত করে কি না তার পরীক্ষা তিনি নিতে চান। এ পরীক্ষা দিতে যেয়ে মানুষ যেন বিভ্রান্ত হয়ে না পড়ে এজন্য তাদের সতর্ক করার জন্য ও তাঁর বাণী প্রচারের জন্য যুগে যুগে লক্ষাধিক নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। আর এর মাধ্যমে শেষ দিবসে তিনি মানুষের এই ওযর পেশ করার পথ রুদ্ধ করে দিয়েছেন যে, তারা সত্যপথের দাওয়াত পায়নি বলে গোমরাহ হয়েছিল। আল্লাহ বলেন, 'আমি রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, যাতে রাসূলগণকে প্রেরণের পর আল্লাহ্র কাছে মানুষের আপত্তি করার আর কোন অবকাশ না থাকে' *(নিসা ১৬৫)*।

৩. মানুষকে আল্লাহ সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। সমাজ পরিচালনার জন্য নানা বিধি-বিধান প্রণয়ন অপরিহার্য। কিন্তু সে তার সীমাবদ্ধ জ্ঞানের কারণে একটি নির্ভুল জীবনবিধান প্রণয়ন করতে সক্ষম নয়। কেননা ভূত-ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে সীমাহীন প্রজ্ঞা প্রয়োজন তা মানুষের নেই। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদেরকে অতি অল্পই জ্ঞান দেয়া হয়েছে' *(বনী ইসরাঈল ৮৫)*। পক্ষান্তরে আল্লাহ্র জ্ঞান অসীম অনন্ত। তিনি সৃষ্টিকর্তা আবার তিনিই পালনকর্তা। সৃষ্ট জগতের সকল সমস্যা ও সমাধান তার পরিজ্ঞাত। ভূত-ভবিষ্যৎ তাঁরই আয়ত্বে। ফলে তাঁর প্রদত্ত জীবনব্যবস্থাই হবে মানুষের জন্য চিরস্থায়ী ও কল্যাণকর দিকনির্দেশনা। আল্লাহ বলেন, **'হুকুমদানে (বিধান রচনায়) আল্লাহ্র চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কে হতে পারে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য'** *(মায়েদা ৫০)*? এ জীবনব্যবস্থার সাথে সকল মানুষকে পরিচয় করানো এবং তা অনুসরণের মাধ্যমে সমাজের বুকে কল্যাণ ও প্রশান্তির সুবাতাস ছড়িয়ে দেয়ার জন্য দাওয়াত প্রদান অবশ্য কর্তব্য।

৪. মানুষ সৃষ্টিগতভাবে ভুলপ্রবণ ও ষড়রিপুর তাড়নাযুক্ত। ফলে স্রষ্টাকে চিনলেও প্রায়ই সে স্রষ্টার নির্দেশের কথা ভুলে যায়। প্রবৃত্তির অনুসরণ করে নিজের ধ্বংস ডেকে আনে। এজন্য মানুষকে সরলপথের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে ও অন্যায় পথ থেকে বিরত রাখতে সবসময় নছীহত-উপদেশ অব্যাহত রাখতে হয়। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল সর্বদাই থাকা প্রয়োজন যারা কল্যাণের দিকে আহবান করবে, ন্যায়ের আদেশ দিবে এবং অন্যায় থেকে নিষেধ করবে' *(আলে ঈমরান ১০৪)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে কেউ যখন কোন অন্যায় কাজ হতে দেখে, সে যেন তা স্বহস্তে পরিবর্তন করে দেয়। যদি সে ক্ষমতা না থাকে তবে মুখ দ্বারা তার প্রতিবাদ করবে, আর যদি সে ক্ষমতাও না থাকে তবে নিজের অন্তরে তাকে ঘৃণা করবে। আর এটাই হল ঈমানের দুর্বলতম স্তর' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৩৭)*। তিনি আরও বলেন, 'সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! তোমরা অবশ্যই ভাল কাজের আদেশ দিবে এবং খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করবে। নতুবা অনতিবিলম্বেই আল্লাহ তা'আলা নিজের পক্ষ থেকে তোমাদের উপর আযাব প্রেরণ করবেন। অতঃপর তোমরা তার নিকট দো'আ করবে কিন্তু তোমাদের দো'আ কবুল করা হবে না' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫১৪০, সনদ হাসান)*।

সর্বোপরি একজন দাঈ আল্লাহ্র পথে আহ্বানের প্রয়োজনীয়তা তখন সর্বাধিক অনুভব করেন যখন তিনি উপলব্ধি করতে সক্ষম হন স্বীয় অপরিমেয় সৌভাগ্যকে। ইসলাম নামক মহা অনুগ্রহ লাভে যে ব্যক্তি ধন্য হয়েছেন, যার বদৌলতে তিনি আগামী দিনের চিরস্থায়ী জীবনে মুক্তির দিশা খুঁজে পেয়েছেন, সে ব্যক্তি তার এই মহাঅর্জনকে যারা এ সম্পর্কে বেখবর তাদের মাঝে পৌঁছে দিতে উদগ্রীব হবেন এটা অতি স্বাভাবিক। যে ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ লাভে যত বেশী সক্ষম হয়েছেন, যে ব্যক্তি জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে, চক্ষুযুগলের প্রতিটি পলকে, আত্মার প্রতিটি নিঃশ্বাসে মহান স্রষ্টার অনুগ্রহ যত বেশী অনুভব করেন সে ব্যক্তি তার এই মহাপ্রাপ্তিকে তত বেশী মানবসমাজে ছড়িয়ে দিতে তৎপর হন। যখন এই পৃথিবীর সামান্য কোন অর্জনকেও আমরা প্রচারের উপলক্ষ্য মনে করি তখন এই সর্বোচ্চ অর্জন যে কোন ব্যক্তির জন্য সর্বাধিক বড় প্রচার উপলক্ষ্য তা বলাই বাহুল্য। দাওয়াতের এই আকুতি লক্ষ্য করা যায় সূরা ইয়াসীনে বর্ণিত ইন্তাকিয়া নগরীর হাবীব নাজ্জারের মর্মস্পর্শী ঘটনায়। যখন সে দরদভরা কণ্ঠে তার কওমকে আল্লাহ্র অনুগ্রহকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাঁর প্রতি ঈমান আনার আহ্বান জানাচ্ছিল তখন তার কওম তাকেসহ তার তিনজন সাথীকে নৃশংসভাবে হত্যা করে ফেলল। অতঃপর আল্লাহ যখন তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাচ্ছিলেন তখন সে তার কওমের প্রতি লা'নত না করে গভীর আক্ষেপে বলছিল, 'হায় আমার কওম যদি জানত! যদি জানত আমার প্রভু আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে সম্মানিতদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন!' *(ইয়াসীন ২০-২৭)*।

সকল নবী-রাসূল (আঃ) এবং শেষনবী (ছাঃ) জাতি-ধর্ম, ধনী-গরীব, স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে সকল মানুষের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছেন। কে দাওয়াত গ্রহণ করবে না করবে, কে ক্ষতি সাধন করবে না করবে এ জাতীয় চিন্তা থেকে তারা ছিলেন মুক্ত। দ্বীনের প্রচারে কোন যুলুমকারীর যুলুম, নিন্দুকের নিন্দাকে তাঁরা ভয় করতেন না। কেননা এ দাওয়াত প্রদান তো আল্লাহ্র পক্ষ থেকে দেয়া অন্যান্য দায়িত্বের মত একটি বড় দায়িত্ব।

দাওয়াত প্রদানের ফযীলত :

ইসলামী দাওয়াতের মূল দাওয়াতদাতা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্বয়ং নিজে। কুরআনে এসেছে 'তারা আহবান জানায় জাহান্নামের দিকে। আর আল্লাহ আহ্বান করেন স্বীয় নির্দেশে জান্নাতের দিকে এবং ক্ষমার দিকে' *(বাক্বারাহ ২২১)*।

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হলেন নবী-রাসূলগণ। আল্লাহ তাঁর দাওয়াত এই শ্রেষ্ঠ মানুষ নবী-রাসূলগণকে মানব জাতির নিকট প্রচার করার দায়িত্ব দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, 'আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়ে এ নির্দেশ দিয়েছি যে, আল্লাহ্র 'ইবাদত কর' তাগুত (আল্লাহদ্রোহী)-কে বর্জন কর' *(নাহল ১২৫)*। 'নিশ্চয়ই আপনাকে সত্য (দাওয়াত) সহকারে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে প্রেরণ করেছি এবং এমন কোন জাতি নেই যার নিকট সতর্ককারী গমন করেনি' *(নাহল ৩৬)*।

সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে, এই মর্যাদাপূর্ণ দাওয়াত প্রচারের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ পৃথিবীর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যময় দায়িত্ব পালনে লিপ্ত রয়েছেন। এজন্য আল্লাহ্র পথে আহ্বানকারীকে পবিত্র কুরআনে সর্বোত্তম বার্তাবাহক বলে অভিহিত করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করে, সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং বলে আমি একজন মুসলিম; তার কথা অপেক্ষা উত্তম কথা আর কার?' *(হা-মীম সাজদাহ ৩৩)*।

অন্যদিকে আল্লাহর পথে দাওয়াত দানের অর্থ দুনিয়া ও আখিরাতের চিরন্তন কল্যাণ লাভের পথে আহ্বান। এ দাওয়াত যে ব্যক্তি কবুল করে নিল সে চির কল্যাণের পথে অভিযাত্রী হল। এ দাওয়াতই তার জন্য জীবনের নতুন দিশা এবং চিরন্তন মুক্তির দুয়ার উন্মুক্ত করে দিল। এ থেকেই দাওয়াতের গুরুত্ব ও মর্যাদা সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ্র কসম! তোমার মাধ্যমে আল্লাহ যদি একজন ব্যক্তিকেও হেদায়েত করেন তবে সেটা হবে তোমার জন্য লাল উটের চেয়েও উত্তম' *(মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/৬০৮০)*। তিনি আরও বলেন, 'কেউ যদি কোন নেক কাজের পথ নির্দেশ দেয়, সে ঐ নেক কাজ সম্পাদনকারীর সমতুল্য ছওয়াব পায়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৯)*। 'যে হেদায়েতের দিকে আহবান করে, এ হেদায়েতের যত অনুসরণকারী হবে, তাদের প্রতিদানের সমতুল্য প্রতিদান সে পাবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৮)*। তিনি আরও বলেন, 'আল্লাহ সে ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন যে আমার কথা শুনেছে অতঃপর তা যথাযথভাবে স্মরণ রেখেছে ও রক্ষা করেছে অতঃপর তা যথাযথভাবে অন্যের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছে' *(ইবনে মাজাহ, মিশকাত হা/২২৮, সনদ ছহীহ)*। তিনি আরও বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা তাঁর ফিরিশতাগণ এবং আসমান ও জমীনের অধিবাসীরা এমনকি পিপীলিকা তার গর্তে আর মাছ- যে ব্যক্তি মানুষকে উত্তম কথা শিক্ষা দেয় তার জন্য দো'আ করে' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২১৩, সনদ হাসান)*।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের প্রত্যেককে ইসলামের শাশ্বত বিধানের প্রতি পরিপূর্ণ আত্মসমার্পণ করার তাওফীক দান করুন এবং এই দ্বীনের সর্বব্যাপী আলোকচ্ছটা থেকে যারা অন্ধকারে রয়েছে তাদের কাছে আলোর বার্তা পৌঁছে দেয়ার যোগ্যতা ও সামর্থ্য দান করুন। আমীন!!

সংগঠনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

ড. এ এস এম আযীযুল্লাহ

ইসলাম ফিতরাত বা স্বভাবসুন্দর ধর্ম। তাই সমাজবদ্ধ জীবন যাপন মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। ইচ্ছা করলেও কোন মানুষের পক্ষে একাকী বসবাস করা সম্ভব নয়। এ কারণে মানুষকে সামাজিক জীব বলা হয়। এই সমাজবদ্ধ জীবন যাপনের অপর নাম জামাআতী যিন্দেগী। মানব জীবনে সংঘবদ্ধ জীবন যাপনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় সাংগঠনিক জীবনের প্রতি গুরুত্ব প্রদান মূলক অনেক নীতিকথার প্রচলন আছে। যেমন 'দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ'; 'দশের লাঠি একের বোঝা' ইত্যাদি। সুতরাং সামাজিক জীবনে ঐক্যের গুরুত্ব অপরিসীম। বিন্দু বিন্দু বারির সমষ্টিই হল সিন্ধু বা সমুদ্র। অপরদিকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণু-পরমাণুর সুনিয়ন্ত্রিত সম্মিলনে তৈরী হচ্ছে বিশাল ক্ষমতাসম্পন্ন 'আণবিক বোম'। যার শক্তির কাছে দুনিয়াবী যেকোন শক্তি মাথা নত করছে। এ থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট যে, উপাদান যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন, তাদের সুসংবদ্ধ অবস্থানে যে শক্তি তৈরী হচ্ছে তা অপ্রতিরোধ্য। ইসলামী শরীআতে তাই সুশৃঙ্খল ও সংঘবদ্ধ জীবনকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়েছে। মহান আল্লাহ এবং রাসূল (ছাঃ) মুসলমানদের জামাআতবদ্ধ যিন্দেগী যাপনের বহুমুখী নির্দেশনা প্রদান করেছেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে সুদৃঢ়ভাবে আল্লাহ্র রজ্জুকে ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না' *(আলে ইমরান ১০৩)*।

বর্তমান বিশ্ব সাংগঠনিক বিশ্ব। আধুনিক বিশ্বে ঐক্যবদ্ধ একটি চক্র তাদের যথাসর্বস্ব শক্তি দিয়ে সংঘবদ্ধ প্রক্রিয়ায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে মাঠে নেমেছে। উক্ত শক্তিকে মোকাবেলা করে পৃথিবীতে অহির পতাকা উড্ডীন করার জন্য প্রয়োজন ঐক্যবদ্ধ তথা সংগঠিত মুসলিম জনশক্তি। একবিংশ শতাব্দীর নব্য জাহেলী যুগে মুসলমানদের টিকে থাকতে গেলে মুসলিম জাতিকে সকল প্রকার ভেদাভেদ ভুলে নিঃশর্তভাবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ তথা অহির অনুসরণের মাধ্যমে ইসলামের স্বর্ণ যুগের ছাহাবায়ে কেরামের মত ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী জামাআত কায়েম করতে হবে। মহান আল্লাহ সংগ্রামরত ঐক্যবদ্ধ জনশক্তিকে পছন্দ করেন। যেমন- 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা তাঁর রাস্তায় সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় সারিবদ্ধভাবে সংগ্রাম করে' *(ছফ ৪)*।

জামাআত বা সংগঠন কি : শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) বলেন, اَلْجَمَاعَةُ هِيَ الْاِجْتِمَاعُ وَ ضِدُّهَا الْفُرْقَةُ وَإِنْ كَانَ لَفْظُ الْجَمَاعَةِ قَدْ صَارَ اِسْمًا لِنَفْسِ الْقَوْمِ الْمُجْتَمِعِيْنَ 'জামাআত হচ্ছে একত্রিত হওয়া। এটি দলাদলির বিপরীত। যদিও জামাআত শব্দটি যেকোন ঐক্যবদ্ধ সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়' *(মাজমূউ ফাতাওয়া ৩/১৫৭)*। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন, اَلْجَمَاعَةُ مَا وَافَقَ الْحَقَّ وَإِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ 'যা হক্বের অনুগামী তাই জামাআত। যদিও তুমি একাকী হও'। ইমাম লালকাঈ বলেন, إِنَّمَا الْجَمَاعَةُ مَا وَافَقَ طَاعَةَ اللهِ وَإِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ 'যা আল্লাহ্র আনুগত্যর অনুকূলে হয়, তাই জামাআত। যদিও এক্ষেত্রে আপনি একাই হন' *(শা'আলিমুল ইনতিলাকাতিল কুবরা, পৃ. ৫৩)*। আল্লামা ইবনুল কাইয়িম (রহঃ) বলেন, وَاعْلَمْ أَنَّ الْإِجْمَاعَ وَالسَّوَادَ الْأَعْظَمَ هُوَ الْعَالِمُ صَاحِبُ الْحَقِّ وَإِنْ كَانَ وَحْدَهُ وَإِنْ خَالَفَهُ أَهْلُ الْأَرْضِ 'জেনে রাখুন! ইজমা, দলীল ও বড় দল হল হক্বপন্থী আলেম। যদিও তিনি একাই হন। আর পৃথিবীর সকলে তার বিরোধিতা করে' *(ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন)*।

জামাআতের সাথে নেতৃত্ব ও নেতার বিষয়টি সুস্পষ্ট। সুতরাং বলা চলে, 'একজন নেতার অধীনে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে সংঘবদ্ধ জনসমষ্টিকে জামাআত বা সংগঠন বলে' (اَلْجَمَاعَةُ مَا اجْتَمَعَ مِنَ النَّاسِ عَلَى هَدَفٍ تَحْتَ إِمَارَةٍ)। সংগঠন প্রতিষ্ঠা করতে গেলে নেতৃত্ব, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং আনুগত্যশীল সংঘবদ্ধ জনসমষ্টি প্রয়োজন। এছাড়া আরও কিছু উপাদান প্রয়োজন যেগুলোকে সংগঠনের মৌলিক উপাদান বলতে পারি। যে উপাদানের অনুপস্থিতিতে কোন জিনিসের প্রকৃত পরিচয় হারিয়ে যায়, তাকে ঐ জিনিষের মৌলিক উপাদান বলে। সেই অর্থে সংগঠনের মৌলিক উপাদান ৬টি। যথা- ১. নির্দিষ্ট লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, ২. যোগ্য নেতৃত্ব, ৩. সঠিক কর্মসূচী, ৪. নিবেদিতপ্রাণ কর্মী বাহিনী, ৫. অর্থ ও ৬. নির্দিষ্ট ক্ষেত্র। এই ছয়টি উপাদানের কোন একটিকে বাদ দিয়ে সংগঠন কায়েম করা সম্ভব নয়। বিষয়টি সহজভাবে বুঝার জন্য 'জামাআতী যিন্দেগী'কে একটি চলন্ত গাড়ির সাথে তুলনা করা চলে। একটি গাড়ি চলতে গেলে দক্ষ চালক, অনুগত সহযোগী (হেলপার-কন্ডাক্টর), ভাল ইঞ্জিন, ফুয়েল, রাস্তা ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। একই সাথে প্রয়োজন হয় গাড়ি পরিচালনার কিছু কলাকৌশল যেমন- স্টিয়ারিং ঘুরানো, গিয়ার পরিবর্তন করা, প্রয়োজনে ব্রেক করা, হর্ণ বাজানো ইত্যাদি। এসব ছাড়া একটি গাড়ি কোন অবস্থাতেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারে না।

এখানে দক্ষ চালককে যোগ্য নেতৃত্ব, গন্তব্যস্থলকে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, পরিচালনা পদ্ধতিকে সঠিক কর্মসূচী, অনুগত সহযোগী ও স্টিয়ারিং, ব্রেক, হর্ণ, ইঞ্জিন ইত্যাদিকে নিবেদিতপ্রাণ কর্মী বাহিনী, ফুয়েলকে অর্থ এবং চলার রাস্তাকে নির্দিষ্ট ক্ষেত্র হিসেবে কল্পনা করলে বিষয়টি বুঝতে খুবই সহজ হবে। কোন গাড়িতে চালক না থাকলে যেমন তা চলে না, তেমনি যেনতেন চালক থাকলেই সে গাড়ি নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছাতে পারে না। লক্ষ্যপানে পৌঁছাতে গেলে চালককে অবশ্যই দক্ষ ও অভিজ্ঞ হতে হবে। চালক দক্ষ ও অভিজ্ঞ না হলে সে গাড়ি গন্তব্যে পৌঁছানো তো দূরের কথা পথিমধ্যে যেকোন ধরনের দুর্ঘটনায় পতিত হয়ে নিজের জীবন নষ্ট, গাড়ি নষ্ট, যাত্রীদের দুর্ভোগ, রাস্তার জনগণের জীবন নাশসহ বহুমুখী ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। সাথে সাথে চালক যদি ড্রাইভিং বা ট্রাফিক আইন মেনে গাড়ি না চালায় তবে চালকসহ গাড়িও শ্রীঘরেও যেতে হতে পারে।

আবার যদি গাড়ির স্টিয়ারিং, ব্রেক ঠিকমত কাজ না করে, হর্ণ ঠিকমত না বাজে, সহকর্মীরা ঠিকমত সাহায্য বা আনুগত্য না করে, তবে চালক যোগ্য হলেও তার পক্ষে সে গাড়ি চালানো নিতান্তই অসম্ভব। সাথে সাথে গাড়িটি সুষ্ঠু ও সুন্দরভার চলার জন্য চাই প্রশস্ত সমতল নিরাপদ সড়ক। এতকিছু থাকার পরও যদি অর্থের অভাবে গাড়ির তেল কেনা সম্ভব না হয়, তাহলে পরিস্থিতি কোন পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়াবে তা সহজেই অনুমেয়। সংগঠন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উল্লিখিত উপাদানসমূহের উদাহরণ অনুরূপ।

সাংগঠনিক জীবন যাপন মুসলমানের জন্য ফরয। আর সুনির্দিষ্ট ইসলামী লক্ষ্যে গঠিত জামাআতের উপর আল্লাহ্র রহমত আছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাই তো বলেছেন, يَدُ اللهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ 'জামা'আতের উপর আল্লাহর হাত রয়েছে' *(তিরমিযী হা/২১৬৬, হাদীছ ছহীহ)*। নেতৃত্ব ও আনুগত্যহীন সংগঠন কার্যতঃ সংগঠনই নয়। মসজিদ ভর্তি

মুছল্লী থাকার পরও যদি সকলে যার যার মত ছালাত আদায় করে, তাকে কেউ জামা'আত বলে না; অনুরূপ মুক্তাদীবিহীন ইমামকেও ইমাম বলা হয় না। আবার ইমাম আছে, মুক্তাদী আছে কিন্তু আনুগত্য নেই। যেমন ইমাম রুকূতে গেলে মুক্তাদীরা কেউ সিজদায় যায়, আবার কেউ দাঁড়িয়ে থাকে; ইমাম সিজদায় গেলে মুক্তাদীরা তাশাহহুদ পড়ে; এমন আনুগত্যহীন অবস্থাকে কোন অবস্থাতেই জামাআত বলা চলে না। তাই জামা'আত কায়েমের প্রধান শর্তই হল নেতৃত্ব ও আনুগত্য।

জামাআত দুই প্রকার। ১. জামা'আতে আম্মাহ তথা ব্যাপকভিত্তিক সংগঠন ও ২. জামাআতে খাছ্ছাহ তথা বিশেষ সংগঠন। রাষ্ট্রীয় সংগঠন জামাআতে আম্মাহর পর্যায়ভুক্ত। স্বয়ং রাষ্ট্রপ্রধানই এ সংগঠনের আমীর। ইসলামী শরীআতে তিনি 'আমীরুল মুমেনীন' হিসেবে অভিহিত হবেন। তিনি ইসলামী শরীআ আইনের আলোকে প্রজাপালন ও শারঈ হুদূদ কায়েম করবেন। এই ইমারতকে 'ইমারতে মুলকী'ও বলা হয়। ইসলামী রাষ্ট্র ছাড়া ইমারতে মুলকী কায়েম করা সম্ভব নয়।

রাষ্ট্রীয় সংগঠনের বাইরে অন্যান্য সকল সংগঠনই জামাআতে খাছ্ছার পর্যায়ভুক্ত। এ সংগঠন মুসলিম-অমুসলিম সকল রাষ্ট্রে কায়েম করা সম্ভব। ইসলামী শরীআত মতে দ্বীনের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে কোন স্থানে যদি তিন জন মুমিনও থাকেন তবে সেখানে একজনকে আমীর করে জামাআত বা সংগঠন কায়েম করা অপরিহার্য। এ জামাআত যত বড় হবে ততই ভাল। এই ইমারতকে 'ইমারতে শারঈ' বলা হয়। তিনি শারঈ হুদূদ কায়েম করবেন না, কিন্তু অবশ্যই তাঁর অনুসারীদের মধ্যে শারঈ অনুশাসন কায়েম করবেন।

জামাআতে খাছ্ছাহ বা নির্দিষ্ট সংগঠন কায়েমের বিষয়ে পবিত্র কুরআনে নানাভাবে নির্দেশ এসেছে। মহান আল্লাহ বলেন, (১) وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيْعاً وَّلاَ تَفَرَّقُواْ 'তোমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে সুদৃঢ়ভাবে আল্লাহ্র রজ্জুকে ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না' *(আলে ইমরান ১০৩)*। (২) 'তোমাদের মধ্যে এমন একটি জাতি থাকা প্রয়োজন যারা সৎ কাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করবে। আর তারাই হবে সফলকাম' *(আলে ইমরান ১০৪)*। তিনি আরো বলেন, (৩) 'তোমরাই উত্তম জাতি। বিশ্ব মানবের জন্য তোমাদের উত্থান। তোমরা সৎ কাজের আদেশ দিবে ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে' *(আলে ইমরান ১১০)*। প্রথম আয়াতে সুস্পষ্ট যে, ঐক্যবদ্ধভাবে দ্বীন ইসলামকে আকড়ে ধরতে হবে এবং শেষ দু'টি আয়াতেও দাওয়াতের ক্ষেত্রে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে।

নবী করীম (ছাঃ)ও এ ব্যাপারে স্পষ্ট নির্দেশনা দিয়ে গেছেন। একটি হাদীছে তিনি বলেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তিনটি কাজে সন্তুষ্ট হন। তার দ্বিতীয় কাজটি হল 'তোমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহ্র রজ্জুকে ধারণ করবে এবং দলে দলে বিভক্ত হবে না' *(মুসলিম)*। তিনি আরো বলেন, 'আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি। (১) জামাআতবদ্ধ জীবন-যাপন করা (২) আমীরের নির্দেশ শ্রবণ করা (৩) তাঁর আনুগত্য করা (৪) প্রয়োজনে হিজরত করা ও (৫) আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। যে ব্যক্তি জামাআত হতে এক বিঘত পরিমাণ বের হয়ে গেল তার গর্দান হতে ইসলামের গণ্ডী ছিন্ন হল, যতক্ষণ না সে ফিরে আসে। যে ব্যক্তি মানুষকে জাহেলিয়াতের দাওয়াত দ্বারা আহ্বান করে, সে ব্যক্তি জাহান্নামীদের দলভুক্ত হবে। যদিও সে ছিয়াম পালন করে, ছালাত আদায় করে এবং ধারণা করে যে সে একজন মুসলিম' *(আহমাদ, তিরমিযী)*। এ হাদীছে বর্ণিত পাঁচটি বিষয়ের প্রথম তিনটিই হল সংগঠন, নেতৃত্ব ও আনুগত্য বিষয়ক। সাথে সাথে হাদীছের শেষাংশে বলা হয়েছে সংগঠন বহির্ভূত ব্যক্তি ইসলাম থেকে খারিজ।

নেতৃত্ব ও আনুগত্য ছাড়া সংগঠন টিকতে পারে না। এ বিষয়ে ওমর (রাঃ) যথার্থই বলেছেন। তিনি বলেন, لاَإِسْلاَمَ إِلاَّ بِجَمَاعَةٍ وَلاَ جَمَاعَةَ إِلاَّ بِإِمَارَةٍ وَلاَ إِمَارَةَ إِلاَّ بِطَاعَةٍ 'ইসলাম হয় না জামাআত ছাড়া, জামাআত হয় না আমীর ছাড়া, ইমারত হয় না আনুগত্য ছাড়া' *(দারেমী)*। সংগঠন প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে আনুগত্যের প্রতিও ইসলাম সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর, রাসূলুল্লাহর আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যকার আমীরের আনুগত্য কর। তবে যদি কোন ব্যাপারে তোমাদের মধ্যে মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়, তাহলে সেটি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও' *(নিসা ৫৯)*। এ আয়াতে স্পষ্টভাবে আমীরের আনুগত্যের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য শর্তহীন, পক্ষান্তরে আমীরের আনুগত্য শর্ত সাপেক্ষ।

আমীরের আনুগত্যের বিষয়ে নবী (ছাঃ) বলেন, مَنْ يُطِعِ الْأَمِيْرَ فَقَدْ أَطَاعَنِىْ وَمَنْ يُعْصِى الْأَمِيْرَ فَقَدْ عَصَانِىْ 'যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য করল, সে যেন আমার আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি আমীরের অবাধ্যতা করল, সে আমার অবাধ্যতা করল' *(বুখারী ও মুসলিম; মিশকাত হা/৩৬৬৯)*। ছাহাবায়ে কেরাম আনুগত্যের স্বীকৃতি স্বরূপ রাসূল (ছাঃ) এর নিকট বায়আত বা অঙ্গীকার করতেন। যেমন একটি হাদীছে ওবাদা বিন ছামেত (রা.) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (স.)-এর নিকটে বায়আত করেছিলাম এই মর্মে যে, আমরা আমীরের আদেশ শুনব ও মেনে চলব, কষ্টে হোক স্বাচ্ছন্দ্যে হোক, আনন্দে হোক অপছন্দে হোক, আমাদের উপরে কাউকে প্রাধান্য দেয়ায় হোক। বায়'আত করেছিলাম এই মর্মে যে, নেতৃত্ব নিয়ে আমরা কখনো ঝগড়া করব না। যেখানেই থাকি সর্বদা সত্য কথা বলব এবং আল্লাহ্র হুকুম মেনে চলার ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করব না। (অন্য বর্ণনায় রয়েছে) আমীরের মধ্যে প্রকাশ্য কুফরী না দেখা পর্যন্ত আনুগত্য করে যাব' *(বুখারী ও মুসলিম)*।

অন্য হাদীছে রাসূল (ছা.) বলেছেন, إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ يَقُوْدُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ فَاسْمَعُوْا لَهُ وَأَطِيْعُوْا 'যদি নাক-কান কর্তিত কোন ক্রীতদাসকেও তোমাদের আমীর নিযুক্ত করা হয়, আর সে যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদেরকে আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী পরিচালনা করে, ততক্ষণ তোমরা তার কথা শুনবে এবং তার আনুগত্য করবে' *(মুসলিম হা/১৭৩৭)*। রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, اِسْمَعُوْا وَأَطِيْعُوْا وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيْبَةٌ 'যদি তোমাদের জন্য নিগ্রো দাসকেও আমীর হিসেবে নিযুক্ত করা হয়, যার মাথা কিসমিসের ন্যায় (চ্যাপ্টা)। তবুও তোমরা তার কথা শুনবে ও তার আনুগত্য করবে' *(বুখারী; মিশকাত হা/৩৬৬৩)*। আনুগত্যহীনতার পরিণতি সম্পর্কে তিনি বলেন, مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ ثُمَّ مَاتَ، مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً 'যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য হতে বেরিয়ে গেল ও সংগঠন হতে বিচ্ছিন্ন হল; অতঃপর সে অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল, সে যেন জাহেলী হালতে মৃত্যুবরণ করল' *(মুসলিম হা/১৮৪৯)*। তিনি আরো বলেন, مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيْرِهِ شَيْأً يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَيَمُوْتُ إِلاَّ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً 'যদি কেউ তার আমীরের মধ্যে অপছন্দনীয় কিছু দেখে, সে যেন ধৈর্য ধারণ করে। কেননা যে ব্যক্তি সংগঠন থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেল এবং এমতাবস্থায় তার মৃত্যু হল, সে জাহেলী হালতে মৃত্যুবরণ করল' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৬৮)*। বিষয়টির প্রকৃষ্ট উদাহরণ জামাআতে ছালাত। জামাআতে ছালাত আদায়রত অবস্থায় যদি ইমাম কোন ভুল করেন, তখন পেছন থেকে মুক্তাদীদের লোকমা দেওয়ার সুযোগ আছে। লোকমা দেওয়ার পরও যদি ইমাম সংশোধিত না হন, তবে মুক্তাদীদের জামাআত ছেড়ে দেওয়ার কোন সুযোগ নেই, যদিও মুক্তাদী নিশ্চিত যে, ইমাম ভুল করছেন। সাংগঠনিক ক্ষেত্রে আনুগত্যের বিষয়টিও ঠিক অনুরূপ। তাই সংগঠনের আমীরের মধ্যে

কোন ভুল পরিলক্ষিত হলে সংগঠন থেকে বের হয়ে না গিয়ে সাধ্যমত আমীরের সংশোধনের ব্যবস্থা করতে হবে।

তবে আমীরের আনুগত্য হবে ভাল কাজে। কোন পাপের কাজে তার আনুগত্য চলবে না। এ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, اَلسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيْمَا أَحَبَّ وَ كَرِهَ مَالَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ وَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ 'প্রত্যেক মুসলমানের উপর শ্রবণ ও আনুগত্য আবশ্যক। চাই সে হুকুম তার পছন্দ হোক বা অপছন্দ হোক। যতক্ষণ না সে গুনাহের কাজে আদিষ্ট হয়। যদি সে পাপের কাজে আদিষ্ট হয়, তাহলে তা শ্রবণ করা ও তার আনুগত্য করা যাবে না' *(মুসলিম হা/ ১৮৩৯)*। তিনি আরো বলেন, لاَ طَاعَةَ فِيْ مَعْصِيَةِ اللهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوْفِ 'আল্লাহ্‌র অবাধ্যতায় কোন আনুগত্য নেই। আনুগত্য কেবল ভাল কাজে' *(আবুদাঊদ হা/২৬২৫, হাদীছ ছহীহ)*। অন্য হাদীছে তিনি বলেন, لاَطَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِيْ مَعْصِيَةِ الخَالِقِ 'স্রষ্টার অবাধ্যতায় সৃষ্টির কোন আনুগত্য নেই' *(শারহুস সুন্নাহ; মিশকাত হা/৩৬৯৬, হাদীছ ছহীহ)*।

অনুসারীরা সাধ্যমত আমীরের আনুগত্য করবে। আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বলেন, كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَاعَةِ يَقُوْلُ لَنَا : فِيْمَا اسْتَطَعْتُمْ 'আমরা যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর নিকট শ্রবণ ও আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণ করতাম, তখন তিনি আমাদের বলতেন, তোমরা (আনুগত্য করবে) সাধ্যানুযায়ী' *(বুখারী ও মুসলিম; মিশকাত হা/৩৬৬৭)*।

সংগঠনের আমীর নিরঙ্কুশ আনুগত্য লাভের জন্য অধীনস্ত নেতা-কর্মীদের কাজের সঠিক মূল্যায়ন করবেন এবং তাদের ব্যাপারে সর্বদা সুধারণা পোষণ করবেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَلاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا 'কোন ভাল কাজকে তোমরা তুচ্ছজ্ঞান কর না' *(মুসলিম)*। অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الْأَمِيْرَ إِذَا ابْتَغَى الرِّيْبَةَ فِى النَّاسِ أَفْسَدَهُمْ 'আমীর যখন মানুষের সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করবেন, তখন তাদেরকে ধ্বংস করবেন' *(আবুদাঊদ হা/৪৮৮৯, হাদীছ ছহীহ)*।

বিচ্ছিন্ন জীবন ইসলামী জীবন নয়। কেননা 'যে ব্যক্তি জামাআত হতে এক বিঘাত পরিমাণ দূরে সরে গেল এবং ঐ অবস্থায় তার মৃত্যু হল, সে জাহেলী হালতে মৃত্যুবরণ করল' *(মুসলিম)*। অন্য এক হাদীছে নবী (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আমীরের প্রতি আনুগত্যের হাত ছিনিয়ে নিল, সে ব্যক্তি ক্বিয়ামতের ময়দানে আল্লাহর সাথে মুলাক্বাত করবে এমন অবস্থায় যে তার জন্য কোন দলীল থাকবে না *(মুসলিম)*। আর একারণেই রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন তিনজন লোকের জন্যও কোন নির্জন ভূমিতে অবস্থান করা হালাল নয়, তাদের মধ্য থেকে একজনকে আমীর নিযুক্ত না করা পর্যন্ত' *(আহমাদ)*।

বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করলে শয়তান সহজে তাকে বশীভূত করে এবং পথভ্রষ্ট করে দেয়। সেজন্য সাংগঠনিক জীবন যাপনের আদেশ দিয়ে রাসূল (ছাঃ) বলেন, عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ مَنْ أَرَادَ بُحْبُوْحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ 'তোমরা অবশ্যই জামাআতবদ্ধ জীবন যাপন করবে। সর্বদা বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা শয়তান একজনের সঙ্গী হয়, দু'জন থেকে বহুদূরে অবস্থান করে। যে ব্যক্তি জান্নাতের প্রশস্ত স্থান চায়, সে যেন সংগঠনকে আঁকড়ে ধরে' *(তিরমিযী হা/২১৬৫, হাদীছ ছহীহ)*। এই হাদীছের মাধ্যমে সাংগঠনিক জীবনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা যেমন ফুটে উঠে, তেমনি জামাআতবিহীন জীবন যাপনের ক্ষতিকারিতাও দিবালোকের ন্যায় প্রস্ফূটিত হয়।

মহান আল্লাহ প্রত্যেক মুসলমানকে সকল প্রকার দলাদলির উর্ধ্বে উঠে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে যথাযথভাবে অনুসরণের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ এক ও অভিন্ন মুসলিম মিল্লাত হিসেবে যিন্দেগী যাপনের তাওফীক দান করুন। আমীন!

এক মিনিটের গুরুত্ব

মানুষের দীর্ঘ জীবনে একটি মিনিট অতি সংক্ষিপ্ত সময়। ষাটটি সেকেন্ডই যার ব্যাপ্তিকাল। কিন্তু এই একটি মিনিটই মানুষের জন্য বয়ে আনতে সক্ষম দুনিয়াবী ও পরকালীন জীবনের বহু কল্যাণকর বিষয়। কি কি সম্ভব এক মিনিটে?!

এক মিনিটে সম্ভব-

১. তিন বার সূরা ফাতিহা পাঠ করা, যার প্রতিটি অক্ষরে ১০টি নেকী অর্জিত হলে এক মিনিটে সম্ভব ৬০০ নেকী হাছিল করা।

২. ছয় বার সূরা ইখলাছ পাঠ করা, যে সূরাটি পবিত্র কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ বলে পরিগণিত। অর্থাৎ এক মিনিটে পবিত্র কুরআন ২ বার তেলাওয়াতের নেকী অর্জন সম্ভব।

৩. দশ বার এই দো'আটি পাঠ করা সম্ভব- **لا إله الا الله وحده لاشريك له ، له الملك وله الحمد وهوكل شئ قدير** যার নেকী ১ জন দাস আযাদ করার সমপরিমাণ *(মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/২৩০২)*।

৪. **سبحان الله وبحمده** এই দো'আটি পঞ্চাশ বার পাঠ করা সম্ভব। যা প্রতিদিন একশতবার পাঠ করলে সমুদ্রের ফেনা সমপরিমাণ গুনাহও আল্লাহ ক্ষমা করে দিতে পারেন *(মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/২২৯৬)*।

৫. **سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم** এই দো'আটি পাঠ করা সম্ভব ২৫ বার। যে দুটি বাক্য পাঠ করা অতি সহজ অথচ মীযানের পাল্লায় ভারত্বপূর্ণ ও আল্লাহর নিকট অতি প্রিয় *(মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/২২৯৮)*।

৬. **سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر** এ দো'আটি পাঠ করা সম্ভব ১০ বার। যে দো'আটি আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় এবং সূর্য যা কিছুর উপর উদিত হয় তার মধ্যে সর্বত্তোম *(মুসলিম, মিশকাত হা/২২৯৫)*।

৭. **لا حول و لا قوة إلا بالله** -এ দো'আটি পাঠ করা সম্ভব ৪০ বার। যে দো'আটিকে জান্নাতের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ বলা হয়েছে *(ছহীহুল জামে' হা/২৬১৪)*।

৮. **لا إله إلا الله** -এ দো'আটি বলা সম্ভব ৬০ বার। যা কালেমায়ে তাওহীদ এবং সর্বোচ্চ মর্যাদাবান কালেমা *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২৩০৬, সনদ হাসান)*।

৯. **صلى الله عليه وسلم** -এ দরূদটি পড়া সম্ভব ৫০ বার। যা একবার পাঠ দশবার পাঠের সমতুল্য *(মুসলিম, মিশকাত হা/৯২১)*। অর্থাৎ এতে ৫০০ বার পাঠের নেকী অর্জন সম্ভব।

১০. পাঁচ জন মানুষের সাথে সালাম বিনিময় করা সম্ভব। যা বহু নেকী ও মানুষের সাথে ভ্রাতৃত্ব ও পবিত্র সম্পর্ক গঠনের সহায়ক।

এছাড়াও সম্ভব আরো বহু কিছু। মূলতঃ জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে সৎ আমলের মাধ্যমে কাজে লাগিয়ে পার্থিব কল্যাণ অর্জন ও পরকালীন সঞ্চয়কে সমৃদ্ধ করাই একজন মুমিনের সার্বক্ষণিক কর্তব্য। আল্লাহ বলেন, 'এ বিষয়ে (জান্নাতের নেআমতরাজি) প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিৎ' *(তাত্বফীফ ২৬)*। 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে ছুটে চল, যার সীমানা আসমান ও যমীন পরিব্যাপ্ত, যা তৈরী করা হয়েছে তাক্বওয়াশীলদের জন্য' *(আলে ইমরান ১৩৩)*। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, যখন মানুষ রাতে ঘুমাতে যায়, আমার চোখ বেয়ে তখন অশ্রুধারা নেমে আসে। আমি তখন আওড়াতে থাকি ঐ কবিতার ছত্রগুলো-

একি নয় নষ্ট সে মোর রাত
জ্ঞান সাধনা ছেড়ে ঘুমের ঘোরে
যবে মোর অন্তর্যামী গুণছে সে রাত
মোর ভবজীবন পঞ্জিকায়॥

আত্মশুদ্ধি অর্জনে বর্জনীয় বিষয়াদি

মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলাম

আত্মশুদ্ধি অর্জন নিয়মিত প্রচেষ্টা, নিয়মিত প্রক্রিয়া অবলম্বনের উপর ভিত্তিশীল। এজন্য সৎস্বভাবগুলো আত্মস্থ করার জন্য যেমন নিরন্তর তৎপর থাকতে হয়, তেমনই বদস্বভাব বর্জনে সার্বক্ষণিক সতর্ক থাকতে হয়। আল্লাহভীতির দৃঢ় অনুভূতি ব্যতীত প্রবৃত্তির সাঁড়াশি আক্রমণ থেকে নিজেকে হেফাযত করা অত্যন্ত কঠিন। উমর (রাঃ) উবাই বিন কা'বকে বলেন, তুমি কি কখনও কাঁটাপূর্ণ দুর্গম রাস্তায় চলেছ? তিনি বললেন, হ্যা! উমার (রাঃ) বললেন, সেখানে তুমি কি কর? উবাই (রাঃ) বললেন, আমি আমার কাপড় জড়িয়ে নেই এবং অত্যন্ত সাবধানতার সাথে চলি। উমার (রাঃ) বললেন, ওটাই তাক্বওয়া *(তাফসীর ইবনে কাছীর ১/১৬৪)*। কুরআনে ইউসুফ (আঃ)-এর বক্তব্য এসেছে, 'আমি নিজেকে নির্দোষ বলি না, নিশ্চয় মানুষের মন মন্দ কর্মপ্রবণ বিন্তু সে নয়-যার প্রতি আমার পালনকর্তা অনুগ্রহ করেছেন' *(ইউসুফ ৫৩)*। আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না, যে কেউ শয়তানের পদাংক অনুসরণ করবে, তাকে শয়তান নির্লজ্জতা ও মন্দ কাজের নির্দেশ করবে। যদি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া তোমাদের প্রতি না থাকতো, তবে তোমাদের কেউ কখনও পবিত্র হতে পারতে না, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পরিশুদ্ধ করেন' *(নূর ২১)*।

সুতরাং নাফসে আম্মারাহ তথা শয়তানের স্পর্শপ্রাপ্ত অন্তরের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য একদিকে যেমন আল্লাহ্র অনুগ্রহ প্রয়োজন, অন্যদিকে নিজের অবিরাম প্রচেষ্টা থাকতে হবে। বলা বাহুল্য, সৎগুণ অর্জনের চেয়ে অসৎগুণ বর্জন করা অধিকতর কঠিন।

আল্লামা ইবনুল কাইয়িম বলেন, মানুষের বদচরিত্র মৌলিকভাবে তিনটি- অহংকার, লজ্জাহীনতা ও হীনমন্যতা। দম্ভ, অকৃতজ্ঞতা, আত্মগর্ব, তাচ্ছিল্য, অবজ্ঞা, হিংসা, অহংকার, অত্যাচার-উৎপীড়ন, কঠোর অন্তর, বিমুখতা প্রদর্শন, আধিপত্য প্রকাশ, নেতৃত্ব ও খ্যাতির মোহ, প্রাপ্য নয় তবুও প্রশংসা পাওয়ার চেষ্টা ইত্যাদি সবই অহংকারজাত। আর মিথ্যা, আমানতের খেয়ানত, লোকপ্রদর্শন, প্রতারণা, লোভ, ভীরুতা, কৃপণতা, অলসতা, অকর্মণ্যতা, আল্লাহ ব্যতীত অন্যের কাছে মাথা নত করা, উত্তম চরিত্রের লোকদের উপর দুষ্টচরিত্রের লোকদেরকে স্থান দেয়া ইত্যাদি বদগুণ লজ্জাহীনতা, নীচুতা ও হীনমন্যতা থেকে সৃষ্ট। বদচরিত্রগুলো আগুন তথা জাহান্নামের অনুগামী এবং সেখান থেকেই সৃষ্ট। আগুনের স্বভাব হল উঁচু হওয়া এবং ফাসাদ সৃষ্টি করা অতঃপর নিভে যাওয়া। অবশেষে তা আবর্জনায় পরিণত হওয়া। একই অবস্থা হয় অগ্নিজাত চরিত্রগুলোর ক্ষেত্রে, যখন তা বেপরোয়া ও উত্তেজিত অবস্থায় থাকে তখন তা বড়ত্ব, ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে আর যখন শান্ত ও নিস্তেজ হয়ে যায় তখন তা ভূপাতিত হয়ে নিভৃতে ভগ্নদশায় নিঃশেষ হয়ে যায় *(কিতাবুল ফাওয়ায়েদ, পৃঃ ৮৫)*।

নিম্নে আত্মশুদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে সাতটি অবশ্য বর্জনীয় দোষাবলী আলোচিত হল।

১. অহংকার/আত্মগর্ব : আরবী الكبر শব্দটির অর্থ অহংকার বা বড়ত্ব প্রকাশ করা। আর الإعجاب بالنفس শব্দটির অর্থ আত্মগৌরব বা প্রাপ্ত ক্ষমতা ও মর্যাদা নিয়ে স্ফীতভাব পোষণ করা। আত্মগর্ব হ'ল অহংকারের প্রথম ধাপ।

হাদীছের পরিভাষায় অহংকার হল, দম্ভের সাথে সত্যকে অস্বীকার করা এবং মানুষকে হেয় ও তুচ্ছ মনে করা *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১০৮)*। ইমাম গায্যালী বলেন, 'অহংকার হল নিজেকে বড় মনে করা এবং নিজের অবস্থানকে অন্যের চেয়ে উন্নততর ভাবা।' ইবনে হাজার বলেন, 'অহংকার মানুষের এমন অবস্থার সাথে সংযুক্ত যখন সে নিজের অবস্থান নিয়ে চমৎকৃতবোধ করে অর্থাৎ নিজেকে সে অন্যের চেয়ে বড় মনে করে। এর সর্বোচ্চ স্তর হল অহংকারবশত আল্লাহকে প্রভু বলে স্বীকার না করা এবং তার আনুগত্য করতে অস্বীকার করা ও সত্যকে অবজ্ঞা করা। অহংকার আসে দু'টি কারণে।- ১. নিজের মধ্যে উত্তম কাজের উপস্থিতি যা অন্যের তুলনায় বেশী। এ দিক থেকেই আল্লাহকে বলা হয় 'আল-মুতাকাব্বির' বা অহংকারী। ২. নিজের অবস্থান অন্যের চেয়ে উত্তম-এরূপ মিথ্যা ধারণা করা এবং যা নিজের মাঝে নেই তা নিয়ে পরিতুষ্টি বোধ করা *(ফাৎহুল বারী, ১০/৪৮৯ পৃঃ)*।

অহংকার একটি ঘৃণ্য অপরাধ। আল্লাহ বলেন, 'যারা নিজেদের কাছে আগত কোন দলীল ছাড়াই আল্লাহর আয়াত সম্পর্কে বিতর্ক করে, তাদের এ কাজ আল্লাহ ও মুমিনদের কাছে খুবই অসন্তোষজনক। এমনিভাবে আল্লাহ প্রত্যেক অহংকারী-স্বৈরাচারী ব্যক্তির অন্তরে মোহর এঁটে দেন' *(মু'মিন ৩৫)*।

মানুষের নিকৃষ্টতম স্বভাবগুলোর মধ্যে অহংকার প্রধানতম। অহংকার মানুষকে সত্য ও ন্যায় থেকে বহু দূরে ঠেলে দিয়ে স্বার্থপরতার চূড়ান্ত স্তরে নিয়ে যায়। অন্যান্য বদগুণ সাধারণতঃ হৃদয়ের অভ্যন্তরীণ ভাব হিসাবে অবস্থান করে। কিন্তু অহংকার বাইরে প্রকাশ পায়। অহংকারে স্ফীত হৃদয় অপরকে দেখলে নিজ অপেক্ষা হীন মনে করে। ফলে সে সর্বস্থানে বড়ত্বের প্রত্যাশী হয়। অন্যকে উপদেশ দিতে সে কঠোরতা অবলম্বন করে, কিন্তু তাকে কেউ কোন শিক্ষা দিতে গেলে সে ক্রোধে ফেটে পড়ে। অহংকারের সবচেয়ে বড় ক্ষতি হল এটা মানুষের ঈমানকে হরণ করে নেয়। ইবনে তাইমিয়াহ বলেন, 'অহংকার এমনকি শিরকের চেয়েও নিকৃষ্ট অপরাধ। কেননা অহংকারী ব্যক্তি আল্লাহ্র দাসত্বের ব্যাপারে অহংকার প্রকাশ করে যেখানে মুশরিক ব্যক্তি অন্তত: আল্লাহর ইবাদত করে যদিও অন্যকে তাঁর সাথে শরীক স্থাপন করে *(মাদারেজুস সালেকীন ২/৩৩২)*।'

অহংকারী ব্যক্তি মুত্তাকী হতে পারে না। দিবা-রাত্রি আত্মপূজা ও স্বীয় অবস্থান সমুন্নত রাখার চিন্তায় ব্যাপৃত থাকার কারণে তার অন্তর থাকে কলুষিত, কঠিন। মিথ্যা, কপটতা, গীবত, ঈর্ষা, ক্রোধ, অতিরঞ্জিত বাক্যালাপ হয়ে যায় তার স্বভাবের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ফলে কোন সৎগুণ তার মাঝে বিস্তৃত হতে পারে না। এরূপ চরিত্রের কারণে সে সমাজ থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

এজন্য আল্লাহ পবিত্র কুরআনে অহংকারীদের সম্পর্কে বার বার হুঁশিয়ারবাণী উচ্চারণ করেছেন, 'অহংকারীদের আবাসস্থল কি জাহান্নাম নয়' *(যুমার ৬০)*? 'এবং (আল্লাহ) তোমাদের যা কিছু দিয়েছেন তা নিয়ে উল্লসিত হয়ো না। আল্লাহ কোন উদ্ধত অহংকারীকে পছন্দ করেন না' *(হাদীদ ২৩)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যার অন্তরে সরিষাদানা পরিমাণ অহংকার রয়েছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১০৭-৮)*। জাহান্নামী কারা হবে এ সম্পর্কে তিনি বলেন, 'প্রত্যেক অনর্থক কথা নিয়ে বিবাদকারী, বদ- মেযাজী ও অহংকারী' *(মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/৫১০৬)*। হাদীছে কুদসীতে এসেছে, আল্লাহ বলেন, 'অহংকার আমার চাদর, শ্রেষ্ঠত্ব আমার পরিচ্ছদ। যে ব্যক্তি এর কোন একটি নিয়ে টানাটানি করবে আমি তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাব' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১১০)*। কুরআনের বর্ণনায় পুত্রকে লক্ষ্য করে লোকমান হাকীমের উপদেশবাণী এভাবে এসেছে, 'তুমি অহংকারবশে মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে গর্বভরে পদচারণা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না' *(লোকমান ১৮)*। আল্লাহভীতি ও বিনয় ব্যতীত কোন কিছুতেই অহংকার বিনাশ করা যায় না।

২. গীবত : الغيبة শব্দটির আভিধানিক অর্থ কারো অনুপস্থিতিতে নিন্দাবাচক কথা বলা। হাদীছের পরিভাষায়- গীবত হল কারো

অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে এমন দোষ বর্ণনা করা যা তার মাঝে রয়েছে *(ছহীহুল জামে' হা/৪১৮৬)* অথবা কারো সম্পর্কে এমন কথা বলা যা সে অপছন্দ করে *(ঐ হা/৪১৮৭)*। রাসূল (ছাঃ) ছাহাবীদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কি জান গীবত কি? তা হল- তোমার ভাইয়ের সম্পর্কে তোমার এমন কথা বলা যা সে অপছন্দ করে। ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, আমি যা বলি যদি আমার ভাইয়ের মাঝে তা বিদ্যমান থাকে? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমার বলা বিষয়টি যদি তার মধ্যে থাকে তাহলে তুমি গীবত করলে আর না থাকলে তুমি তার নামে মিথ্যা অপবাদ রটালে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৮২৮)*।

গীবত একটি হীন স্বভাব। এটা মানুষের নীচু মানসিকতাকেই প্রকাশ করে। মানবসমাজে সর্বাধিক প্রচলিত একটি কুস্বভাবের মধ্যে গীবত একটি। গীবত জিনিসটি এতই ব্যাপক যে, এ থেকে আত্মরক্ষা করাটা দৃঢ় ঈমান ও তাক্বওয়ার অধিকারী হওয়া ব্যতীত এড়ানো কঠিন। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে গীবতকে নিষিদ্ধ করে বলেন, 'তোমাদের কেউ যেন কারও পশ্চাতে নিন্দা না করে। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করবে?' *(হুজরাত ১২)* 'দুর্ভোগ প্রত্যেক পশ্চাতে ও সম্মুখে পরনিন্দাকারীর জন্য' *(হুমাযাহ ১)*। গীবত শোনার পর সম্মতিসূচক মন্তব্য করা বা তা সত্যায়ন করাটাও গীবত। আল্লাহ বলেন, '(হে রাসূল!) যদি শয়তান আপনাকে ভুলিয়ে দেয়, তবে স্মরণ হওয়ার পর যালেমদের সাথে উপবেশন করবেন না' *(আন'আম ৬৮)*। এমনকি ইশারার মাধ্যমেও নিন্দা প্রকাশ করলেও গীবত হয়ে যায়। যেমন আয়েশা (রাঃ) একবার এক মহিলার খর্বত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে ইশারা করে দেখালে রাসূল (ছাঃ) তাঁকে বললেন, তুমি তার গীবত করলে। অনুরূপভাবে বিদ্রুপাত্মকভাবে বা ব্যঙ্গ করে কারো কোন কাজ, কথা বা আচরণকে প্রকাশ করলে সেটাও গীবতের পর্যায়ভুক্ত। আল্লামা নববী বলেন, বরং এটা গীবতের চেয়েও বড় অপরাধ। কেননা এতে আরো বেশী মানহানি ঘটে। বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই তোমাদের রক্ত, তোমাদের ধন-সম্পদ, তোমাদের সম্মান-মর্যাদা পরস্পরের উপর হারাম (সকল দিনে, সকল মাসে, সকল স্থানে), যেমনভাবে আজকের দিনে, এই মাসে, এই শহরে তা হারাম' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৬৫৯)*। মুসলিমের পরিচয় দিতে যেয়ে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মুসলিম সে-ই যার যবান (কটুকথা) ও হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে এবং মুহাজির সে-ই যে আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ বিষয় থেকে দূরে থাকে' *(মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/৫)*। কোন ব্যক্তির গীবত করা হচ্ছে এমন অবস্থায় কেউ যদি গীবতকারীকে বাধা দেয়, তাহলে বাধাদানকারীর জন্য শুভসংবাদ দিয়ে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি অপর মুসলিম ভাইকে তার অনুপস্থিতিতে বা তার অজান্তে সাহায্য করল, দুনিয়া এবং আখিরাতে আল্লাহও তাকে সাহায্য করবেন' *(ছহীহুল জামে' হা/৬৫৭৬)*।

৩.হিংসা/বিদ্বেষ/ঈর্ষা : الحسد শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল কোন কিছু অপছন্দ করা ও তার বিলুপ্তি কামনা করা। পরিভাষায় হিংসা বলতে বুঝায় কোন ব্যক্তির মাঝে বিদ্যমান কোন গুণ বা নেয়ামত দেখে মনোকষ্ট অনুভব করা এবং তা দুরীভূত হওয়ার জন্য আকাংখা করা, সেটা দ্বীনী বা দুনিয়াবী যে কোন বিষয়েই হোক না কেন।

হিংসাও মানবচরিত্রের প্রায় অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্য। ইবনে তাইমিয়াহ বলেন, অতি অল্প মানুষই হিংসার রোগ থেকে মুক্ত। এ জন্য বলা হয়ে থাকে, ما خلا جسد من حسد ، لكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه 'কোন শরীরই হিংসা থেকে মুক্ত নয়, তবে মন্দ ব্যক্তিরা সেটা প্রকাশ করে আর সচ্চরিত্রবানরা তা গোপন রাখে।' হাসান বসরীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কোন মুমিন কি হিংসা করে? তিনি বললেন, 'যদি বল ইউসুফ (আঃ)-এর ভাইদের মত হিংসার কথা তবে আমি বলব- না, তবে সাধারণতঃ প্রত্যেক মানুষের মাঝে হিংসার রোগটি বিরাজমান, তবে তা ক্ষতি করতে পারে না যদি না সে ব্যক্তি হাত ও জিহবা দ্বারা তা প্রকাশ করে' *(মাজমূউ ফাতওয়া ১০/১২৪-১২৫)*।

হিংসার ক্ষতি হল- হিংসা মানুষের অন্তরে গোপন থাকে কিন্তু নানা রোগে আত্মাকে চরমভাবে ভারাক্রান্ত করে তোলে। জ্ঞানীরা বলেন, তিনটি জিনিস মানুষকে প্রশান্ত জীবন থেকে বঞ্চিত করে, ঘৃণা-বিদ্বেষ, হিংসা ও দুর্বিনীত আচরণ। হিংসা অবধারিতভাবে মনের মাঝে দুঃসহ আগুন জ্বালিয়ে দেয়। হিংসার কারণে অন্তরে জমা হতে থাকে ঘৃণা, ঈর্ষা, বিদ্বেষ, ক্রোধ, শত্রুতা, হতাশা, দুঃখ, দুশ্চিন্তা, তাকদীরের উপর অসন্তুষ্টি, গোপনে পর্যবেক্ষণ, কৌশল উদ্ভাবন, উদ্বেগ, শারিরীক ও মানসিক চাপ প্রভৃতি নেতিবাচক মানসিক অপক্রিয়া। অথচ এসব কোন কিছুই যার প্রতি হিংসা করা হয় তার বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারে না, উল্টো হিংসুকেরই নেক আমলগুলোকে নিঃশেষ করে দেয়। কাযী শুরাইহকে জনৈক ব্যক্তি বলেন, বিবাদমান পক্ষগুলোর ব্যাপারে আপনার ধৈর্য ধরা এবং সূক্ষ্ম বিচারে আপনার পারদর্শিতা দেখে আপনার প্রতি আমার খুব হিংসা জাগে। কাযী লোকটিকে বললেন, হিংসায় তোমার যেমন কোন লাভ নেই, আমারও কোন ক্ষতি নেই। জাহিয বলেন, হিংসা শরীরকে নষ্ট করে দেয় এবং সম্প্রীতিবোধকে বিনাশ করে। হিংসার চিকিৎসা হল কষ্ট বা বিপদে পড়া। হিংসুক ব্যক্তির সার্বক্ষণিক সাথী হল অশান্তি। এটি একটি অস্পষ্ট প্রবেশপথ এবং অবান্তর ধ্যান-ধারণার নাম। হিংসা প্রকাশ হয়ে পড়লে তার আর চিকিৎসা নেই। আর গোপন থাকলে তার চিকিৎসা নিহিত কষ্টে বা বিপদ-আপদে পড়ার মধ্যে *(রিসালাতুল হাসেদ ওয়াল মাহসূদ, পৃঃ ৮)*। হিংসার সবচেয়ে খারাপ দিক হল- হিংসুক সবসময় হিংসা করে মর্যাদাবান ও উত্তম গুণের অধিকারীদেরকে। এজন্য কুরআনে হিংসুকদের হিংসা থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে বলা হয়েছে *(ফালাক ৫)*। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে হিংসুকদের নির্বুদ্ধিতাকে ভর্ৎসনা করে বলেন, 'নাকি তারা মানুষের সাথে হিংসা করে আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে যা কিছু দান করেছেন সেজন্য' *(নিসা ৫৪)*? রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা কারো দোষের কথা জানতে চেষ্টা করো না, গোয়েন্দাগিরি করো না, ক্রয়-বিক্রয়ে ধোঁকাবাজি করো না, পরস্পরের প্রতি হিংসা রেখ না, পরস্পরের প্রতি শত্রুতাও করো না এবং একে অন্যের পিছনে লেগ না। বরং পরস্পর এক আল্লাহর বান্দা ও ভাই ভাই হয়ে থাক' *(মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/৫০২৮)*।

হিংসার এই রোগ থেকে বাঁচার উপায় হল-রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা নিজেদের অপেক্ষা নিম্ন অবস্থার লোকের প্রতি তাকাও। এমন লোকের দিকে তাকিও না যে তোমাদের চেয়ে উঁচু পর্যায়ের। তাহলে আল্লাহ তোমাকে যে নেয়ামত দান করেছেন তাকে তুমি ক্ষুদ্র মনে করবে না' *(মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/৫২৪২)*।

৪.ক্রোধ : الغضب শব্দটির অর্থ শক্ত ও কঠোর হওয়া। পরিভাষায় ক্রোধ হল প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছায় অন্তরের রক্ত ফুঁসে উঠা। মানবস্বভাবের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য ক্রোধ। এটা সর্বাবস্থায় ধৈর্যহীনতার বহিঃপ্রকাশ তা কোন উত্তম ব্যক্তির ক্রোধই হোক (অর্থাৎ যে ক্রোধ তার অবস্থান ও মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করে), অথবা মন্দ লোকের খারাপ, কুপ্রবৃত্তির বশে সৃষ্ট ক্রোধ হোক। ক্রোধ যখন মানুষের অন্তরে বিজয়ী হয়ে যায় তখন নিজের উপর এবং সমাজের উপর তার কুপ্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। যখন মানুষ ক্রোধে উন্মত্ত হয় তখন সে সত্য ও সঠিক পথ থেকে দূরে সরে যায়, হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে সে যা খুশি করে ফেলে। সহিষ্ণুতা, ক্ষমার মহত্তম সুযোগ থেকে সে বঞ্চিত হয়। সে মনে করে যে সে নিজের ক্ষমতা ও বাহাদুরি সমুন্নত রাখতে সমর্থ হল, অথচ চূড়ান্ত বিচারে তাকে নিতান্তই নির্বোধ ও অপরিণামদর্শী পাওয়া যায়। এতে নিজেকে যেমন অনুশোচনায় পড়তে হয়, তেমনি দুনিয়া ও আখিরাতে বহু ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। এজন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুমিনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'এবং ক্রোধ সংবরণকারী ও মানুষকে মার্জনাকারী' *(আলে ইমরান ১৩৪)*। অর্থাৎ ক্রোধ মানুষের সহজাত বৈশিষ্ট্য, এটার মূলোচ্ছেদ করা সম্ভব নয়। কিন্তু ঈমানদার ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য হল ক্রোধকে দমন করা। জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে উপদেশ চাইলে তিনি বললেন, তুমি রাগান্বিত হয়ো না। সে আরো কয়েকবার উপদেশ চাইলে তিনি প্রতিবারই

বললেন, তুমি রাগান্বিত হয়ো না' *(বুখারী, মিশকাত হা/৫১০৪)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, রাগের সময় ধৈর্যধারণ করা ও মন্দ ব্যবহার ক্ষমা করা- এ নীতি যখন মানুষ অবলম্বন করে আল্লাহ তখন তাদেরকে বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করবেন এবং শত্রুকে এমনভাবে অনুগত করে দিবেন যেন তারা ঘনিষ্ঠ বন্ধু' *(বুখারী, মিশকাত হা/৫১১৭)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ঐ ব্যক্তি শক্তিশালী নয়, যে প্রতিপক্ষকে মোকাবিলায় পরাস্ত করে। বস্তুতঃ সে ব্যক্তিই প্রকৃত বীর, যে ক্রোধের সময় নিজেকে সংবরণ করতে পারে' *(মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/৫১০৫)*। উল্লেখ্য যে, ক্রোধ যখন পাপ, কুফরী, মুনাফেকীর প্রতিরোধে ব্যবহৃত হয় তখন তা ঈমানের পরিচয় সমুন্নত করে। এজন্য মুমিনদের আরেকটি পরিচয় দিতে যেয়ে আল্লাহ বলেন, 'তারা কাফিরদের বিরুদ্ধে কঠোর' *(ফাতাহ ২৯)*।

৫.রিয়া : রিয়া শব্দের আভিধানিক অর্থ লোকপ্রদর্শন। পারিভাষিক অর্থে রিয়া বলা হয় ঐ ইবাদত ও সৎ আমলকে যা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পরিবর্তে জনসম্মুখে নিজের ব্যাপারে সুধারণা দেয়ার জন্য করা হয়। এর দ্বারা পার্থিব সম্মান, প্রশংসা ও অর্থ উপার্জনই তার উদ্দেশ্য হয়।

আল্লাহ্র ইবাদতে রিয়া বা লোকপ্রদর্শন একটি অমার্জনীয় অপরাধ এবং প্রকারান্তরে শিরকের পর্যায়ভুক্ত। কেননা এতে আল্লাহর ইবাদত হয় না বরং মানবপূজা করা হয়। নেককার লোকদের অন্তরে রিয়া অপেক্ষা মারাত্মক ব্যাধি আর নেই। রিয়ার ফলে আমলে খুলূছিয়াত নষ্ট হয়ে যায়। আর যে আমলে খুলূছিয়াত থাকে না তা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে এবং কষ্ট দিয়ে নিজেদের দান-খয়রাত বরবাদ করো না সে ব্যক্তির মত যে নিজের ধন-সম্পদ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করে' *(বাক্বারা ২৬৪)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আমি আমার উম্মতের জন্য ছোট শিরকের বিষয়ে যেমন ভয় করি অন্য বিষয়ে তেমন ভয় করি না। ছাহাবাদের জিজ্ঞাসায় তিনি বললেন, ছোট শিরক হল 'রিয়া'। কিয়ামতের দিন আল্লাহ রিয়াকারদের লক্ষ্য করে বলবেন, 'তোমরা যাও! যাদের উদ্দেশ্যে তোমরা ইবাদত করেছ তাদের নিকট গমন কর এবং তাদের নিকট হতেই তোমাদের প্রতিদান চেয়ে নাও' *(আহমাদ, মিশকাত হা/ ৫৩৩৪, সনদ ছহীহ)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি সুনাম অর্জনের উদ্দেশ্যে কোন কাজ করে, আল্লাহ তার দোষ-ত্রুটি সমাজে প্রকাশ করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর জন্য কোন আমল করে আল্লাহ তাআলাও তার সাথে লোক দেখানোর ব্যবহার করবেন *(মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/৫৩১৬)*। আলী (রাঃ) রিয়াকারীর তিনটি নিদর্শন বর্ণনা করেন- যখন সে একাকী থাকে তখন অলসতায় কাটায়, মানুষের সামনে প্রাণচঞ্চল, পরিপাটি থাকে, প্রশংসিত হলে আমলে তৎপরতা দেখায় এবং নিন্দিত হলে আমল কমিয়ে দেয়। আমলে খুলূছিয়াত আনার সচেতন প্রয়াসের মাধ্যমে রিয়ার এই দোষটি থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব। ইউসুফ আর-রাযী বলেন, ইখলাছ অর্জন দুনিয়ার সর্বাধিক কঠিন বিষয়। আমি বহুবার চেষ্টা করেছি অন্তরকে রিয়া থেকে মুক্ত করার, কিন্তু প্রতিবারই যেন তা বিভিন্ন রূপে আবার জন্ম নেয়। ইবনে রজব বলেন, প্রবৃত্তির জন্য সবচেয়ে বড় আপদ হল ইখলাছ। কেননা তাতে প্রবৃত্তির জন্য কোন অংশ বাকী থাকে না।

৬.কুপ্রবৃত্তি : কুপ্রবৃত্তি অতি ব্যাপক বিষয়। মানবজাতিসহ প্রাণীকুলের স্থায়িত্ব ও বংশবিস্তারের জন্য আল্লাহ মানুষের মাঝে আহার, নিদ্রা, কামভাব ইত্যাদি জৈবিক চাহিদা সহজাত করে দিয়েছেন। যখন মানুষ এসব চাহিদাকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক তার ব্যবহার ও পরিচর্যা করে তখন তা জীবনধারণের মৌলিক উদ্দেশ্য তথা আল্লাহর দাসত্বের জন্য কল্যাণকর শক্তি হিসাবে কাজ করে। কিন্তু যখন এসব চাহিদাকে সে নিজের আজ্ঞাবহ রাখতে ব্যর্থ হয় এবং শয়তানের পাতা ফাঁদে পা দিয়ে প্রবৃত্তির দাসে পরিণত হয়, তখন সে পরিণত হয় জৈবিক পশুতে। অনিয়ন্ত্রিত ভোজনস্পৃহা ও কামরিপুর তাড়না মেটাতে সে অনৈতিক পন্থার আশ্রয় নেয় এবং নানা দুনিয়াবী লোভ-লালসার শরণাপন্ন হয়। এখান থেকেই জাগে ধন-সম্পদের লোভ, যা অর্জনের জন্য প্রয়োজন হয় শক্তি, সুখ্যাতি, নেতৃত্ব, প্রভুত্ব ইত্যাদি। এসবের লালসা যখন কাউকে গ্রাস করে ফেলে তখন সে মরিয়া হয়ে সমাজে অন্যায়-অকল্যাণ, দ্বন্দ্ব -কলহ, অশান্তি-বিশৃংখলার জন্ম দেয়।

মানুষের প্রায় সকল পাপের উৎস কুপ্রবৃত্তি। যে ব্যক্তি কুপ্রবৃত্তির তাড়না থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে সমর্থ হয় এবং তার বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলে সে ব্যক্তি অধিকাংশ পাপের হাত থেকে রক্ষা পায়। আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং প্রবৃত্তির খেয়াল-খুশী থেকে নিজেকে নিবৃত রেখেছে, জান্নাতই হবে তার ঠিকানা' *(নাযিআত ৪১)*।

৭. কুধারণা : কুধারণা বলতে বুঝায়- কোন মানুষ সম্পর্কে দলীল বিহীনভাবে কোন খারাপ ধারণা পোষণ করা। আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা অধিক ধারণা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয়ই কতিপয় ধারনা পাপ *(হুজ্‌রাত ১২)*।' রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা কারো সম্পর্কে কুধারণা করা থেকে বেঁচে থাক। কেননা আনুমানিক ধারণা বড় ধরনের মিথ্যা' *(মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/৫০২৮)*। আর বাস্তবিকই কোন মানুষ সম্পর্কে আমাদের কুধারণা যে খুব কমই সত্য হয় তা আমরা দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাতেই দেখি, অথচ তা আমাদের বন্ধুত্ব, ভ্রাতৃত্ব নষ্ট করতে এবং অন্তরকে অযথা ভারাক্রান্ত করতে বিরাট ভূমিকা রাখে। তবে কোন কারণে যদি কুধারণা এসেই যায় তবে এটুকু নিশ্চিত করতে হবে যে, তা যেন বাইরে প্রকাশ না পায় বা তার ভিত্তিতে কোন কিছু বাস্তবায়ন না করা হয়।

পরিশেষে বলা যায়, এই মহাবিশ্ব চরাচরের একাধিপতি মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞানার্জন ও সর্বস্বত্যাগ করে তাঁর কাছে পূর্ণাঙ্গ আত্মসমর্পণের মাধ্যমেই মানুষ প্রকৃত মানুষে পরিণত হয়। অপরদিকে আল্লাহ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অভাব ও অজ্ঞতার কারণেই মানুষ পথভ্রষ্ট হয়। ফলে ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার তুচ্ছ লোভ-লালসা চরিতার্থ করতে যেয়ে নানা বদউপসর্গ তার মাঝে শক্তভাবে স্থান করে নিতে সক্ষম হয়, যা তার আত্মা থেকে মনুষত্যের গুণাবলী হরণ করে নেয়। এজন্য ইবনুল কাইয়িম বলেন, 'যদি মানুষ প্রকৃতঅর্থে তাঁর প্রভুকে চিনত, তাঁর অসীম ক্ষমতা ও গুণাবলী সম্পর্কে ধারণা রাখত এবং নিজের সীমাবদ্ধতা ও অপূর্ণতা উপলব্ধি করতে পারত, তবে সে কখনো অহংকার করত না, কখনো ক্রোধে উন্মত্ত হতো না, কারো সাথে হিংসাও করতে পারত না। কেননা হিংসা প্রকারান্তরে আল্লাহ্র সাথেই শত্রুতার শামিল। যেহেতু হিংসাপরায়ণ লোক স্বীয় বিরাগভাজন ব্যক্তির উপর আল্লাহর দেয়া নেআমতকে অপছন্দ করে, অথচ আল্লাহ তার জন্য সেটা পছন্দ করেছেন। অর্থাৎ সে আল্লাহ নির্ধারিত বিষয় ও তাঁর পছন্দ-অপছন্দের বিরুদ্ধে শত্রুতায় লিপ্ত হয়। আর এ কারণেই ইবলীস আল্লাহ্র শত্রুতে পরিণত হয়েছিল। কেননা তার পাপ ছিল অহংকার ও হিংসা থেকে উৎসারিত। এ দু'টি অনিষ্টকর গুণই তাকে আল্লাহ সম্পর্কে ভুলিয়ে দিয়েছিল এবং তাঁর আনুগত্যে বাধা সৃষ্টি করেছিল। অন্যদিকে ক্রোধ মানুষকে নিজ আত্মার পরিচয় ভুলিয়ে দেয়। সে নিজের আত্মার কল্পিত প্রশান্তির জন্য অন্যকে ক্রোধের আগুনে পুড়িয়ে দেয়। অথচ আত্মা এই হক রাখে না যে তার পরিতুষ্টির জন্য মানুষ ক্রোধ ও প্রতিশোধ ইচ্ছা চরিতার্থ করবে। কেননা তাতে স্রষ্টা আল্লাহর পরিবর্তে সৃষ্টি আত্মার জন্য ক্রোধ ও সন্তুষ্টি প্রকাশ প্রাধান্য পেয়ে যায় *(আল-ফাওয়ায়েদ, ১/১৭১ পৃঃ)*।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সকলকে আত্মশুদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ মানুষ হওয়ার এবং তার প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন!!

মুসলিম যুবকের পরিচয়

মূল (আরবী) : মুহাম্মাদ খিযির হুসাইন
অনুবাদ : নূরুল ইসলাম

আমাদের মধ্যে এমন অনেক যুবক রয়েছে যারা মুসলিম হওয়ার জন্য ইসলামী পরিবারে প্রতিপালিত হওয়া, মুহাম্মাদ বা মোস্তফা নাম রাখা এবং আদমশুমারীর সময় মুসলিম তালিকাভুক্ত হওয়াকেই যথেষ্ট মনে করে। অতঃপর তার এবং ইসলামের সাথে সম্পর্কহীন একজন যুবকের মাঝে নির্গলিতার্থে আর কোন পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায় না। এ কারণেই আমি ‘ মুসলিম যুবকের পরিচয়’ বিষয়টিকে আলোচনার জন্য বেছে নিয়েছি।

মুসলিম উম্মাহের প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের দৃষ্টি এমন এক সভ্যতা বিনির্মাণে নিবদ্ধ যার প্রাণ হল ঈমান, শরীর ইসলামী বিধি-বিধান এবং পোষাক হল রাসূল (ছাঃ)-এর চরিত্র। যা অতীতেও পরিচ্ছন্ন ও আলোকজ্জ্বল ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। অতএব সেই যুবকের পরিচয় জানা অবশ্য কর্তব্য, যে এই সুউচ্চ সভ্যতা বিনির্মাণের জন্য স্বীয় হাত প্রসারিত করতে সক্ষম।

• এ কাজের জন্য উপযুক্ত সেই মুসলিম যুবক, যে নিজেকে প্রকৃত মুসলিম হিসাবে গড়ে তোলার ব্যাপারে সুদৃঢ় মানসিকতার অধিকারী। যে গভীর মনোযোগ সহকারে কুরআন মাজীদ পাঠ করে এবং উহার আলোকজ্জ্বল আয়াতসমূহে চিন্তা-ভাবনা নিবদ্ধ করে। অবশেষে তার অন্তর কুরআনের সুমহান হিকমত ও অনুপম উপদেশাবলী দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে যায়। আল্লাহ বলেন, ‘এটা কি তাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, আমি আপনার উপর এমন কিতাব অবতীর্ণ করেছি যা তাদের নিকট আবৃত্তি করা হয়ে থাকে’ *(আনকাবূত ৫১)*।

• প্রকৃত মুসলিম যুবক সে-ই যে আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করে না। সে হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ থেকে বিশ্বাস করে যে, একমাত্র আল্লাহই সৃষ্টিজগত পরিচালনা করেন। কাজেই অকল্যাণ দূরকারী এবং ক্ষতি সাধনকারী তিনি ব্যতীত কেউ নেই। এই সঠিক আক্বীদার মাধ্যমে সে নিজেকে মাযারকেন্দ্রিক ধ্যান-ধারণা থেকে রক্ষা করে এবং লোকদের প্রতাপশালী কে তুচ্ছ জ্ঞান করে। তখন দুঃখ-কষ্ট, বালা-মুছীবত সহ্য করা এবং হকের পথে দাওয়াত ও সমাজ সংস্কারের লক্ষ্যে সংগ্রাম করার জন্য বাধার বিন্ধ্যাচল অতিক্রম করা তার পক্ষে সহজ হয়ে যায়।

• প্রকৃত মুসলিম যুবক বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনী অধ্যয়ন করে। এর মাধ্যমে সে দিব্যদৃষ্টিতে অনুভব করে যে, প্রজ্ঞা, জাগ্রত জ্ঞান এবং বিবিধ গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে রাসূল (ছাঃ) যে সুমহান মর্যাদাপূর্ণ স্থানে উপনীত হয়েছিলেন, রাসূল নন এমন কোন মানুষের পক্ষে সেখানে উপনীত হওয়া কখনোই সম্ভব নয়। যদিও সে এজন্য শত শত বছর ধরে চেষ্টা চালায়।

• প্রকৃত মুসলিম যুবক শরীয়ত অনুমোদিত ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ্র ডাকে সাড়া দেয় এবং একে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের মাধ্যম মনে করে। যেমন নিবিষ্টচিত্তে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করা, যদিও তা এমন লোকদের সামনে হয় যারা ঈমানের স্বাদ আস্বাদন না করার কারণে ছালাত আদায়কারীর প্রতি কটাক্ষ করে। আমাদের দুর্বল ঈমানের যুবকেরা নাস্তিকদের ও তাদের সাথে সাদৃশ্যমান বিলাসী ব্যক্তিদের মজলিসে ছালাত আদায় করে না এই ভয়ে যে, তারা তাদেরকে ঠাট্টা করবে এবং তাদের দিকে বাঁকা চোখে তাকাবে।

• প্রকৃত মুসলিম যুবক আল্লাহ্র দ্বীনের মাধ্যমে নিজেকে সম্মানিত বোধ করে, যুক্তিগ্রাহ্য পন্থায় তার প্রতিরক্ষায় নিজেকে নিয়োজিত করে এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ দলীল দ্বারা তার প্রতি আক্রমণকারী এবং সন্দেহের তীর নিক্ষেপকারীর মুখে চপেটাঘাত করে। যদিও চপেটাঘাতকৃত ব্যক্তি ক্ষমতাধর ও প্রতাপশালী হোন না কেন। আমাদের দুর্বল ঈমানের অধিকারী যুবকেরা ঐ সকল সীমালংঘনকারীদের সামনে নিজেদেরকে ক্ষুদ্র মনে করে এবং পিন পতন নীরবতার মাধ্যমে দ্বীনের প্রতি আক্রমণ প্রতিহত করে। কখনো কখনো তাদের আক্বীদা এমন দুর্বলতম পর্যায়ে পৌঁছে যে, তারা যা বলে তার সাই দেয়। যারা স্রষ্টার ক্রোধের দ্বারা সৃষ্টির সন্তুষ্টি ক্রয় করে তারা জানে যে, কোন পরিস্থিতিতে কোন দিকে মোড় নিতে হয়।

• প্রকৃত মুসলিম যুবক সর্বদা স্মরণ করে যে, তার আয়ুষ্কাল সংক্ষিপ্ত। প্রত্যেক দিন সে তার ইহলীলা সাঙ্গ হওয়ার আশংকা করে। ফলে তাকে এমন অবস্থায় পাওয়া যায় যে, সে তার জীবনের কোন মুহূর্তই উপকারী ইলম বা সৎকর্ম করা ছাড়া অতিবাহিত হতে দেয় না। কবি বলেন,

إِذَا مَا مَضَى يَوْمٌ وَلَمْ أَصْطَنِعْ يَدًا + وَلَمْ أَكْتَسِبْ عِلْمًا فَمَا ذَاكَ مِنْ عُمْرِيْ

‘সৎকর্ম ও জ্ঞানার্জন ব্যতীত যে একটি দিন অতিবাহিত হয়, তা যেন আমার জীবনের কোন সময়ই নয়’।

• প্রকৃত মুসলিম যুবককে কোন কাজের দায়িত্ব দিলে সে আমানতের সাথে তা পালন করে। কারণ সে বিশ্বাস করে, কাজের নিপুণতার মাধ্যমেই একজন মানুষ অন্য আরেকজন মানুষের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে। সে অনুভব করে, প্রদত্ত আমানতের ব্যাপারে ঐ সত্তার সম্মুখে জিজ্ঞাসিত হতে হবে যার কাছে আকাশ ও পৃথিবীর কোন কিছুই গোপন থাকে না।

• প্রকৃত মুসলিম যুবক আল্লাহ্র নূরে দেখে। ফলে সে বিধর্মীদের আচার-অভ্যাস ও তাদের সভ্যতার অন্ধ অনুকরণ করে না। দুর্বল ঈমানের অধিকারীরা সব বিষয়ে তাদের অনুকরণ করতে অতি উৎসাহী হয়। এমনকি তা ইসলামী শিষ্টাচারের বিপরীত হলেও। যেমন খাওয়ার সময় ডান হাতে চাকু ও বাম হাতে কাটা চামচ ধরে খাবার খাওয়া।

• প্রকৃত মুসলিম যুবক ইসলামী অর্থব্যবস্থাকে সবচেয়ে উন্নত অর্থব্যবস্থা হিসাবে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে। যা মানবজাতিকে সমৃদ্ধ করতে পারে এবং এর মাধ্যমে মানুষ নিশ্চিন্ত ও শান্তিময় জীবন যাপন করতে পারে। যে সূদকে সম্পদ বৃদ্ধি ও দরিদ্র থেকে ধনী হওয়ার মাধ্যম মনে করে, সে এ মতের মাধ্যমে আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং শরীআতের নছ (Text) পরিবর্তনের মাধ্যমে কেবল তার ভ্রষ্টতাই বৃদ্ধি পায়।

• প্রকৃত মুসলিম যুবক শরীআতের বিধি-বিধানকে তার প্রবৃত্তির অনুগামী করে শরীআতের দলীলের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা ও তার নিয়ম-নীতি নিয়ে খেলা করে ধারণা করে না যে, এটি তার প্রবৃত্তির অনুগামী।

যেমন কেউ মহিলাদের বেপর্দা চলাফেলা করা ও পুরুষদের সাথে অবাধে মেশাকে শরীআতের দৃষ্টিতে নিষেধ মনে করে না এজন্য যে, সে মুসলিম নারী ও স্ত্রীদের দিকে চোখ ভরে দেখবে এবং অবাধে তাদের সাথে যোগাযোগ করবে।

• প্রকৃত মুসলিম যুবক একান্ত প্রয়োজন ছাড়া নাস্তিকদের মজলিসে বসে না। কেননা সতেজ ঈমানের লক্ষণ হল দ্বীনের প্রতি কটুক্তি তাকে পীড়িত করবে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, যিন্দীকরা দ্বীনের প্রতি অপবাদ দেয়া এবং মুমিনদের প্রতি স্পষ্টভাবে কটাক্ষ না করলেও ইশারা-ইঙ্গিতে তা করতে ছাড়েনি। হে মুসলিম যুবক! তুমি নাস্তিকদের চরিত্রে অঙ্গীকার পূরণ ও তাদের বন্ধুত্বে নিষ্কলুষতা ততক্ষণ পাবে না, যতক্ষণ না তাদের অনুসরণ করবে এবং তাদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করবে।

• প্রকৃত মুসলিম যুবক ইসলামের উদারতার মূর্তপ্রতীক হয় এবং আত্মশুদ্ধির জন্য ইসলামের উন্নততর শিষ্টাচারকে গ্রহণ করে। যখন তার ও ইসলাম বিরোধীদের মাঝে দেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোন কাজ এসে উপস্থিত হয়, তখন সে নম্রতা ও ইনছাফের সাথে তাদের সঙ্গ দেয়। আর যখন তার ও তাদের মাঝে ইলম বা দ্বীনের ব্যাপারে সংলাপ হয়, তখন প্রকৃত সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বলিষ্ঠ প্রমাণ পেশ করা যথেষ্ট মনে করে এবং তার জিহ্বা বা কলমকে রুক্ষ কথা থেকে মুক্ত রাখে। তার মনের মধ্যে কখনো ক্রোধের উদ্রেক হলে তা গোপন রাখে। ধীরস্থিরতা, উত্তম চরিত্র ও নরম কথা অনেক সময় সত্য থেকে দূরে অবস্থানকারী একগুঁয়ে ব্যক্তির অন্তরকে আকর্ষণ করে এবং এর মাধ্যমে সে উপস্থাপিত দলীল নিয়ে চিন্তা করার প্রথম ধাপ অতিক্রম করে।

• প্রকৃত মুসলিম যুবক তার প্রতিপালকের সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে এবং রাষ্ট্রের দায়িত্বশীলদের কাছে তার সম্মান বৃদ্ধি পাওয়ার পরোয়া করে না। যদি তার সামনে দু'টি বিষয় আসে যার একটি স্রষ্টাকে সন্তুষ্ট করে আর অন্যটি ক্ষমতাশীলদের নিকট মর্যাদা লাভের নিকটবর্তী করে, তাহলে সে প্রথমটিকে বেছে নেয়। যদি সে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উপর রাষ্ট্রনায়কের সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দেয়, তাহলে সে যেন তার ঈমান পরীক্ষা করে নেয়। এ ধরনের মনোবৃত্তি তাকে এমন মনের অসুখে ভোগাবে যার জন্য সে কার্যকর ওষুধ অনুসন্ধান করবে। অথচ প্রকৃত ওষুধ হচ্ছে এ কথা জানা যে, আল্লাহ তাকে ক্ষমতাসীনদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবেন কিন্তু ক্ষমতাসীনরা আল্লাহ্র পাকড়াও থেকে তাকে বাঁচাতে পারবে না।

• প্রকৃত মুসলিম যুবক কখনো কখনো বিশেষ পরিস্থিতিতে পড়ে প্রকৃত সত্যের সবটুকু ব্যক্ত করতে না পেরে চুপ থাকতে বাধ্য হয়। কিন্তু সে কথা বললে সত্য ছাড়া আর কিছুই বলে না।

• প্রকৃত মুসলিম যুবক সাধারণ মানুষের ন্যায় ধন-সম্পদ বা পদমর্যাদার বিচারে মানুষের মর্যাদা নির্ণয় করে না। বরং কুরআন মাজীদ এবং সঠিক বিচার-বুদ্ধি যে মানদণ্ডে তাদের মর্যাদা নির্ণয় করেছে তার আলোকে সে তাদেরকে বিবেচনা করে। অর্থাৎ উপকারী জ্ঞান ও পূত-পবিত্র চরিত্র। যেমন আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে সম্মানিত ঐ ব্যক্তি যে সবচেয়ে বেশী আল্লাহভীরু' *(হুজুরাত ১৩)*।

• প্রকৃত মুসলিম যুবক জীবনের প্রয়োজন মেটাবার জন্য সম্পদ অর্জন করে, পবিত্রতা ও মর্যাদার ঢাল দ্বারা নিজেকে সুরক্ষিত করে এবং এজন্য সে তোষামোদের পথকে কঠিনভাবে ঘৃণা করে। কেননা তোষামুদে ব্যক্তি অপমানিত হতে পরোয়া করে না। মুসলিম যুবক আল্লাহ্র উপর ভরসা করে এবং সম্মানের পোষাক পরিধান করে পরকালমুখী হয়। যে পোষাক আল্লাহ তাকে পরিয়েছেন।

• প্রকৃত মুসলিম যুবক ভাল মানুষের সামনে অহংকারে মাথা উঁচু করে না। যদিও সে তাদের চেয়ে জ্ঞানী, উচ্চ পদমর্যাদার অধিকারী, বিত্তবান ও সুখ্যাতির অধিকারী হয়। অহংকার ও বড়ত্ব মনের এমন কদর্য স্বভাব যার মাধ্যমে অহংকারী ব্যক্তি তার অজানা দোষ-গুণ থেকে নিজেকে আড়াল করতে চায়।

• প্রকৃত মুসলিম যুবক ঐ ব্যক্তির সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় যে তার নম্রতাকে হীনতা ও নির্বুদ্ধিতা মনে করে। যাতে সে তাদেরকে দেখাতে পারে যে, অপদস্থতা ও প্রকৃত ঈমান এক মনে মিলিত হতে পারে না।

• প্রকৃত মুসলিম যুবক কোন খারাপ কাজ হতে দেখলে নিষেধ করে এবং কোন ভাল কাজ পরিত্যক্ত হতে দেখলে তা করার আদেশ দেয়। সমাজ সংস্কারের প্রতি অনাগ্রহী যুবকদের ন্যায় সে বলে না, ওটা মাওলানা ছাহেবদের কাজ। ইসলাম সৎকাজের আদেশ দেয়া এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করাকে শুধু মাওলানা ছাহেবদের জন্য নির্দিষ্ট করেনি; বরং যে ভাল কাজকে ভাল হিসাবে জানে সে বিষয়ে আদেশ করা এবং যে খারাপ কাজকে খারাপ হিসাবে জানে সে বিষয়ে নিষেধ করাকে তার জন্য আবশ্যক করেছে। এ ব্যাপারে যুবক, বৃদ্ধ, পাগড়ি পরিহিত ও খালি মাথাওয়ালাদের মধ্যে পার্থক্য করা হয়নি।

ভ্রাতৃবর্গ! মুসলিম যুবক কেমন চরিত্রের হওয়া উচিত এতক্ষণ আমরা তা উল্লেখ করলাম। যদি তারা এটি সার্বিকভাবে অনুধাবন করে তাহলে আমরা নিশ্চিত যে, মুসলিম উম্মাহ যে কোন শক্তির সামনে মাথা উচুঁ করে দাঁড়াতে পারবে এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বন্ধু ও সাহায্যকারী পাবে।

ব্যক্তিত্ব গঠন

অন্তরকে পূর্ণ কর দয়া দিয়ে
শরীরকে পূর্ণ কর উৎফুল্লতা দিয়ে
দৃষ্টিকে পূর্ণ কর কোমলতা দিয়ে
দিব্যদৃষ্টিকে পূর্ণ কর আশা দিয়ে
হাতকে পূর্ণ কর কর্ম দিয়ে
মনকে পূর্ণ কর বিস্ময় দিয়ে
কল্পনাকে পূর্ণ কর সম্ভাবনা দিয়ে
প্রতিটি মুহূর্তকে পূর্ণ কর দয়া-দাক্ষিণ্যে
দিনগুলো পূর্ণ কর স্ফূর্তি দিয়ে
জীবনকে পূর্ণ কর পবিত্রতা দিয়ে
আত্মাকে পূর্ণ কর সদ্গুণ দিয়ে
তৎপরতাকে ভরে দাও আনন্দ দিয়ে
ইবাদতকে ভরে দাও কৃতজ্ঞতা দিয়ে
পৃথিবীকে ভরে দাও শান্তি দিয়ে
বিশ্বজগতকে পূর্ণ করে দাও সম্প্রীতি-ভালবাসার সৌরভে ॥

আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রাথমিক ইতিহাস

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

আহলেহাদীছ কোন নতুন দল নয় এবং দ্বাদশ শতকের সমাজ সংস্কারক মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহহাব নাজদী (১১১৫-১২০৬হি.) বা অন্য কোন ব্যক্তি এ দলের প্রতিষ্ঠাতাও নন; বরং এ দলের প্রতিষ্ঠাতা স্বয়ং রাসূলে কারীম মুহাম্মাদ (ছাঃ)। হাফিয ইবনু কাছীর (রহঃ) উল্লেখ করেন যে, هذا شرف لأصحاب الحديث لأن إمامهم النبي صلى الله عليه وسلم– 'এটি আহলেহাদীছদের সবচেয়ে বড় সম্মান-মর্যাদার বিষয়। কেননা তাদের ইমাম হচ্ছেন নবী করীম (ছাঃ)' *(তাফসীর ইবনে কাছীর, ৩/৭৩পৃ.)*। ইমাম চতুষ্টয়ের বহু পূর্ব হতে পৃথিবীতে এ দলের অস্তিত্ব বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু যারা আহলেহাদীছগণকে কয়েক শতাব্দীর নতুন দল বলে গণ্য করতে চান, তারা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে ইতিহাস, মিলাল (বংশ পরিচয়) ও ফিক্বহ গ্রন্থ সম্পর্কে তাদের অনভিজ্ঞতা ও অজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে থাকেন। আবার অনেকে বলে থাকেন যে, আহলেহাদীছ হচ্ছে শুধু হাদীছ বিশারদ বা মুহাদ্দিছগণের নাম। কিন্তু একথা সঠিক নয়; বরং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারী সকল মুসলিমকে আহলেহাদীছ বলা হয়। আর আহলেহাদীছগণের পরিগৃহীত ও অনুসৃত মাসআলাগুলির প্রায় সবই মাযহাব চতুষ্টয়ের অন্তর্গত কোন না কোন দল কর্তৃক নিশ্চিতরূপে সমর্থিত হয়েছে। তবে আহলেহাদীছগণ প্রচলিত মাযহাবগুলির মধ্যে নির্দিষ্ট কোন একটির অন্তর্ভুক্ত ও অনুসারী নন। তারা সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বতন্ত্র। ছাহাবায়ে কেরামের যুগের সকল মুসলমান এবং পরবর্তীকালে সাধারণ মুসলমানদের একটি দল এ নামে পরিচিত ছিলেন। অবশ্য ছাহাবা ও তাবেঈদের 'আহলুলহাদীছ' নামকরণ ছিল কেবল বৈশিষ্ট্যগত, স্বতন্ত্র পরিচিতির জন্য নয়। কারণ ভিন্ন পরিচয়ে তখন কোন দলই মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ছিল না। কিন্তু ৩৭ হিজরীর পরে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় ঘটতে থাকলে তাদের বিপরীতে যারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের পথ ও পন্থা অনুসরণ করেন তাঁরা 'আহলুল হাদীছ' বা 'আহলুস সুন্নাহ' নামে পরিচিত হন।

সুতরাং ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনে ইযামের যুগে সবাই আহলেহাদীছ ছিলেন। সে যুগে মাযহাবী ফির্কাবন্দী বা দলীয় বিভক্তি ছিল না। ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন, 'প্রত্যেক বিদ্বান একথা অবগত যে, ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন ও তাবে' তাবেঈনদের কেউ কারো মুকাল্লিদ বা অন্ধ অনুসারী ছিলেন না' *(আল-কাওলুল মুফীদ, পৃ. ১৫)*। মুসলমানদের মধ্যে ফিরকাবন্দী বা দলগত ভিন্ন ভিন্ন গণ্ডি কায়েম হওয়ার আগে আহলেহাদীছ ও মুসলমান উভয় শব্দের তাৎপর্য এক ও অভিন্ন ছিল। যারা মুসলমান ছিলেন তারা সকলেই ছিলেন আহলেহাদীছ। নিম্নোক্ত হাদীছ এ বিষয়ের প্রোজ্জ্বল প্রমাণ।

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَأَى الشَّبَابَ قَالَ مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُوَسِّعَ لَكُمْ فِيْ الْمَجْلِسِ وَأَنْ نُفَهِّمَكُمُ الْحَدِيْثَ، فَإِنَّكُمْ خُلُوْفُنَا وَأَهْلُ الْحَدِيْثِ بَعْدَنَا–

প্রখ্যাত ছাহাবী আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) কোন মুসলিম যুবককে দেখলে বলতেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অছিয়ত অনুযায়ী আমি তোমাকে সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে তোমাদের জন্য মজলিস প্রশস্ত করে দেওয়ার এবং তোমাদেরকে হাদীছ বুঝানোর নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা তোমরা আমাদের স্থলাভিষিক্ত ও পরবর্তী আহলেহাদীছ *(মুস্তাদরাকে হাকিম, ১/৮৮পৃ.; শারফু আছহাবিল হাদীছ, পৃ. ২১)*।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবাগণকে আহলেহাদীছ নামে অভিহিত করেছেন এবং ছাহাবায়ে কেরামের শিষ্যমণ্ডলী তাবেঈগনকেও আহলেহাদীছ বলে আখ্যায়িত করেছেন। সর্বাধিক হাদীছ বর্ণনাকারী প্রসিদ্ধ ছাহাবী আবু হুরায়রা (রাঃ) নিজেকে গর্বভরে আহলেহাদীছ বলতেন। তিনি বলতেন, أنا أول صاحب حديث في الدنيا- 'আমি পৃথিবীর সর্বপ্রথম আহলেহাদীছ' *(আল-ইছাবাহ, ৪/৩৮৬ পৃ.; তাযকিরাতুল হুফ্ফায ১/৩২পৃ.; তারীখু বাগদাদ, ৯/৪৬৭পৃ.)*। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাসকেও আহলেহাদীছ বলা হয়েছে *(তাবাকাতুয যাহাবী ১/২৩পৃ.; তারীখু বাগদাদ, ৩/২২৭পৃ.)*। খায়রুদ্দীন যিকিরলী আবুদ দারদা (রাঃ) (মৃত্যু ৩২হি.)-এর জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন, 'আহলেহাদীছগণ তাঁর মাধ্যমে ১৭৯টি হাদীছ বর্ণনা করেছেন' *(আল-আ'লাম, ৫/১০৫পৃ.)*।

ইমাম আহমাদ ইবনু তায়মিয়া (৬৬১-৭২৮হি.) বলেন, ইমাম আবু হানীফা, মালেক, শাফেঈ ও আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহঃ)-এর জন্মের বহু পূর্ব হতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের প্রাচীন একটি মাযহাব ছিল। সেটি হল ছাহাবায়ে কেরামের মাযহাব, যাঁরা তাদের নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট থেকে সরাসরি জ্ঞান অর্জন করতেন। আবুল কাসেম হিবাতুল্লাহ লালকাঈ (মৃ. ৪১৮হি.) স্বীয় গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর হতে ছাহাবা, তাবেঈন ও তৎপরবর্তী যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ও স্থানে তাঁর সময় পর্যন্ত ১৯১ জন নেতৃস্থানীয় আহলেহাদীছ ব্যক্তিত্বের নাম লিপিবদ্ধ করেন। ইমাম আব্দুর রহমান ছাবূনী (৩৭২-৪৪৯হি.) ইমাম মালিক, শাফেঈ ও আহমাদ (রহঃ) থেকে তাঁর যুগ পর্যন্ত ৪৭জন শীর্ষস্থানীয় আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দের নাম উল্লেখ করেছেন। অনুরূপভাবে ইবনু নাদীম (মৃ. ৩৭০হি.) ৬৪ জন আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দের পরিচয় উপস্থাপন করেছেন *(আহলেহাদীছ আন্দোলন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ, পৃ. ৫১)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ওফাতের পরে ছাহাবায়ে কেরাম ছিলেন কুরআন-হাদীছ তথা অহি-র আলোকে জীবন গড়ার আন্দোলনে প্রথম সারির মানুষ। তাঁরা ইস্পাত কঠিন ঈমানী দৃঢ়তা ও দলীল-প্রমাণের আলোকে ইসলামের উপর আপতিত প্রাথমিক যুগের হামলাগুলি প্রতিহত করেন। একদিকে তাঁরা মুনাফিক, মুরতাদ, যাকাত অস্বীকারকারী ও ভণ্ড, মিথ্যা নবীদের রক্তক্ষয়ী আন্দোলন এবং তৎকালীন বিশ্বের দুই পরাশক্তি রোম-ইরানের মুকাবিলা করেন।

অপরদিকে কুরআন সংকলন, হাদীছের পঠন-পাঠন ও বর্ণনার মাধ্যমে দ্বীনের ব্যাপক প্রচার-প্রসার আন্দোলন অব্যাহত রাখেন। ছাহাবায়ে কেরামের হাতে বিজিত তৎকালীন ইসলামী বিশ্বের সর্বত্র তখন কেবল কুরআন-হাদীছের প্রচার-প্রসার চলছিল। সবখানে কুরআন-হাদীছের বাণী গুঞ্জরিত হচ্ছিল। যাকে আহলেহাদীছ আন্দোলনের হৃদস্পন্দন বলা যায়। ইসলামের সর্বাপেক্ষা নির্ভেজাল ও সোনালী ঐতিহ্য মণ্ডিত এ যুগ ছিল আক্বীদাগত সকল বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত *(ঐ, পৃ. ৮৪)*।

আল্লামা খতীব বাগদাদী (মৃত ৪৬৩ হি.) বলেন, তিনজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব তাদের যুগে আহলেহাদীছ নামে অভিহিত হতেন। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) তাঁর যুগে, ইমাম শা'বী (রহঃ) তাঁর যুগে এবং সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) তাঁর যুগে' *(তারীখু বাগদাদ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২২৭)*।

৪৮জন ছাহাবীর নিকট থেকে হাদীছ শ্রবণকারী ও পাঁচশত জন ছাহাবীর দর্শন লাভকারী প্রখ্যাত তাবেঈ বিদ্বান ইমাম শা'বী (২২-১০৪হি.) সকল ছাহাবায়ে কেরামকে আহলেহাদীছ নামে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, ما حدثت إلا بما أجمع عليه أهل الحديث، 'যে সকল মাসআলায় আহলেহাদীছগণ একমত হয়েছেন, আমি কেবল সেগুলি বর্ণনা করেছি'। হাফেয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী বলেন, يعني به الصحابة رضي الله عنهم 'ইমাম শা'বী আহলেহাদীছ শব্দ দ্বারা ছাহাবায়ে কেরামের দলের কথা বুঝিয়েছেন' *(তাযকিরাতুল হুফ্ফায ১/৭৭পৃ.)*। তাবেঈ শ্রেষ্ঠ এই ইমাম শা'বী স্বয়ং আহলেহাদীছরূপে প্রসিদ্ধ ছিলেন *(তারীখু বাগদাদ, ১/২২৭)*।

ইমাম মালিক ও তাঁর শিক্ষক ইমাম যুহরীর ওস্তাদ বনু নাজ্জারের সূর্য সন্তান ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ আল-আনছারী (মৃত্যু ১৩৪হি.) তৎকালীন যুগে আহলেহাদীছগণের অগ্রণী ব্যক্তি বলে পরিগণিত হতেন *(আল-আ'লাম, ৮/১৪৭পৃ.)*। আবু বকর আল-খতীব আল-বাগদাদী বলেন, 'আবদুল মালিক ইবনু আবী সুলায়মান, আছিম আল-আহওয়াল, ওবায়দুল্লাহ বিন ওমর, ইয়াহইয়াহ ইবনু সাঈদ আনছারী প্রমুখ তাবেঈ আহলেহাদীছ নামে অভিহিত হতেন' *(তারীখু বাগদাদ, ১৪/১০৫পৃ.)*।

সুতরাং বুঝা যায় ছাহাবী ও তাবেঈদের যুগে আহলেহাদীছ ছিল, কিন্তু অন্য কোন মাযহাব ছিল না। কেননা ইসলাম ও আহলেহাদীছের আদর্শ এক ও অভিন্ন ছিল। ফলে ইসলামী বিশ্বে ফিরকাবন্দী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অব্যবহিতকাল পূর্ব পর্যন্ত মুসলমানদের প্রতিপালিত মতাদর্শ ছিল আহলেহাদীছ। কিন্তু ৩৭ হিজরীর পরে যখন খারেজী ও শী'আদের উত্থান ঘটে, ই'তিযাল ও ইরজার ফিতনার সাথে সাথে কিতাব ও সুন্নাতের স্বচ্ছ সলিলে রায় ও কিয়াসের আবর্জনা মিশ্রিত হতে থাকে, তখন রাসূলে কারীমের অনুসারী ছাহাবায়ে কেরাম নিজেদের আদর্শিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্য আহলেহাদীছ নাম গ্রহণ করেন। সে সময় কিছু লোক তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কুরআনের ব্যাপারে কোন কারসাজি না করলেও হাদীছের মধ্যে কিছু ভেজাল সৃষ্টি করতে থাকে। তখন নির্ভেজাল সুন্নাতের অনুসারীরা 'আহলেসুন্নাত' নামে অভিহিত হন। কিন্তু ছাহাবীদের পরবর্তী যুগে যখন দু'টি দল সৃষ্টি হয় তখন একটি দল শুধু সুন্নাতের ব্যাপারে নয়; বরং কুরআনের ব্যাপারেও নিজেদের মনগড়া মত ও রায় চালাতে থাকে। ফলে এই দলের বিপরীত দল যারা কুরআন ও হাদীছ উভয়ের ব্যাপারে নিজেদের মনগড়া মত ও রায় না চালিয়ে কুরআন ও হাদীছে যেমন আছে তাকে ঐভাবে রেখে অনুসরণ করতে থাকেন তাদের নামকরণ হয় আহলে সুন্নাত বা আহলেহাদীছ। এভাবে তখন থেকে কুরআন ও হাদীছের নির্ভেজাল সত্যের অনুসারীরা আহলেহাদীছ নামে আখ্যায়িত হয়ে আসছেন এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত তারা এ নামে অভিহিত হবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِيْ مَنْصُوْرِيْنَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُوْمَ السَّاعَةَ- 'আমরা উম্মতের একটি দল সর্বদা বিজয়ী থাকবে। বিরুদ্ধবাদীরা ক্বিয়ামত পর্যন্ত তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না' (তাদের অপদস্ত করতে পারবে না) *(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)*। উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় মুহাদ্দিছকুল শিরোমণি ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী (রহঃ) বলেন, هم أهل الحديث 'ঐ দলটি হল আহলেহাদীছ' *(তিরমিযী)*। ইমাম বুখারীও অনুরূপ বলেছেন। প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ ইয়াযীদ ইবনু হারূণ ও ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহঃ) বলেন, إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث فلا أدري من هم؟ 'ঐ বিজয়ী দলটি যদি আহলেহাদীছ না হয় তাহলে আমি জানি না তারা কারা'? *(ফাতহুল বারী)*। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহঃ) আরো বলেন, أن الطائفة المنصورة التي يرفع الخذلان عنهم إلى قيام الساعة هم أصحاب الحديث- 'ক্বিয়ামত পর্যন্ত বিজয়ী বা সাহায্যপ্রাপ্ত দল যাদের থেকে অপমান, লাঞ্ছনা তুলে নেয়া হয়েছে, তারা হচ্ছে আহলেহাদীছ' *(খাছাইছু আহলিল হাদীছ, পৃ. ৫৫)*।

উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ছাহাবীগণের কেউ কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলেন না। অথচ তারা মুসলিম নামের সাথে আহলেহাদীছ নামে পরিচিত হতেন। ছাহাবীদের পরবর্তী যুগে তাবেঈগণের কেউ কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলেন না। বরং ছাহাবী ও তাবেঈগণ সকলেই আহলেহাদীছ ছিলেন। উল্লেখ্য যে, ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে ইযাম, মুহাদ্দিছীন ও হাদীছপন্থী ফক্বীহগণই কেবল আহলেহাদীছ ছিলেন না; বরং তাঁদের নীতির অনুসারী ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী সাধারণ জনগণও সকল যুগে 'আহলুল হাদীছ' নামে অভিহিত হতেন এবং বর্তমান যুগেও হয়ে থাকেন। হিজরী ৫ম শতকের খ্যাতনামা বিদ্বান ইমাম ইবনু হাযম আন্দালুসী (মু. ৪৫৬ হি.) বলেন, وأهل السنة الذين نذكرهم أهل الحق ومن عداهم فأهل الباطل فاهم الصحابة رضي الله عنهم وكل من سلك نهجهم من خيار التابعين رحمة الله عليهم ثم أهل الحديث ومن تبعهم من الفقهاء جيلا فجيلا إلى يومنا هذا ومن اقتدي بهم من العوام في شرق الأرض وغربها رحمة الله عليهم- 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত যাঁদেরকে আমরা হক্বপন্থী ও তাঁদের বিরোধীদেরকে বাতিলপন্থী বলেছি, তাঁরা হলেন ছাহাবায়ে কেরাম, তাঁদের অনুসারী শ্রেষ্ঠ তাবেঈগণ, অতঃপর আহলুল হাদীছগণ ও ফক্বীহদের মধ্যে যারা তাদের অনুসারী হয়েছেন যুগে যুগে আজকের দিন পর্যন্ত এবং পূর্ব-পশ্চিমের ঐসকল সাধারণ জনতা, যারা তাঁদের সাধারণ অনুবর্তী হয়েছেন' *(কিতাবুল ফিছাল ফিল মিলাল ওয়াল আহওয়া ওয়ান নিহাল, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১৩)*।

তাওহীদের শিক্ষা ও আজকের সমাজ

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

[১৯৮০ সালের ৬ এপ্রিল, রবিবার 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে 'তাওহীদের শিক্ষা ও আজকের সমাজ' শীর্ষক এক সেমিনার ইসলামিক ফাউণ্ডেশন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সভাপতি ডঃ মাওলানা আব্দুল বারী সভাপতিত্ব করেন এবং সঊদী সরকারের মাননীয় রাষ্ট্রদূত ফুয়াদ আব্দুল হামীদ আল-খতীব প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত হন। এই সেমিনারে যুবসংঘ-এর তৎকালীন আহ্বায়ক জনাব মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব উক্ত শিরোনামে যে প্রবন্ধ পাঠ করেন তা দৈনিক আজাদের ৪টি সংখ্যায় (১১,১৮ ও ২৫ এপ্রিল এবং ৯ মে'৮০) প্রকাশিত হয়। ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিবেচনায় উক্ত প্রবন্ধটি 'তাওহীদের ডাক' পাঠকদের জন্য পত্রস্থ করা হল।]

তাওহীদের অর্থ :

তাওহীদের অর্থ হল- আল্লাহ এক, তাঁর কোন শরীক নেই, একথা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করা। তিনিই আদি তিনিই অন্ত, তিনি চিরস্থায়ী চিরঞ্জীব। তিনিই অন্নদাতা, তিনিই পালনকর্তা, তিনিই বিপদহন্তা, তিনিই আইনদাতা, তিনিই সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস। তিনি ব্যতীত অন্য কেউই আমাদের শর্তহীন আনুগত্য ও উপাসনা পাবার যোগ্য নয়। একমাত্র তিনি ব্যতীত অন্য কারো দরবারে আমাদের উন্নত মস্তক অবনত হবে না।

তাওহীদের ব্যাখ্যা :

তাওহীদ দুই প্রকার। **প্রথম** : তাওহীদে রুবুবিয়াত। অর্থাৎ নাম ও গুণাবলীর একত্বসহ আল্লাহ্র একক সত্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।

দ্বিতীয় : তাওহীদে ইবাদত বা ইলাহিয়াত। অর্থাৎ যাবতীয় চাওয়া-পাওয়া, আবেদন-নিবেদন ও আনুগত্যের দাবীদার হিসাবে একমাত্র আল্লাহকেই বিশ্বাস করা।

প্রথম প্রকারের তাওহীদের দলীল হিসাবে আমরা এই আয়াত উল্লেখ করতে পারি। আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহরই জন্য আসমান ও যমীনের সমস্ত মালিকানা। তিনিই জীবন দান করেন, তিনিই মৃত্যু দান করেন, তিনি সকল কাজের উপর কর্তৃত্বশীল। তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনি প্রকাশ্য, তিনি গোপন, তিনি সকল বিষয়ে পূর্ণ পরিজ্ঞাত' *(হাদীদ ৩)*।

দ্বিতীয় প্রকারের তাওহীদের দলীল হিসাবে আল্লাহ বলেছেন, 'আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিকট রাসূল পাঠিয়েছি কেবল এই দাওয়াত দেওয়ার জন্য যে, তোমরা একমাত্র আল্লাহ্রই আনুগত্য কর এবং তাগূতের আনুগত্য হতে বিরত থাক' *(নাহল ৩৬)*।

বলতে গেলে পুরা কুরআন শরীফই উক্ত দ্বিতীয় তাওহীদের আলোচনায় ভরপুর।

তাওহীদে রুবুবিয়াতের আলোচনা :

যিনি যে নামেই ডাকুন না কেন সকল ধর্মের সকল মানুষ এ বিশ্বচরাচরের একজন সৃষ্টিকর্তাকে স্বীকার করে নিয়েছেন। এমনকি জড়বাদী দার্শনিকগণ first cause বা 'প্রথম কারণ' হিসাবে এ সৃষ্টি জগতের পিছনে একজন ইচ্ছাময় মহাশক্তির অস্তিত্বকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন। আল্লাহই এর সাক্ষ্য দিয়ে বলেন, 'হে রাসূল! আপনি বলে দিন যে, তোমরা আল্লাহ নামে ডাক আর রহমান নামেই ডাক তাতে কিছুই যায় আসে না। কেননা আল্লাহর অনেকগুলি সুন্দর নাম রয়েছে' *(বনী ইসরাঈল ১১০)*।

শুধু তাই নয় দুনিয়ার সকল মানুষ আল্লাহকে জীবন-মৃত্যুর মালিক, একমাত্র রুযীদাতা, বিশ্বের পরিচালক ও ব্যবস্থাপক হিসাবেও মেনে নিয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, 'আপনি ওদেরকে জিজ্ঞেস করুন হে নবী! কে তোমাদেরকে আসমান ও যমীন হতে রূযির ব্যবস্থা করে থাকেন? তোমাদের শ্রবণ ও দর্শনের মালিক কে? কে প্রাণহীন বস্তু হতে জীবন্তকে এবং জীবন্ত হতে মৃত্যুকে বের করে আনেন? কে এই সৃষ্টি জগতের সকল কিছুই নিয়ন্ত্রণ করেন? তারা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিবে আল্লাহ। আপনি বলুন! তবে কেন তোমরা তাঁকে ভয় করো না?' *(ইউনুস ৩১)*।

তবে আল্লাহ নামটিই আল্লাহ্র সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় নাম। আল্লাহ নিজেই নিজেকে এই নামে অভিহিত করেছেন। সেকালে এটিকে ইসমে আযম বা শ্রেষ্ঠ নাম বলা হত। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ। আমি ব্যতীত দ্বিতীয় কোন উপাস্য নেই। অতএব তুমি কেবল আমারই আনুগত্য করো' *(ত্বহা ১৪)*।

আল্লাহ নামের প্রচলন আমরা ইহুদী-নাছারাসহ আরবের পৌত্তলিক এমনকি প্রতিবেশী হিন্দু সমাজের মধ্যেও দেখতে পাই। যেমন অথর্ব বেদে উক্ত হয়েছে।-

ত্রুং হোতার মিন্দ্রো হোতা ইন্দ্রো রামা হাসুরিন্দ্রাঃ
আল্লো জ্যেষ্ঠং শ্রেষ্ঠং পরমং পূর্ণং ব্রম্মণ অল্লাম ॥
(অল্ল উপরিষদ ৫ম সুক্ত)।

অর্থঃ সেই অল্ল অর্থাৎ পরমাত্মারূপী ইন্দ্র ঈশ্বর অপেক্ষা জ্যেষ্ঠ। অল্লকে গ্রহণ করা ঈশ্বরকে গ্রহণ করা অপেক্ষা কল্যাণকর। কারণ ঈশ্বরও তৎসকাশে পরিমাণে ক্ষুদ্র কিন্তু পরমাত্মা নিত্যপূর্ণ। এই হেতু তিনি ঈশ্বরেরও জননী। অন্যত্র বলা হয়েছে-

ইল্লল্লে বরুণো রাজা পুনর্দ্দদুঃ।
ইল্লল্লে কবর ইল্লাং কবর ইল্লাং ইল্লেতি ইল্ললে ॥

অর্থাৎ ক্ষিত্যাদি আকাশ যাবৎ নিখিল দ্যোতমান বস্তুই অল্ল কর্তৃক সৃষ্ট.....।' এমনিভাবে জাহেলিয়াতের যুগের আরবদের মধ্যেও আমরা আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসের সন্ধান পাই। যেমন মহানবীর (ছাঃ) জন্মবর্ষে ইয়ামনের শাসক আবরাহা যখন কাবা শরীফ ধ্বংস করার জন্য মক্কার উপর চড়াও হয়, তখন উপায়ান্তর না দেখে কাবাঘরের তালা ধরে মুতাওয়াল্লী হিসাবে রাসূলের দাদা আব্দুল মুত্তালিব ফরিয়াদ করে করুণ কণ্ঠে আল্লাহ্র নিকট যে আকুল প্রার্থনা জ্ঞাপন করেছিলেন তা আজও আমাদের হৃদয়কে অশ্রুসিক্ত করে তোলে। তাঁর প্রার্থনা ছিল- 'হে প্রভু! শত্রুর বিরুদ্ধে আমি তোমাকে ছাড়া অন্য কাউকে কামনা করি না। প্রভু হে! তুমি তাদের হাত থেকে তোমার এ পবিত্রভূমিকে রক্ষা কর।'

'নিশ্চয়ই তোমার এ গৃহের শত্রু কেবল সেই-ই হতে পারে যে তোমার শত্রু। অতএব হে প্রভু ! তুমি তোমার এই জনপদকে শত্রুবাহিনীর ধ্বংস প্রচেষ্টা হতে রক্ষা কর'।

অবশ্য আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলীর ব্যাপারে কিছু পরস্পর বিরোধী মতামত রয়েছে। যেমন বিশ্ববিশ্রুত গ্রীক দার্শনিক এরিষ্টটলের মতে এ

বিশ্ব চরাচরে সৃষ্টিকর্তা একটি পূর্ণাঙ্গ সত্তা। তিনি অনাদি অনন্ত, তিনি চির অবিনশ্বর। কিন্তু তার কোনরূপ ইচ্ছা করার কিংবা কাজ করার ক্ষমতা নেই।

এরিষ্টটলের দর্শনের অনুরূপ ইহুদীদেরও ধারণা ছিল যে, আল্লাহ ছয় দিনের মধ্যে সকল কিছু সৃষ্টি করে সপ্তম দিনে আরশে গিয়ে বিশ্রাম নিয়েছেন। এর প্রতিবাদ করে আল্লাহ বলেন, 'আমরা আসমান ও যমীন এবং উহার মধ্যস্থিত সকল বস্তুকে ছয়দিনে সৃজন করেছি। কিন্তু এতে আমাদের কোনরূপ ক্লান্তি স্পর্শ করেনি' *(ক্বাফ ৩৮)*।

ওদিকে নাছারাগণ কোন কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ্র মূল সত্তার অংশ বলে ধারণা করত। এর প্রতিবাদে আল্লাহ বলেন, 'তারা লোকদের মধ্যে কতককে আল্লাহর অংশ বলে সাব্যস্ত করেছে। নিশ্চয়ই মানুষ প্রকাশ্য হঠকারী' *(যুখরুফ ১৫)*।

অন্যত্র আল্লাহ প্রকৃতিবাদী দার্শনিকদের লক্ষ্য করে বলেন, 'তারা বলে যে, আমাদের এই পার্থিব জীবনটাই সবকিছু। আমরা এখানেই মরি, এখানেই বাঁচি এবং প্রাকৃতিকভাবেই আমরা ধ্বংস হই। আসলে এই ব্যাপারে তাদের সঠিক কোন জ্ঞান নেই বরং নিছক অনুমানের উপর ভিত্তি করেই তারা একথা বলে' *(জাছিয়াহ ২৪)*।

বিস্মিত হতে হয় এজন্য যে, এসব পণ্ডিতগণ প্রজ্বলিত বিজলী বাতিগুলির পিছনে সক্রিয় বিদ্যুৎ কেন্দ্রের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু কোটি পাওয়ারের সার্চলাইট সদৃশ মহাসূর্য ও জ্যোতির্মণ্ডিত নক্ষত্ররাজির পিছনে কোন সক্রিয় কুশলী শিল্পীকে বিশ্বাস করতে পারেন না।

অত:পর আল্লাহ্র রূপ ও গুণাবলী সম্পর্কে মুসলমানদের মধ্যে কিছু বিভ্রান্তি, ধোঁকা রয়েছে। যারা আল্লাহ্র হাত, পা, চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি কল্পনা করে নিয়েছে। তবে এ সম্পর্কে আমাদের মত এই যে, আল্লাহ ও তদীয় রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক আল্লাহ্র নাম, রূপ ও গুণাবলী সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে যেভাবেই বর্ণিত হয়েছে, ঐভাবেই এ বিশ্বাস করা এবং উহাতে কোনরূপ রূপক অর্থের আশ্রয় না নেয়াই বাঞ্ছনীয়। কেননা আল্লাহ্র রূপ আমাদের কল্পনার বাইরে। যেমন ঘোষণা করা হয়েছে, 'তার তুলনার মত কিছুই নেই' *(শূরা ১১)*।

উপরের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, নাম, গুণাবলীর ব্যাপারে কিছুটা মতপার্থক্য থাকলেও আল্লাহ্র মূল অস্তিত্বের স্বীকৃতিতে দুনিয়ার প্রায় সকল যুগের মানুষ ঐক্যমত পোষণ করত। তারা সকলেই এই জগতের একজন সৃষ্টিকর্তাকে মানত। তিনি যে রুযীদাতা, পালনকর্তা এবং সকল ক্ষমতার মালিক ছিলেন তাও মানত।

এক্ষণে প্রশ্ন হল, সকল যুগের সকল মানুষ যখন একজন স্রষ্টায় বিশ্বাসী ছিল তখন কোন দাওয়াত নিয়ে আল্লাহ তাদের নিকট যুগে যুগে নবী পাঠিয়েছিলেন? অতএব আমরা সেদিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করব।-

তাওহীদে ইবাদতের আলোচনা :

দুনিয়ার মানুষ সকলে আল্লাহকে একক স্রষ্টা হিসাবে স্বীকার করলেও প্রকৃত প্রস্তাবে কেউই আল্লাহ্র আনুগত্য করত না। বরং প্রত্যেক যুগে মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক ঈমানদার ব্যতীত বাকী সকলেই জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এক এক জন কল্পিত খোদার আনুগত্য করত। এই সব উপখোদারা কখনো রাজনৈতিক ক্ষমতায় বসে, কখনো বা অর্থনৈতিক শোষণের যাতাকলে, কখনও বা অন্য কোন মাধ্যম দিয়ে মানুষের বিবেককে গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ করেছে। ফলে নির্যাতিত মানবতা মুক্তির অন্বেষায় চিরদিন মাথা কুটে মরেছে।

মানুষকে সকল প্রকারের গোলামী হতে মুক্ত করে শুধুমাত্র আল্লাহ্র গোলামীর মাধ্যমে সত্যিকারের স্বাধীন মানুষে পরিণত করত: বিশ্বমানবতার মিলনতীর্থে জমায়েত করার জন্য যুগে যুগে নবী ও রাসূলগণ তাওহীদে ইবাদতের বিপ্লবী দাওয়াত পেশ করে গেছেন। এই দাওয়াত পৃথিবীর যে অঞ্চলে গিয়ে উপনীত হয়েছে, সেই অঞ্চলের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক যাবতীয় ক্ষেত্রে কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠীর মনে তখনই কম্পন শুরু হয়েছে। তাওহীদের কণ্ঠকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য তারা তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। ইবরাহীমের (আঃ) বিরুদ্ধে নমরূদের শত্রুতা, মূসার (আঃ) বিরুদ্ধে ফেরাঊনের অভিযান, ঈসার (আঃ) বিরুদ্ধে তার দেশের সম্রাটের হত্যা প্রচেষ্টা, শেষনবী মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহর (ছাঃ) বিরুদ্ধে আবু জেহেল, আবু লাহাবসহ গোটা আরবের কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠীর সম্মিলিত উত্থান- এ সবকিছুই আমাদেরকে উপরোক্ত কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। বলা বাহুল্য যে, মানব জীবনে তাওহীদে ইবাদত প্রতিষ্ঠা করার জন্যই মূলত: নবীদের আগমন ঘটেছিল।

তাওহীদে ইবাদত অর্থ- জীবনের সর্বক্ষেত্রে সর্বপ্রকারের আনুগত্য কেবলমাত্র আল্লাহ্র উদ্দেশ্যেই নিবেদিত করা এবং ত্বাগূতের আনুগত্যকে দূরে ছুড়ে ফেলা। সূরা নাহ্লের ৩৬ আয়াতে ইতিপূর্বেই আমরা তা অবগত হয়েছি।

এখানে ত্বাগূত অর্থ ইমাম মালেক (রহ:) বলেন, 'আল্লাহ ব্যতীত অন্য যারই আনুগত্য করা হয় তাকেই ত্বাগূত বলা হয়।'

আল্লামা ইবনুল কাইয়িম বলেন, 'যে ব্যক্তি কিতাব ও সুন্নাত ব্যতীত অন্য কিছুর নিকট কোন ব্যাপারে মোকদ্দমা পেশ করল সে ত্বাগূতের নিকট তা পেশ করল যা অস্বীকার করার জন্য আল্লাহ স্বীয় মুমিন বান্দাদেরকে নির্দেশ দান করেছেন।' হাফেয ইবনে কাছীরও (রহ:) অনুরূপ অর্থ ব্যক্ত করেছেন।

আল্লামা আব্দুর রহমান বিন হাসান এর আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন যে, যদি কোন ব্যক্তি অন্যকে নিজের আনুগত্যের প্রতি অথবা কোন গাছ, পাথর, বেদী, কবর বা কোন সাধু ব্যক্তির মূর্তি, কোন ফেরেশ্তা বা অনুরূপ কোন কিছুর প্রতি আনুগত্যের দাবী করে, তবে ঐ সকল কিছুকেই বলা হবে ত্বাগূত। এভাবে আল্লাহ ব্যতীত অন্য যে কোন কিছুর ইবাদত করা হবে তা শয়তানী ক্রিয়াকলাপ এবং তা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র বিরোধী হবে। অতএব তাওহীদ অর্থ হবে যাবতীয় ত্বাগূতকে অস্বীকার করা, আল্লাহকে ছেড়ে যাদের ইবাদত করা হয়।

এই ত্বাগূতসমূহকেই কুরআনে অন্য ইলাহ বলে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন হযরত নূহের (আঃ) দাওয়াতকে অস্বীকার করে তাঁর কওম বলেছিল, 'তারা আপোষে বলল যে, তোমরা নূহের কথায় তোমাদের ওয়াদ, সুয়া, ইয়াগুছ, ইয়াঊক, নসর প্রভৃতি ইলাহ উপাস্য মূর্তিগুলোকে পরিত্যাগ করো না' *(নূহ ২৩)*। বনি ইসরাঈলগণ মূসাকে (আঃ) বলেছিল, 'হে মূসা! আমাদের জন্যও একটি ইলাহ বানিয়ে দাও যেমন তাদের বহু ইলাহ রয়েছে' *(আ'রাফ ১৩৮)*। এমনিভাবে ফেরাঊন তার জাতিকে বলেছিল, 'হে আমার লোকেরা! আমি তোমাদের জন্য আমি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহকে জানি না' *(ক্বাছাছ ৩৮)*। এমনিভাবে আরবদের নিকট যখন আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) তাওহীদের দাওয়াত দিলেন, তখন তারা আশ্চর্য হয়ে বলে উঠল- 'ইনি কেমন লোক যে সকল ইলাহকে এক ইলাহ বানাতে চান! এটা নিশ্চয়ই বড় তাজ্জবের ব্যাপার' *(ছোয়াদ ৫)*। এখানে মক্কার লোকেরা ইলাহ বলতে তাদের মূর্তিসমূহকেই বুঝিয়েছে।

এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, দুনিয়ার সকল যুগের সকল মুশরিকদের উপাস্য দেবতা স্বতন্ত্র হলেও এবং কখনও উহার সংখ্যা দুই, তিন হতে শুরু করে তেত্রিশ কোটিতে গিয়ে ঠেকলেও একটি ব্যাপারে কিন্তু সকল মুশরিক অভিন্ন মত পোষণ করেন যে, এ সকল উপাস্যগুলি কেউই মূল খোদা নয় বরং সকলেই আল্লাহ্র নিকট অভাব-অভিযোগ পৌছানোর মাধ্যম বা সুপারিশকারী মাত্র। যেমন আল্লাহ বলেন, 'তারা আল্লাহকে ছেড়ে এমন কিছুর

ইবাদত করে যা তাদের কোন ক্ষতিও করতে পারে না, উপকারও করতে পারে না এবং তারা বলে যে, এরা আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট সুপারিশকারী মাত্র' *(ইউনুস ১৮)*। লক্ষণীয় যে, এই আয়াতে সুপারিশকারীর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনকে সারসরি ইবাদত বলে অভিহিত করা হয়েছে। ইবাদত বলতে যারা কেবলমাত্র আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে রুকূ-সিজদা করাকে বুঝাতে চান, সেই সকল পীরপূজারী ও কবরপূজারী এই আয়াত হতে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন।

অন্য আয়াতে এই সকল তথাকথিত সুপারিশকারীদেরকে সরাসরি আল্লাহর শরীক বলে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন কিয়ামতের দিনের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, 'আজ আর আমি তোমাদের সাথে কোন সুপারিশকারীকে দেখছি না যাদেরকে তোমরা একদিন শরীক ভাবতে। তোমাদের মধ্যকার সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তোমাদের সকল ধারণা মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়েছে' *(আন'আম ৯৪)*।

উপরের আলোচনা হতে একথা পরিস্কার হয়ে গেছে যে, আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে কোন প্রকার মাধ্যম মান্য করা প্রকাশ্য শিরক এবং এই মাধ্যমগুলিকেই আরবের লোকেরা 'ইলাহ' বলত। এতদ্ব্যতীত অত্যাচারী শাসক ফেরাউন নিজেকে ইলাহ বলেছিল। তাওহীদের কালেমা উপরোক্ত সকল প্রকারের ইলাহ সমূহের বিরুদ্ধে আপোষহীন বিদ্রোহ ঘোষণা করে দ্ব্যর্থহীনভাবে বলে গেছে-'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। 'নাই কোন ইলাহ আল্লাহ ব্যতীত'। রুবুবিয়াত ও ইবাদত অর্থাৎ প্রভুত্ব ও আনুগত্য দুটিরই দাবীদার একমাত্র আল্লাহ। অন্য কেউ নয়।

তাওহীদের শিক্ষা :

তাওহীদে রুবুবিয়াত ও তাওহীদে ইবাদতের সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর এবার আমরা তাওহীদের শিক্ষার উপরে যৎকিঞ্চিৎ আলোকপাত করতে প্রয়াস পাব।

১. আল্লাহকে জানা : তাওহীদের সর্বপ্রথম ও প্রধান শিক্ষা হল আল্লাহকে জানা। আল্লাহকে জানতে হবে সৃষ্টিকর্তা হিসাবে, পালনকর্তা হিসাবে, রুযীদাতা হিসাবে। জানতে হবে যে, আমি প্রকৃতির সন্তান নই কিংবা বানরের বংশধর নই বা হঠাৎ এ্যাকসিডেন্টের সৃষ্টি নই। আমি আমার ইচ্ছাতে কিংবা আমার বাপ-মায়ের ইচ্ছাতেই কেবল এই দুনিয়ায় আসিনি। বরং আমার সৃষ্টির পিছনে নিশ্চয়ই এক মহান ইচ্ছাময়ের মহৎ ইচ্ছা ক্রিয়াশীল রয়েছে। যার ইচ্ছাতেই আমি মায়ের গর্ভে জীবন লাভ করেছি। অতঃপর ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে আলো দিয়ে, বায়ু দিয়ে, জলে-স্থলে- অন্তরীক্ষে অপরিমেয় রূযী সঞ্চিত রেখে আমাকে লালন-পালন করে যাচ্ছেন। অতঃপর জ্ঞান ও চিন্তাশক্তির অমূল্য নেআমত দান করে আমাকে সৃষ্টির সেরা হওয়ার মর্যাদায় ভূষিত করেছেন।

এক্ষণে সেই মহান কারুণিক আল্লাহকে আমরা জানব কেমন করে। স্বয়ং আল্লাহ মেহেরবানী করে তার পাক কালাম মারফত আমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করে দিয়ে বলেন, 'তোমরা আল্লাহ্র রহমতের নিদর্শনসমূহ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ কর' *(রূম ৫০)*। বলাবাহুল্য, এই জগতের প্রতিটি সৃষ্টিই তার স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করে। ফুলের সৌরভ নাকে আসলেই আমরা ফুলের অস্তিত্ব অনুভব করি। ফুলটি গাঁদা না গোলাপ তাও বুঝতে পারি। সঙ্গে সঙ্গে তা যে কোন একটি গাছে ফুটেছে তাও জানতে পারি। এক্ষণে যদি কেউ একটি ছিন্ন ফুল হাতে নিয়ে বলে যে, এটার নাম আছে, গন্ধ আছে ঠিকই কিন্তু তা কোন গাছে ফোটেনি; বরং আপনা-আপনি ফুটে অস্তিত্বময় হয়েছে। তখন তাকে করুণা করা ব্যতীত আর কোন পথ থাকে কি?

আমাদের ঘরের বৈদ্যুতিক বাতিগুলি আমরা সুইচের সাহায্যে জ্বালাতে পারি, নিভাতে পারি। এর অর্থ এই নয় যে, আমিই বিদ্যুতের উৎপাদনকারী। এক্ষণে যদি কেউ নিজ চোখে দেখতে না পাওয়ার যুক্তি দেখিয়ে পঞ্চাশ মাইল দূরে অবস্থিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রকে অস্বীকার করে বসে তবে তাকে কি বলা যাবে?

অতঃপর ফুলের সৌরভ যেমন তার গুণ, তার নাম ও সঙ্গে সঙ্গে তার মূল গাছটির অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করে, তেমনি এই জগতের সৃষ্টিগুণ আল্লাহ্র স্রষ্টা নাম এবং অবশেষে স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করে। অনুরূপভাবে সৃষ্টি জগতের রুযির ব্যবস্থাপনা আল্লাহ্র রায্যাক নামের, নিত্যদিন জন্ম-মৃত্যুর যে খেলা চলছে তা তার 'মুহয়ী' ও 'মুমীত' নামের প্রমাণ বহন করে। সৃষ্টির মধ্যে যে দয়া ও ক্ষমাগুণের অনুভূতি রয়েছে তা তার 'তাওয়াব' ও 'গাফ্ফার' নামের প্রমাণ বহন করে। সঙ্গে সঙ্গে এসব নামের পিছনে একজন ইচ্ছাময়, প্রাণবন্ত মহা পরাক্রমশালী একক ও অবিভাজ্য সত্তার অস্তিত্বের প্রমাণও বহন করে। এবং তিনিই হলেন সেই মহান আল্লাহ।

আল্লাহ্র গুণাবলীর প্রকাশকে অনেকে একই সত্তার প্রকাশ ধারণা করে থাকেন। বিশ্ববিশ্রুত গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর এই দর্শনে বিশ্ব ও বিশ্বস্রষ্টার সত্তা একই। মৃত্যুর পর সকল প্রাণী স্রষ্টার একক সত্তার সাথে মিশে একাকার হয়ে যাবে।

গ্রীক দর্শনের এই সর্বস্ববাদী মতবাদ মুসলিম ছূফীদের মধ্যে 'ওয়াহদাতুল ওজুদ' বা সত্তার একত্ব মতবাদ নামে প্রচলিত। মনসুর হাল্লাজ, ইবনুল আরাবী, কবি হাফিয এমনকি আল-কিন্দী, আল-ফারাবী, ইবনুল মাসকাওয়াইহ, ইবনে সীনার মত দার্শনিকগণও প্লেটোর এই মতের সমর্থক ছিলেন।

যাহোক এটি সম্পূর্ণ তাওহীদবিরোধী মতবাদ। কেননা এই মতবাদে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। স্রষ্টার একটি অংশ হিসাবে মানুষ তখন তার নিজ সত্তার স্বাতন্ত্র্যবোধ হারিয়ে ফেলে। ফলে নিজ প্রবৃত্তির তাড়নায় সে যা-ই করে, তা-ই খোদার করা হচ্ছে বলে নিজেকে আল্লাহ্র নিকট কৈফিয়তের ঊর্ধ্বে মনে করে। এটি ইসলামী দর্শনের ঘোর বিরোধী।

২. পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য নিবেদন করা : আল্লাহকে চেনার পর তাঁর সৃষ্টি হিসাবে তাঁর ইবাদত বা আনুগত্য করা আমাদের উপর নৈতিক দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায়। বস্তুতঃ আমাদেরকে সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যই হল আল্লাহ্র ইবাদত করা। যদিও তাঁর ইবাদত করার জন্য সমস্ত সৃষ্টিজগত সর্বদা নিয়োজিত রয়েছে। তথাপি অন্যান্যের ইবাদতের তুলনায় স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির অধিকারী মানুষের স্বেচ্ছাকৃত ইবাদত আল্লাহ্র নিকট অধিক প্রিয়।

দুনিয়ার মানুষ রুবুবিয়াতের ক্ষেত্রে তাওহীদকে স্বীকার করেছে। কিন্তু ইবাদতের ক্ষেত্রে অধিকাংশ লোকই তাওহীদকে অস্বীকার অথবা অমান্য করেছে। আর মূলত: তাওহীদে ইবাদত প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানাতে গিয়েই সকল নবী স্ব স্ব জাতির নিকট লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত হয়েছেন। বস্তুত: আল্লাহকে একমাত্র প্রভু হিসাবে স্বীকার করলে জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাঁর আনুগত্য বা ইবাদত করা যে অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়- এ কথা দুনিয়ার মানুষ ইতিপূর্বেও বুঝতে চায়নি, আজও বুঝতে চায় না। অথচ ইবাদত ব্যতীত মুখে কেবল আল্লাহকে প্রভু হিসাবে স্বীকার কবার কোন অর্থই হয় না। শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ বলেন, 'ইবাদত হল রাসূলগণের যবানীতে আল্লাহ যে সকল নির্দেশাবলী পাঠিয়েছেন, তার পূর্ণ আনুগত্য করা। হাফিয ইবনে কাছীর বলেন, ইবাদত অর্থ আল্লাহ্র হুকুম সমূহ পালন করে ও নিষেধসমূহ হতে বিরত থেকে তাঁর আনুগত্য করা। অতঃপর আল্লাহ্র আইনের প্রতি আমাদের আনুগত্য হবে পূর্ণাংগ। যেমন আল্লাহ বলেন- 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা ইসলামের মধ্যে পুরাপুরিভাবে দাখিল হয়ে যাও' *(বাক্বারা ২০৮)*।

ত্রুটিপূর্ণ কোন কাজেই যেমন সফলতা আশা করা যায় না, তেমনি আল্লাহ্র আইনের কোন অংশ ছেড়ে কোন অংশ গ্রহণ করে তা পালন করলে তাকে পূর্ণাংগ ইবাদত বলা যায় না। এতে আশানুরূপ ফললাভ দূরে থাক বরং ক্ষতির আশংকাই বেশী। বলাবাহুল্য, এই একটি মাত্র কারণেই ইহুদী সমাজ আল্লাহ্র ক্রোধের শিকার হয়েছে। আল্লাহ এরশাদ করেন, 'তোমরা কি আমার কিতাবের কিছু অংশ মান্য করবে ও কিছু অংশ অমান্য করবে? যে ব্যক্তি তা করবে তার পরিণতি হল পার্থিব দুনিয়ায় চরম অপমান ও পরকালে মর্মান্তিক শাস্তি। আল্লাহ তোমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে গাফেল নন' *(বাক্বারা ৮৫)*।

৩. আল্লাহ্র সাথে শরীক না করা : তাওহীদের তৃতীয় শিক্ষা হল আল্লাহ্র সাথে শরীক না করা। বস্তুতপক্ষে আল্লাহকে একক প্রভু হিসাবে জানা এবং তার নিকট যাবতীয় আনুগত্য নিবেদন করার পর মন একথা স্বভাবতই বলে দেয় যে, আল্লাহ্র সাথে অন্য কাউকেও শরীক করব না। অন্য কারও গুণাবলীকে তাঁর গুণাবলীর তুল্য মনে করব না। প্রকৃত প্রস্তাবে এটিই সবচাইতে বড় অপরাধ। এই অপরাধ অমার্জনীয়। যেমন আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে অংশী স্থাপন করার অপরাধ কোনক্রমেই ক্ষমা করেন না। এছাড়া অন্য যে কোন অপরাধ ইচ্ছা করলে তিনি ক্ষমা করতে পারেন' *(নিসা ৪৮, ১১৬)*।

হযরত মুআয বিন জাবাল বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে সম্বোধন করে এরশাদ করেছেন যে, 'তুমি আল্লাহ্র সাথে কোন কিছুকেই শরীক করো না। যদিও তোমাকে হত্যা করা হয় অথবা জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়' *(আহমাদ, মিশকাত হা/৬১, হাদীছ ছহীহ)*।

শিরককে আমরা মোটামুটি পাঁচ ভাগে ভাগ করতে পারি। যথা- জ্ঞানগত শিরক, ভালবাসায় শিরক, ব্যবহারগত শিরক, উপাসনায় শিরক ও অভ্যাসগত শিরক।

১ম : ইশরাক ফিল ইল্ম বা জ্ঞানগত শিরক বলতে আমরা বুঝি, যে সকল বিষয়ের জ্ঞান কেবলমাত্র আল্লাহ্র জন্যই নির্দিষ্ট, সে সকল বিষয়ে অন্যেরও কিছু জ্ঞান আছে বলে বিশ্বাস পোষণ করা। যেমন গায়েবের খবর, অদৃষ্টের খবর ইত্যাদি। আল্লাহ বলেন, 'গায়েবের সকল চাবিকাঠি তাঁরই হাতে, তিনি ব্যতীত অন্য কেউই তা অবগত নয়' *(আন'আম ৫৯)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয় কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে তা একমাত্র আল্লাহই খবর রাখেন। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করে থাকেন এবং একমাত্র তিনিই জানেন মাতৃগর্ভে সন্তানের খবর। কোন ব্যক্তিই বলতে পারে না আগামীকাল সে কি উপার্জন করবে এবং কেউই বলতে পারে না কোন মাটিতে তার মৃত্যু ঘটবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও সর্ববিষয়ে অবহিত' *(লোকমান ৩৪)*।

উপরোক্ত আয়াত দ্বারা একথা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, যে সমস্ত লোক বাতেনী ইলমের দাবীদার এবং যেসব পীর, ফকীর ও গণকঠাকুরের দল গাজি পুথি নিয়ে ফালনামা খুলে, রাশিচক্র গুণে, হস্তরেখা দেখে, টিয়া পাখি উড়িয়ে বিবিধ প্রকারে নানা ভংগীতে মানুষের অদৃষ্ট গণনা করে থাকে, তারা নিঃসন্দেহে শিরকের মহাপাতকে লিপ্ত। অন্ধকারে ঢিল ছোড়ার ন্যায় এদের অনেক কথা অনেক সময় খেটেও যায়। এটি ইবলীসের কারসাজি। এরা যদি সত্য সত্যই গায়েবের খবর জানত তবে নিজেরা কেন নিজেদের ভাগ্য সম্পর্কে অজ্ঞ? তারা নিজেদের ও নিজেদের সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-বন্ধুদের অবস্থা কেন শুধরিয়ে নিতে পারে না?

আমরা মনে করি যারা এইসব মূর্খের পেতে রাখা ফাঁদে পা দেয় তারাই সবচেয়ে মূর্খ।

২য় : ইশরাক ফিল মুহাব্বত অর্থাৎ যে ভালোবাসা আল্লাহকে দেওয়া উচিত সেইরূপ ভালোবাসা অন্যকে নিবেদন করা। যেমন আল্লাহ বলেন, 'লোকদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্যকে শরীক হিসাবে মানে। তারা সেসব উপাস্যদেরকে এমন ভালোবাসে যেমন ভালবাসা কেবল আল্লাহকে দেয়া যায়। তবে যারা প্রকৃত ঈমানদার তারা আল্লাহকেই সর্বাপেক্ষা বেশী ভালোবেসে থাকে' *(বাক্বারা ১৬৫)*।

উক্ত আয়াতে রুবুবিয়াতের ক্ষেত্রে শিরকের কথা বলা হয়নি, রবং মুহাব্বতের ক্ষেত্রে শিরকের কথা বলা হয়েছে। কেননা অধিকাংশ লোক ভালবাসা ও সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে আল্লাহ্র সাথে শিরক করে থাকে। যখন আল্লাহ্র স্বার্থ ও আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ মুখোমুখি দেখা দেয়, তখন আমরা অনেকেই আল্লাহ্র স্বার্থকে নীচে রেখে ব্যক্তিগত স্বার্থকেই অগ্রাধিকার দিয়ে থাকি। অথচ আল্লাহ্র ঘোষণা হল, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের বাপ-দাদা ও ভাই- বেরাদারকে আপন বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। যদি নাকি তারা ঈমানের চেয়ে কুফরীর প্রতি বেশী আগ্রহী থাকে। মনে রেখ, যে ব্যক্তি এদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করবে, সে ব্যক্তি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। আপনি বলুন, হে নবী! যদি তোমাদের বাপ-দাদা, ভাই-বেরাদার, স্ত্রী-পরিজন, টাকা-পয়সা, ব্যবসা-বাণিজ্য, ঘর-বাড়ী আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা হতে অধিকতর প্রিয় হয়, তাহলে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ফায়সালা নেমে আসার অপেক্ষা করো। আল্লাহ হঠকারী ফাসেকদেরকে হেদায়েত করেন না' *(তওবা ২৩, ২৪)*।

৩য় : ইশরাক ফিত তাছাররুফ বা ব্যবহারগত শিরক : এর অর্থ আমাদের ব্যবহারিক জীবনে যে সমস্ত কার্জ একমাত্র আল্লাহ্র জন্য নির্দিষ্ট, সেগুলির উপর অন্যের ক্ষমতা আরোপ করা। যেমন- যথেচ্ছ হুকুম জারি করা, ইচ্ছামত আইন রচনা করা, জীবন-জীবিকার হ্রাস-বৃদ্ধি করা, রোগ মুক্তি দেওয়া, বিপদ হতে রক্ষা করা ইত্যাদি। যেমন আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই সার্বভৌম ক্ষমতা কেবল আল্লাহ্র জন্য' *(বাক্বারা ১৬৫)*।

অন্যত্র তিনি বলেছেন, 'আদেশ দানের সার্বভৌম ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্র জন্য' *(ইউসুফ ৪০)*। এক্ষণে আমরা রাষ্ট্রের প্রতি যে আনুগত্য পোষণ করি, তা আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বের অধীন। যদি তার কোন আইন আল্লাহ্র আইনের বিরোধী হয়, তবে তা মানতে জনগণকে বাধ্য করা যাবে না। কেননা রাসূলের প্রকাশ্য হুকুম হ'ল, 'স্রষ্টার অবাধ্যতায় সৃষ্টির প্রতি কোন আনুগত্য নাই' *(শারহুস সুন্নাহ, মিশকাত হা/৩৬৯৬, সনদ ছহীহ)*।

এমনিভাবে যদি কেউ ওলী-আওলিয়া, পীর-মাশায়েখ, ইমাম-মুজতাহিদদের কথাকে আল্লাহ ও রাসূলের কথার ঊর্ধ্বে স্থান দেয় তবে তাও শিরক হবে। যেমন ইহুদীদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'বস্তুত: তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের আলিম ও দরবেশদেরকে রব বানিয়ে নিয়েছে' *(তওবা ৩১)*। হযরত আদী বিন হাতেম তাঈ বর্ণিত হাদীছটি এই প্রসংগে স্মরণযোগ্য।

অনেকেই মনে করেন যে, ভক্তের মনের বাসনা পূর্ণ করা, বিপদ হতে রক্ষা করা ইত্যাদি ব্যাপারে ওলী-আওলিয়াদের কিছু হাত আছে। আল্লাহ এর প্রতিবাদ করে বলেন, 'যদি আল্লাহ তোমাকে কোন কষ্টের সম্মুখীন করেন তবে তা দূর করার ক্ষমতা তিনি ব্যতীত অন্য কারও নেই এবং তিনি যদি তোমার জন্য কোন মঙ্গল ইচ্ছা পোষণ করে থাকেন, তবে তা রদ করার ক্ষমতাও কারও নেই' *(ইউনুস ১০৭)*।

অনেকেই যুক্তি দেখিয়ে বলেন, আমরাতো ওলী-আউলিয়াদের ইবাদত করি না; বরং তাদেরকে আল্লাহর দরবারে সুপারিশকারী বা অসীলা মনে করি। এই যুক্তি আজকের নতুন নয়। ইহুদী ও মুশরিকরাও এই যুক্তি দিয়ে বলত, 'তারা আমাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট সুপারিশকারী মাত্র' *(ইউনুস ১৮)*।

আল্লাহ এর প্রতিবাদে বলেন, 'আপনি বলে দিন আল্লাহই যাবতীয় শাফআতের মালিক' *(যুমার ৪৪)*। তিনি যাকে ইচ্ছা এর অনুমতি দিতে পারেন। তা কারো এখতিয়ারাধীন নয়।

আশ্চর্যের বিষয়, যে ক্ষেত্রে স্বয়ং আল্লাহ্র নবীর (ছাঃ) কিছুই করার নেই, সেক্ষেত্রে ওলী-আওলিয়াদের সম্পর্কে এই ধরনের মন্তব্য যে কতবড় মূর্খতা তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যেমন আল্লাহ তাঁর প্রিয় হাবীবকে বলেন, 'আপনি বলে দিন যে, আমি তোমাদের কোনরূপ ক্ষতি বা উপকার করার ক্ষমতা রাখি না' *(জ্বিন ২১)*। যেখানে আমাদের নবী (ছাঃ) স্বীয় কন্যার জন্য কিছু করতে পারেননি, সেখানে আমাদের ওলী-আওলিয়া-পীরগণ মৃত্যুর পরও কবরে শুয়ে ভক্তের অভাব-অভিযোগ শ্রবণ করতে পারেন- এটি একটি উদ্ভট কল্পনা ছাড়া কিছুই হতে পারে কি?

আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) স্বীয় কন্যা ফাতেমাকে ডেকে বলেন, 'হে ফাতেমা! তুমি নিজেকে জাহান্নামের আগুন হতে বাঁচাও। তুমি আমার মাল-সম্পদ হতে যত ইচ্ছা চেয়ে নাও। কিন্তু মনে রেখ, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র সম্মুখে আমি তোমার কোন কাজে আসব না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩৭৩)*। আমরা মনে করি চিন্তাশীল ও ঈমানদার ব্যক্তিদের জন্য এটাই যথেষ্ট।

৪র্থ : ইশরাক ফিল ইবাদত বা উপাসনায় শিরক : কতগুলি সম্মানসূচক কাজ রয়েছে যা কেবলমাত্র আল্লাহ্র জন্যই নির্দিষ্ট। সেসকল বিষয়ে অন্যকেও শরীক করা। যেমন সিজদা করা, মাথানত করে রুকূ করার ন্যায় দাঁড়ানো, দু'হাত বেঁধে জোড়হাতে দাঁড়িয়ে থাকা, মানত করা, পশু কুরবাণী করা ইত্যাদি। যেমন আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই সিজদার স্থানগুলি কেবলমাত্র আল্লাহ্র জন্য। অতএব তোমরা তাঁর সাথে অন্য কাউকেও ডেক না' *(জ্বিন ১৮)*।

অপরের নামে উৎসর্গিত পশু হারাম হওয়া সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'শুকুর বা মৃত জীব যেমন হারাম অপরের নামে উৎসর্গিত পশুও তেমনি হারাম' *(মায়েদা ৩)*।

অতঃপর স্থান পূজার শিরক সম্পর্কে আল্লাহ্র নবী বলেন, 'যে পর্যন্ত আমার উম্মতের মধ্যে কতক সম্প্রদায় মুশরিকদের সঙ্গে মিলিত হয়ে না যাবে এবং যে পর্যন্ত কতগুলি সম্প্রদায় মূর্তি বা স্থান পূজা না করবে সে পর্যন্ত কিয়ামত আসবে না' *(আবু দাউদ, মিশকাত হা/৫৪০৬)*।

যারা খানকাহ ও দরগাহ পূজায় বিশ্বাসী বা যারা শহীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্তে শহীদ বেদীতে ফুল চড়ান, হাদীছটির প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

এমনিভাবে কবর পাকা করা, কবরে মসজিদ তৈরী করা, তাতে নাম খোদাই করা, কবরে বাতি দেওয়া, ফুল দেওয়া- এইসব কিছুই শরীয়তে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যেমন হাদীছে বলা হয়েছে, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিষিদ্ধ করেছেন কবর পাকা করতে, তার উপর সৌধ নির্মাণ করতে এবং তার উপর বসতে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৭০)*।

অন্য হাদীছে আল্লাহ লানত করেছেন যেমন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অভিসম্পাৎ করেছেন কবর যিয়ারতকারিনী মহিলাদেরকে এবং তাদেরকে যারা কবরে মসজিদ এবং গম্বুজ বানায়' *(আবু দাউদ, মিশকাত হা/৭৪০, সনদ হাসান)*।

৫ম : ইশরাক ফিল আদাত বা অভ্যাসগত শিরক :

এর অর্থ আমরা দৈনন্দিন জীবনে কথায় ও কাজে অভ্যাসবশতঃ অনেক সময় শিরক করে থাকি। যেমন কোন একটি দিন, ক্ষণ বা তিথিকে অশুভ মনে করা, কোন রোগকে সংক্রামক ধারণা করে রোগী হতে দূরে থাকা, বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় পিছন দিক হতে ডাক দেওয়াকে অশুভ মনে করা, স্ত্রীর শপথ, রক্তের শপথ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করা, কারও মাথার দিব্যি দেওয়া, ভাল লোকের নামে নাম রাখলে বরকত হবে ভেবে ছেলের নাম গোলাম রাসূল, গোলাম নবী, নবী বখ্শ, রাসূল বখ্শ, পীর বখ্শ, মাদার বখ্শ, গোলাম মঈনুদ্দীন প্রভৃতি নাম রাখা।

আল্লাহ বলেন, 'তোমরা তোমাদের মুখের কথা অনুযায়ী কোন বস্তুকে হালাল কোন বস্তুকে হারাম সাব্যস্ত করো না, যাতে আল্লাহ্র উপর মিথ্যারোপ হয়ে থাকে। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্র উপর মিথ্যারোপ করে তারা সফলকাম নয়' *(নাহ্ল ১১৬)*।

আজকের সমাজ

পূর্বের বিস্তারিত আলোচনায় তাওহীদের দৃষ্টিতে আমাদের আজকের সমাজের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে লজ্জায় চক্ষু নিচু হয়ে আসে। আমরা তাওহীদবাদী মুসলিম হওয়ার দাবী করি অথচ তাওহীদ বিরোধী কোন কাজেই আমরা মুশরিকদের হতে কোন অংশে পিছিয়ে নেই। সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্রে আজ তাওহীদ বিরোধী তৎপরতা ব্যাপক হয়ে দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে আমরা আজ চরম দেউলিয়াত্বের পর্যায়ে পৌঁছে গেছি। বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ঘুণ ধরার কারণে আমাদের সমাজদেহ ব্যাধিগ্রস্থ হয়ে পড়েছে।

আমরা আজ চরম বৈষম্যের মাঝে বিরাজ করছি। ফলে আমরা যাকে-তাকে বড় মনে করে যেখানে-সেখানে আনুগত্য নিবেদন করছি। যে ফুল সৃষ্টি হয়েছিল মানুষের মনে আনন্দ প্রদানের জন্য, সেই আজ নিবেদন হচ্ছে অন্যের পদতলে। একদিকে ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাতে গিয়ে আবার নবীকে নূরের মর্যাদা দিচ্ছি। টুপীতে, বাসের সম্মুখে একদিকে আল্লাহ অন্যদিকে মোহাম্মাদ লিখে আত্মতৃপ্তি লাভ করছি। কখনওবা মিলাদের মাহফিলে তাঁর রূহ হাজির হয়েছে ভেবে সম্মানে উঠে দাঁড়াচ্ছি, অন্যদিকে সমানে তাঁর আদর্শের বিরোধিতা করছি। একদিকে মসজিদে নামাজ পড়ছি, অন্যদিকে কবরের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে দে বাবা দে, দে বাবা বলে কাতর মিনতি করছি। এমনকি আজকাল কবরের উপরই মসজিদ নির্মিত হচ্ছে। নাউযুবিল্লাহ। একদিকে আল্লাহকে সকল ক্ষমতার অধিকারী ভাবছি, অন্যদিকে জনগণকে ক্ষমতার মূল উৎস বলে জোর গলায় ঘোষণা করছি। একদিকে আল্লাহকে বিধানদাতা বলে বিশ্বাস করছি, অন্যদিকে পার্লামেন্টে আইন রচনার ক্ষেত্রে শরীয়তকে বাদ দেওয়ার পায়তারা করছি। লালন সংস্কৃতি আমাদের সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে ছেয়ে ফেলছে। কি সুন্দর দ্বিমুখী চিন্তা! এই দ্বিমুখী নীতির সংঘর্ষে আমাদের সমাজ আজ বিপর্যস্ত। একদিকে গ্রীক ও হিন্দুদর্শন, অন্যদিকে তাওহীদি দর্শনে মুখোমুখি সমাজ। আমাদেরকে আজ এই দ্বিমুখী নীতি পরিহার করে খাঁটি তাওহীদপন্থী হতে হবে। একমাত্র তাওহীদের বিশ্বাসই মানুষকে সত্যিকারের আত্মবিশ্বাসী ও স্বাবলম্বী করে তুলতে পারে। যতদিন মুসলমান এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নিকট মাথা নত করেনি ততদিন সারা দুনিয়া তাদের পদতলে ছিল। কিন্তু আজকের মুসলমান আল্লাহকে ছেড়ে অন্যের দয়ার ভিখারী হয়েছে বলেই জগতে লাঞ্ছিত হচ্ছে। আমাদেরকে সকল দিক থেকে একত্ববাদী হতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, একমাত্র তাওহীদের বিশ্বাসই জাতীয় উন্নতি ও জান্নাতের মূল চাবিকাঠি। আল্লাহ আমাদের সবাইকে খাঁটি তাওহীদবাদী মুসলিম হওয়ার তাওফীক্ব দান করুন। আমীন!!

আল্লাহ তুমি আমাদের সকল ত্রুটি ক্ষমা করো এবং তোমার তাওহীদের পক্ষে আমাদের এই সামান্য খেদমতটুকু কবুল করো। আমীন!!

[সাধু থেকে চলিত ভাষায় রূপান্তরিত ও আধুনিক বানানরীতির সাথে সমন্বয়কৃত]

সাক্ষাৎকার

['বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের এই স্মৃতিচারণমূলক সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন 'তাওহীদের ডাক'-এর পক্ষ থেকে মুযাফফর বিন মুহসিন ও নূরুল ইসলাম]

** **তাওহীদের ডাক :** ১৯৭৫ সালে এক নাজুক পরিস্থিতিতে সাতক্ষীরায় আপনি একটি ইসলামী সেমিনারের আয়োজন করেছিলেন। কিভাবে সম্ভব হয়েছিল সেটা?*

আমীরে জামা'আত : হ্যাঁ! এটা একটি স্মরণীয় ঘটনাই বলা যায়। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ। ইসলামের নাম নিলেই তখন 'রাযাকার' হতে হয়। ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের জয়জয়কার। ঐ বৈরী পরিবেশে ইসলামী সমাবেশের নাম তোলাটা ছিল রীতিমত দুঃসাহসিক ব্যাপার। এমনি এক গুমোট পরিবেশে মনটা বিদ্রোহী হ'য়ে উঠল। তবে কি দেশ থেকে ইসলামের নাম মুছে যাবে? বন্ধুবর মৌলবী আব্দুল আযীয সাতক্ষীরা সরকারী গার্লস হাইস্কুলের মৌলভী শিক্ষক। হানাফী হলেও আমার বক্তব্য ও লেখনীর তিনি ভক্ত ছিলেন। সাপ্তাহিক 'আরাফাত'-এ আমার কোন লেখা বের হলে তা তাঁর দোকানে প্রকাশ্যে রাখতেন। তাকে প্রস্তাব দিলাম, সাতক্ষীরায় একটি ইসলামী সমাবেশ করতে হবে। ভয়ে মানুষ ওয়ায-মাহফিলের নাম মুখে আনতে চায় না। এ ভয় ভেঙ্গে দিতে হবে। উনি সানন্দে সহযোগিতা করতে রাজী হলেন। দোকানে বসেই পরিকল্পনা করলাম যে, দেশের বড় বড় আলেমদের আমরা ডাকব। আর সাতক্ষীরার সকল দলমতের নেতাদের নিয়ে আয়োজক কমিটি করা হবে। সে মোতাবেক কাজ শুরু হল। মাওলানা ছাহেব সাইকেল নিয়ে দৌড়ঝাঁপ শুরু করলেন। বুলারাটি আর সাতক্ষীরা একাকার করে ফেললেন। আমি বক্তাদের তালিকা করে ফেললাম। পূর্বধারণা মোতাবেক গোল বাঁধলো অনুমতির ব্যাপারে। ডিসি ছাহেব বললেন, 'উপরের নির্দেশ ছাড়া পারবো না।' আমরা তখন চিন্তা করতে লাগলাম কিভাবে শেখ মুজিবের সাথে যোগাযোগ করা যায়। সিদ্ধান্ত নিলাম তাঁর একান্ত শ্রদ্ধাভাজন মাওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশের সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে। তাই করা হল। মাওলানা তখন অতি বার্ধক্যে শয্যাশায়ী। তিনি শেখ সাহেবকে ফোন করে বলে দিলেন। আল্লাহ্র রহমতে তাতে কাজ হল এবং সেমিনারের অনুমতি মিলে গেল। সাতক্ষীরার সাতটি থানার অধিকাংশ থানা শহরে সুধী সমাবেশ করে সেমিনার কমিটি করলাম। কমিটিকে দায়িত্ব দিলাম সাধারণ মানুষ ছাড়াও এলাকার সব দলের নেতৃবৃন্দকে সাতক্ষীরা আনতে হবে। তাতে ব্যাপক সাড়া পেলাম। এবার বক্তাদের দাওয়াত দেয়ার পালা। জমঈয়ত সভাপতি ড. বারী ছাহেবকে দাওয়াত দেয়ার জন্য মাওলানা আব্দুল আযীয ঢাকা গেলেন। কিন্তু উনি এ পরিস্থিতিতে মোটেই রাযী হলেন না। কিন্তু নাছোড়বান্দা আব্দুল আযীয সারারাত ঘরের দরজায় পিঠ লাগিয়ে বসে থাকলেন। পরদিন সকালে দরজা খুলতেই ওনাকে দেখে স্যার হতবাক। আব্দুল আযীয পায়ে পড়ে বললেন, 'স্যার! দাওয়াত কবুল না করা পর্যন্ত সাতক্ষীরায় ফিরে যাব না।' অবশেষে তিনি দাওয়াত কবুল করলেন। তারপর ড. আফতাব আহমাদ রহমানী, দেওয়ান মুহাম্মাদ আজরফ, মাওলানা মহিউদ্দিন খান, ড. মুস্তাফীযুর রহমান, জাস্টিস বাকের, আ.ন.ম আব্দুল মান্নান খান, মাওলানা আব্দুল মান্নান *(দৈঃ ইনকিলাব)*, মাওলানা আব্দুল খালেক- আরও অনেককে দু'দিনব্যাপী সেমিনারের বক্তা হিসাবে আনা হল নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু দিয়ে। ১৯৭৫-এর মধ্য এপ্রিলে সেমিনারটি হল। সাতক্ষীরায় মানুষের ঢল নামল। ইসলামের নামে মানুষ যেন আবার প্রাণ ফিরে পেল। সাতক্ষীরা 'চিলড্রেন্স পার্ক' (বর্তমান আব্দুর রাযযাক পার্ক) লোকে লোকারণ্য। সফল এই প্রোগ্রামের পরের বছর একই সময়ে একই স্থানে পুনরায় দু'দিন ব্যাপী সেমিনার হল। আগের অতিথিগণ এবারও প্রায় সকলে উপস্থিত ছিলেন। সেখানে আমার বক্তব্যের বিষয় ছিল, 'কুরআনে বিজ্ঞান'। উন্মুক্ত বক্তৃতার মঞ্চে আমার নিয়মিত পদচারণা সম্ভবত তখন থেকেই শুরু হল।

** **তাওহীদের ডাক :** ১৯৮০ সালে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে সর্বপ্রথম ঢাকায় জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। 'যুবসংঘ'-এর ইতিহাসে এটি একটি বড় ঘটনা। এ বিষয়ে আমরা জানতে আগ্রহী।*

আমীরে জামা'আত : 'যুবসংঘ' গঠনের দু'বছরের মধ্যেই এত সাড়া পাব ভাবিনি। সিদ্ধান্ত নিলাম জাতীয়ভাবে একটি সম্মেলনের আয়োজন করব এবং তা ঢাকাতেই। সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় পকেটে আমাদের পুঁজি ছিল মাত্র ৬.৮০ টাকা। সিদ্ধান্ত হলো, কর্মীরা স্ব স্ব খরচে আসবে ও যাবে এবং শহরে আমাদের ৫টি মসজিদে রাত্রি যাপন করবে। কিন্তু বাধ সাধলেন নাযিরাবাজার জামে মসজিদের বৃদ্ধ মোতাওয়াল্লী হাজী নূর হোসেন। আমাকে একপাশে ডেকে নিয়ে বললেন, 'বাবা! বাচ্চারা সারাদেশ থেকে আসবে, আমরা তাদের দু'দিন দু'ওয়াক্ত খাওয়াতে পারব না? আপনি আমাদের এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত করবেন না এটাই আমাদের অনুরোধ।' আমি সানন্দে মেনে নিলাম। আবার মিটিং করে বাজেট তৈরী করা হল সর্বসাকুল্যে ৫০,০০০ টাকার। যুগ্ম আহ্বায়ক শামসুদ্দীন সিলেটি ভাই খুব তৎপরতার সাথে যুবসংঘের ছেলেদের নিয়ে অর্থ সংগ্রহের কাজটি সম্পন্ন করলেন। ছেলে-বুড়া সকলের মধ্যেই একধরনের উচ্ছ্বাস কাজ করছিল। আহলেহাদীছের নামে এরূপ যুবসম্মেলন এই প্রথম হতে যাচ্ছে। মহল্লায় মহল্লায় মিছিল। সে এক অনন্য রূপ। ইতিমধ্যে জানলাম ড. বারী স্যার রাজশাহী থেকে ঢাকা আসছেন। উনি বিদেশ যাবেন। ছুটলাম তাঁর কাছে। নিয়ে এলাম উনাকে এবং সহ-সভাপতি এডভোকেট আয়েনুদ্দীনকে বংশাল মসজিদে। বাদ মাগরিব উনি মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে সম্মেলনকে সফল করার জন্য কিছু কথা বলে চলে গেলেন। দশদিন পর উনি দেশে ফিরে এলে আবার তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং জানিয়ে দিলাম যে, ঐদিন পর্যন্ত প্রায় ৩০,০০০ টাকা আদায় হয়ে গেছে। শুনে তিনি আমার দিকে কিছুক্ষণ নির্বাক তাকিয়ে থেকে বললেন- 'গালিব তুমি বলছ কি?' ইসলামিক ফাউণ্ডেশন মিলনায়তন রিজার্ভ করার জন্য একটা দরখাস্ত লিখে নিয়ে গিয়েছিলাম তাতে উনার সুফারিশ নেওয়ার জন্য। কিন্তু না দিয়ে তিনি বললেন, 'তুমি সম্মেলনটা বংশালেই কর, কারণ এটা আহলেহাদীছ এলাকা।' উনার নিস্পৃহতা দেখে আমি কিছুটা যিদের স্বরেই বললাম, 'স্যার আমরা ইফাবা মিলনায়তনেই করতে চাই। কেননা আহলেহাদীছ এলাকার বাইরে আমাদের দাওয়াতকে সম্প্রসারিত করা প্রয়োজন।'

অতঃপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন স্থানে বড় বড় পোষ্টার মারা হল। ড. মুস্তাফীয স্যার এনিয়ে আমার সাথে একটু রসিকতাও করলেন। কেননা পোষ্টারে ড. সিরাজুল হকের নাম আছে হানাফী হওয়া সত্ত্বেও। কিন্তু ড. মুস্তাফিযের নাম নেই। যিনি আমার সবচেয়ে বড় হিতাকাঙ্খী। উনি শুধু এতটুকুই বললেন, 'কি গালিব! তোমাদের লাল রংয়ের পোষ্টারে যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লালে লাল হয়ে গেল!' পোষ্টার দেখে ঢাবি ছাত্রলীগের মাহমুদুর রহমান মান্না, ওবায়দুল কাদের প্রমুখ বলে বসল ড. বারী 'রাযাকার'। ওনাকে ঢাকায় কোন সম্মেলন করতে দেয়া হবে না। মুশকিলে পড়ে গেলাম। শেষমেশ আমার হলের ছাত্রলীগের নেতাদের ও যহুরুল হক হলের সভাপতি যে ছিল আহলেহাদীছ ঘরের সন্তান, তাকে দিয়ে ওদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিরস্ত করলাম। শুধু তাই নয়, তাদের মধ্যে আহলেহাদীছ কয়েকজন আমাদের সম্মেলনে স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্বও পালন করেছিল।

১৯৮০ সালের ৫ ও ৬ এপ্রিল। আহলেহাদীছ যুবসংঘের ইতিহাসে বরং আহলেহাদীছ আন্দোলনের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। ১ম দিন বেলা ১০টায় ইফাবা মিলনায়তনে সেমিনার। বিষয়- 'তাওহীদের শিক্ষা ও আজকের সমাজ'। প্রবন্ধ পাঠক আমি নিজে। ড. বারী স্যার ঢাকায় উনার ছোটভাই ড. আব্দুর রহমান ছাহেবের সায়েন্স ল্যাবরেটরীর সরকারী বাসায় উঠেছেন। সকালে ওনাকে নিতে গেলাম। সেমিনার উদ্বোধন করলেন। হানাফী-আহলেহাদীছ ওলামা ও সুধীবৃন্দের এতবড় সমাবেশ, সেই সাথে আহলেহাদীছ তরুণ ও যুবকদের উৎসাহ-উদ্দীপ্ত বিপুল উপস্থিতিতে আমাদের অন্তরটা ভরে উঠেছিল। কিন্তু কেন যেন ড. বারী স্যারের চেহারায় উৎসাহের ছোঁয়া পেলাম না। আমার প্রবন্ধ পাঠের পর আরবী উদ্ধৃতিসমূহের দিকে খেয়াল করে এবং শ্রোতাদের উৎসাহ দেখে সঊদী রাষ্ট্রদূত ফুয়াদ আব্দুল হামীদ আল-খত্বীব চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে আমার পিঠ চাপড়ে দিলেন। এরপর সভাপতির বক্তব্যের সময় ড. সিরাজুল হক তাঁর বক্তব্যে বললেন, জীবনে দেশে-বিদেশে বহু সেমিনারে যোগদান করেছি। কিন্তু আজ জীবনের প্রথম একটি সেমিনারে এলাম, যেখানে স্রেফ তাওহীদের উপর আলোচনা হল এবং যেখানে হাততালির বদলে বারবার 'মারহাবা' ও 'আলহামদুলিল্লাহ' শুনলাম। আমি স্নেহাস্পদ গালিবের জন্য দো'আ করি, যেন আল্লাহ তার তাওহীদের মিশন সাকসেসফুল করেন।' মাওলানা মুস্তাছির আহমান রহমানী, ড. আফতাব আহমাদ রহমানী, আবু তাহের বর্ধমানীসহ প্রত্যেক বক্তাই সেমিনারের ভূয়সী প্রশংসা করলেন। মুস্তাছির আহমাদ রহমানী উঠে প্রস্তাব করলেন যেন পঠিত নিবন্ধটি ইংরেজী ও আরবীতে অনুবাদ করে পুস্তিকা আকারে দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। সকলে সমস্বরে তাঁকে সমর্থন করলেন। বস্তুত: দেশব্যাপী সাংগঠনিক সফরে থাকা অবস্থায় যখনই একটু ফাঁক পেয়েছি, তখনই ওটা লিখেছি। এটি এমন আহামরি কিছু ছিল না। কিন্তু তখনকার বিরূপ পরিবেশে এধরনের বিষয়বস্তুর উপরে সেমিনার ছিল রীতিমত দুঃসাহসিক ব্যাপার।

সেমিনার শেষে ছেলেরা কয়েকটি ট্রাকে করে গুলিস্তান থেকে মীরপুর পর্যন্ত মিছিল করেছিল। কিছু সময়ের জন্য শিরক-বিদ'আত ও মাযারবিরোধী শ্লোগানে মুখরিত হয়েছিল ঢাকার রাজপথ। বায়তুল মুকাররম মসজিদ ঐদিন 'আমীন'-এর গুঞ্জরণে মুখরিত হল। সেদিন উক্ত মসজিদের ইমামসহ কয়েকজন মুছল্লী ছেলেদের জিজ্ঞেস করছিলেন এখানে এত লা-মাযহাবী কোথা থেকে এল? জবাবটাও মুখের উপর পেয়ে চুপসে যান তারা।

পরদিন ৬ এপ্রিল জাতীয় সম্মেলন। স্থানঃ ঢাকা যেলা ক্রীড়া সমিতি মিলনায়তন। ড. বারী স্যার ছিলেন সম্মেলনের সভাপতি এবং ড. আফতাব আহমাদ রহমানী বিশেষ অতিথি। সকাল ৯টায় উদ্বোধন। ৭টার সময় আমি ও এবাদুর রহমান (মহিমাগঞ্জ) বেবীটেক্সী নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। এবাদুরকে ট্যাক্সিতে বসিয়ে রেখে আমি উপরে উঠে গেলাম স্যারকে আনার জন্য। সায়েন্স ল্যাবরেটরীর বাসা থেকে স্যারকে অনেক কষ্টে নিয়ে আসলাম। কেননা উনি সেদিন মোটেই আসতে চাচ্ছিলেন না। তখন উনার পাশে এ্যাড. আয়েনউদ্দীন ও ড. আব্দুর রহমান উপস্থিত থাকলেও তাঁরা এলেন না। আমরা বেশ অবাক হলাম। যাইহোক ড. বারী সম্মেলনে পৌঁছলেন এবং অতি সংক্ষেপে সভাপতির উদ্বোধনী বক্তব্য রেখে চলে গেলেন। আমরা প্রোগ্রাম চালিয়ে গেলাম। মুনতাছির আহমাদ রহমানী, ড. আফতাব আহমাদ রহমানী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ প্রায় সারাদিনই আমাদের সাথে থাকলেন। সন্ধ্যার মধ্যেই সম্মেলনের সফল সমাপ্তি ঘটল। সম্মেলনে আহবায়ক কমিটির বদলে নির্বাচিত জাতীয় কমিটি গঠন করা হল এবং সংগঠনের 'কর্মপদ্ধতি' অনুমোদিত হল। অভূতপূর্ব উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে যুবসংঘের নেতা-কর্মীরা নিজ নিজ এলাকায় ফিরে গেল। বলা যায় এ সম্মেলন ছিল 'যুবসংঘ'-এর জন্য অগ্রগতির প্রথম মাইলফলক।

** **তাওহীদের ডাক :** দাওয়াতী কার্যক্রমে দেশের বহু অঞ্চল আপনি সফর করেছেন। স্মরণীয় কিছু সমাবেশের কথা আমাদের বলবেন কী?*

আমীরে জামা'আত : আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহর অশেষ রহমত যে দ্বীনের বিশুদ্ধ দাওয়াত প্রচারের জন্য তিনি আমাদেরকে দেশের অধিকাংশ স্থানে যাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। কত শত স্মৃতি যে সেখানে পুঞ্জিভূত হয়ে রয়েছে। ৭৫/৭৬ -সনের দিকে যখন 'আরাফাতে' আমার লেখা প্রকাশিত হ'ত, তখন দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে বক্তব্য রাখার জন্য আমন্ত্রণ আসত। তখনকার দিনে শিরক-বিদ'আতে পূর্ণ, পীর-মুরিদীর আধিপত্যে পুষ্ট মাযহাবী পরিবেশগুলোতে সংস্কারধর্মী বক্তব্য দেওয়াটা ছিল রীতিমত দুঃসাহসিক। তবে বক্তব্যের পর যে আবেগ-উৎসাহ দেখতাম মানুষের মাঝে, তাতে বরং বিস্ময় বোধ করতাম। হানাফী হওয়া সত্ত্বেও বহু সংস্কারমনা মানুষ আমাদের বক্তব্যকে যেন গোগ্রাসে গিলতেন। প্রথম যৌবনের সেই দিনগুলোতে আমাকে প্রায়ই ৩/৪ ঘন্টা একটানা বক্তব্য দিতে হয়েছে। 'যুবসংঘ' গঠনের পরবর্তী কয়েকটি ঘটনা বলি।-

(১) তাহেরপুর সম্মেলন, রাজশাহী। সম্ভবত: ১৯৭৮ সালে তাহেরপুর হাইস্কুল ময়দানে এ সম্মেলনটি হয়। ড. বারী, ড. রহমানীর নাম থাকলেও উনারা আসতে পারেননি। তখন রাজশাহী যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি ছিলেন যিল্লুর রহমান (পরবর্তীতে প্রফেসর, আরবী বিভাগ, রাজশাহী গভ. কলেজ), সহ-সভাপতি এ.কে.এম. শামসুল আলম (পরবর্তীতে প্রফেসর, আরবী বিভাগ, রাবি) এবং সেক্রেটারী মাওলানা মুসলিম। তাঁরা সহ আমি যথাসময়ে সম্মেলনস্থলে উপস্থিত হলাম। প্রথম দিনের বক্তৃতাতেই এলাকায় সাড়া জাগল। পরের দিন বাদ যোহর 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে বিশেষ যুবসম্মেলন। সে উদ্দেশ্যে বের হতেই দেখি আমাকে মিছিল সহকারে তাহেরপুর বাজারের উপর দিয়ে নিয়ে যাওয়ার আয়োজন। আমাকে সামনে নিয়ে শামসুল আলম ও মাওলানা মুসলিম আগাতে শুরু করলেন। গগণবিদারী তাকবীর ধ্বনিতে 'যুবসংঘ'-এর ছেলেরা এলাকা মুখরিত করে তুলল। কিন্তু এ আয়োজন আমার বিবেকে বাঁধল। বিব্রত অবস্থায় চট করে পার্শ্বে এক দোকানে ঢুকে পড়লাম। মিছিল চলে গেলে পরে একাকী মঞ্চে হাযির হলাম। ঐ সম্মেলনের দৃশ্যটা আমার এখনও মনে পড়ে।

(২) ১৯৭৮-এর শেষদিকে হবে। 'যুবসংঘ'-এর একটা টীম নিয়ে তাবলীগী সফরে গিয়েছি ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জের পাঁচরুখিতে। পাঁচরুখি মাদরাসায় ব্যাগ-ব্যাগেজ রেখে আমরা ৪টি দলে বিভক্ত হয়ে পার্শ্ববর্তী ৪টি মহল্লায় গেলাম। দলগুলোকে বলে দিলাম গ্রামের লোকদের আক্বীদা-আমল দেখে আসার জন্য এবং বিশেষ করে শিরকী কর্মকাণ্ডগুলি সাথে সাথে দূর করার চেষ্টা চালানোর জন্য। আর আছরের পর গ্রামের লোকদেরকে মাদরাসা ময়দানে অনুষ্ঠিতব্য তাবলীগী সভায় আসার জন্য বলা হল। ঘন্টা দু'য়েকের মধ্যে সবাই মাদরাসায় আবার ফিরে এলাম। সাথীরা কথামত শিরকী কর্মকাণ্ড দেখে এসেছে এবং সাথে সাথে তাদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে শিরকের নানা উপকরণগুলোও হস্তাগত করে মাদরাসায় নিয়ে এসেছে। সেগুলো ছিল যেমন- (ক) মরা মহিষের মাথা- যা জ্বীনের আছর থেকে বাঁচার জন্য ঘরের চালের উপর বাধা ছিল। (খ) তাবীয- যা বালা-মুছীবত, রোগ-ব্যারাম, চোরের উপদ্রব ইত্যাদি থেকে বাঁচার জন্য ঘরের দরজায় এবং বাচ্চা ছেলে-মেয়ে ও বয়স্ক লোকের কোমরে ও গলায় ঝুলানো ছিল। (গ) ঝাটা ও ঝুড়ি- যা বদনজর ও যাবতীয় ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য একটি নির্মাণাধীন বাড়ীর ছাদে লাগানো ছিল। এছাড়া শস্য ক্ষেত থেকে মানুষের মূর্তি ও অন্যান্য অনেক জিনিস তারা হাজির করল যা একজায়গায় ঢিবির মত স্তুপ হয়ে গেল। গ্রামের অবস্থা যা দেখা গেল- প্রায় সব বাড়ীই আলগা ও বেড়াবিহিন। পর্দার কোন ব্যবস্থা নেই। অধিকাংশ বাড়ীতে নিজস্ব পায়খানা ও গোসলখানা নেই। নারী-পুরুষ একই সাথে উঠানে ধান ঝাড়ে ও পুকুরে গোসল করে।

সব তথ্য নিয়ে বাদ আছর অনুষ্ঠিত গণসমাবেশে বক্তৃতা রাখলাম। বললাম, 'যে গ্রামে এতবড় মাদরাসা আছে, আলেম-ওলামা যেখানে সর্বক্ষণ বর্তমান, সে গ্রামে এ দুরবস্থা থাকবে কেন? স্বয়ং আহলেহাদীছ গ্রামেই যদি শিরক-বিদ'আতের এই জয়জয়কার হয়, তবে আমরা জবাব দিব কী? মাদরাসার শিক্ষক-ছাত্রদের অনুরোধ করলাম, সপ্তাহে একদিন পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে তাবলীগী সফর করুন। শুধু মৌখিক উপদেশ নয়, হাতে-নাতে শিরক-বিদ'আত ও চরিত্রবিধ্বংসী কর্মকাণ্ড উঠিয়ে দিয়ে আসবেন।' উপস্থিত সকলে আমাদের উদ্যোগকে সমস্বরে স্বাগত জানালেন এবং দো'আ করলেন। অতঃপর মাগরিবের ছালাত শেষে আমরা ঢাকায় ফিরলাম।

(৩) মেহেরপুর শহর : ১৯৮০ সালের সম্ভবত: ২০-২১ ফেব্রুয়ারী হবে। দু'দিনব্যাপী ইসলামী সম্মেলন। স্থানটির নাম মনে নেই। মাওলানা আলীমুদ্দীন নদীয়াভী সম্মেলনের উদ্যোক্তা। মূল ঘটনা ছিল, কিছুদিন পূর্বে জনৈক আহলেহাদীছ মুছল্লী শহরের এক হানাফী মসজিদে মাগরিবের ছালাত আদায়ের সময় স্বরবে 'আমীন' বলায় মুছল্লীরা তার বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠলে ইমাম ছাহেব মধ্যস্থতা করেন এভাবে যে, তাকে কুয়া থেকে পানি তুলে নিজ হাতে মসজিদ ধুয়ে দিতে হবে।' বেচারা আহলেহাদীছ মুছল্লী তা করতে বাধ্য হয়। পরে ঘটনাটি জানাজানি হলে আহলেহাদীছদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। তারই প্রেক্ষিতে এই সম্মেলন। প্রথমদিন অন্যান্যদের মধ্যে মাওলানা আব্দুছ ছামাদ সালাফীর বক্তব্য। সবেমাত্র মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফারেগ হয়ে মাব'উছ হিসাবে দেশে ফিরেছেন। শিরক-বিদ'আতের বিরুদ্ধে টাটকা জোশ নিয়ে এসেছেন। ফলে পরিবেশ আঁচ করতে না পেরে তিনি মিলাদ প্রসঙ্গে কিছু হক কথা বলায় পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠল। এমনকি আয়োজকদেরকে পুলিশী সাহায্য চাইতে হল। কিন্তু এস.ডি.ও ছাহেব ছাফ বলে দিলেন, 'ধর্মীয় সভা করতে যদি পুলিশ লাগে, তাহলে সভা বন্ধ করে দিন'। এস.ডি.ও ছিলেন মাওলানা আব্দুল হাই সালাফীর আম্মাপারার ছাত্র। উনি গিয়ে বলাতেও কোন কাজ হল না। এমতবস্থায় দ্বিতীয় দিন সভা আরম্ভ হল। সভাপতি জমঈয়ত সেক্রেটারী আব্দুর রহমান বি.এ.বি.টি মঞ্চে উপস্থিত। এ সময় ময়দানে অনেক শ্রোতার সামনে লাঠির বোঝা দেখা গেল। উদ্যোক্তা মাওলানা আলীমুদ্দীন অনুপস্থিত। বড় বক্তাদেরও কেউ আসেননি। বি.এ.বি.টি ছাহেব ঘাবড়ে গেলেন। অবশেষে আমাকে কাছে ডেকে লাঠির বোঝার দিকে ইঙ্গিত করে আস্তে আস্তে বললেন, পরিবেশ বুঝতে পারছেন? বড় বক্তাদের কাউকে দেখছি না। আপনি এখানে নতুন। তাই পাঁচ মিনিটের জন্য দাঁড়িয়ে পরিচয় দিয়ে বসে পড়ুন। সভা আমরা এখুনি শেষ করে দেব। অন্যদিকে আব্দুল লতীফ, হাসানুযযামানরা তখন নতুন আহলেহাদীছ। জোশ বেশী। ওরা আমাকে নিজের মত করে বক্তব্য রাখতে উৎসাহ দিল। শেষদিন এমনিতে লোক বেশী তাছাড়া আগের দিনের গরম পরিবেশের সুবাদে এদিন স্বাভাবিকের চেয়ে লোক বেশী হয়েছে। ওসি সাহেবের নেতৃত্বে একদল পুলিশও ছিল মঞ্চের পিছনে। জনসমাবেশের দিকে একবার ভালভাবে তাকিয়ে ধীর-স্থিরভাবে আমি আমার বক্তব্য শুরু করলাম। দীর্ঘ আড়াই ঘন্টা ধরে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন' বিষয়টি পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করলাম। এতে পরিবেশ ঠাণ্ডা তো হলই, বরং ওসি ছাহেব মঞ্চে উঠে এসে আমার সাথে কোলাকুলি করে বললেন, 'এটাই যদি আহলেহাদীছ আন্দোলন হয়, তবে আমিও এ আন্দোলনে শরীক হব।' আলহামদুলিল্লাহ মেহেরপুরে আহলেহাদীছ-হানাফী যে মুখোমুখি পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল, তা দূর হয়ে গেল। এবং তখন থেকে এ যাবত শহরের বুকে নিয়মিত ভাবে আহলেহাদীছের বার্ষিক সম্মেলন হয়ে আসছে।

(৪) খালিশপুর খুলনা : ১৯৮৫ সালের মাঝামাঝি সময় ক্রিসেন্ট জুট মিল্স শ্রমিকদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় ৩ দিন ব্যাপী ইসলামী সেমিনার। লক্ষাধিক লোকের সমাবেশ। দেশের সেরা ইসলামী ব্যক্তিত্বদের সবাই প্রায় উপস্থিত। মাওলানা আব্দুর রহীম ও আমি একই দিনে আমন্ত্রিত। সময় মত মঞ্চে উপস্থিত হলাম। ওনার পরই আমার বক্তৃতা। আমি যুবসংঘের ছেলেদের মাধ্যমে ওনার কাছে কিছু মৌলিক প্রশ্ন পাঠালাম। বক্তব্যের শেষে প্রশ্নোত্তর পর্বে উনি বেশ কিছু প্রশ্ন এড়িয়ে গেলেন। বিশেষ করে 'চার মাযহাব মান্য করা ফরয' কি-না- এছাড়াও কিছু প্রশ্ন। মাওলানা আমাকে ভালবাসতেন। আমি কানের কাছে মুখ নিয়ে উক্ত প্রশ্নটির জবাব দেবার জন্য বললে উনি আস্তে করে বললেন, 'এ প্রশ্নের জবাব দিলে ঢাকায় ফেরা যাবে না।' তাঁর পরে আমার ভাষণ শুরু হল। পূর্বনির্ধারিত বিষয়টি ছিল সম্ভবত: 'বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলাম।' আমি আমার ভাষণে দেশে প্রচলিত বিভিন্ন শিরকী ও বিদ'আতী রসম-রেওয়াজের উল্লেখ করে সেগুলো থেকে বিরত থাকার এবং ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী জীবন পরিচালনার আহবান জানাই। মাওলানা আব্দুর রহীমের এড়িয়ে যাওয়া প্রশ্নের প্রায় সবগুলির জবাব আমার ভাষণে এসে যায়। শ্রোতাদের মধ্যে আগ্রহ ও চাঞ্চল্য দু'টিই লক্ষ্য করলাম। পরে আমার রাত্রি যাপনের নির্ধারিত স্থান বি.এন. খালিশপুরের প্রধান কর্মকর্তার সরকারী বাসভবনে অনেক রাতে সম্মেলন আয়োজক কমিটির চার শ্রমিক নেতা উপস্থিত। তারা আমার ভাষণের বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রশ্ন করলেন ও সব জেনে নিলেন।

সবশেষে বলল, স্যার! আমরা আপনার মুরীদ হয়ে 'আহলেহাদীছ' হতে চাই। আমি বললাম, 'দেখুন আমরা পীর-মুরীদীতে বিশ্বাসী নই। আপনারা ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করুন এবং প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হৌন! আমি আপনাদের জন্য দো'আ করি, আল্লাহ আপনাদের তাওফীক দিন'। আরো বললাম, 'আপনারা এত দ্রুত মত পরিবর্তন করবেন না। আরও সময় নিন ও যাচাই বাছাই করুন।' তারা আবেগে বলে ফেলল, স্যার! আপনি যে পথ দেখিয়ে দিয়েছেন এ পথ ছেড়ে আমরা আর কোথাও যাব না। দো'আ করুন যেন এই মিলের অসংখ্য শ্রমিকের মধ্যে সঠিক ইসলামের প্রচার-প্রসারে জীবন কাটাতে পারি'। পরে জেনেছি তাদের প্রচেষ্টায় কয়েকশত শ্রমিক কিছুদিনের মধ্যে আহলেহাদীছ হয়ে যায়। ফালিল্লাহিল হাম্দ।

(৫) খালিশপুর খুলনাঃ ১৯৮৫ সালেই প্লাটিনাম জুট মিল্স শ্রমিকদের উদ্যোগে আরেকটি সম্মেলন হয়। আগের সম্মেলনের প্রভাবেই সম্ভবত: কর্তৃপক্ষ আমাকে দাওয়াত করে। বিষয়বস্তু ছিল 'কুরআনী সমাজ।' অবসরপ্রাপ্ত জনৈক সেনা কর্মকর্তা ছিলেন সভাপতি। বক্তাদের বিষয়বস্তু ও নিয়মানুবর্তিতার দিকে ওনার খুব কড়া নজর। কিন্তু আমার বেলা ব্যতিক্রম হয়ে গেল। ৪১টি প্রশ্ন জমা হয়েছে। শ্রোতাদের চীৎকার ও দাবী- সবগুলো প্রশ্নের জবাব তারা আমার কাছ থেকেই শুনতে চায়। মাওলানা সাঈদী, এমদাদুল হক, এ.কে.এম ইউসুফ প্রমুখ মঞ্চে উপস্থিত। সভাপতির কিছুই করার নেই। মাওলানা ইউসুফ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আমার ৪৫মিঃ সময় আমি গালিব ছাহেবকে দিলাম। কিন্তু তাতেও কুলায়নি। সর্বসাকুল্যে ঐদিন আমার নির্ধারিত ৪৫ মিনিটের স্থলে আড়াই ঘন্টা বক্তৃতা করতে হয়। আমি একে একে মাযহাব, মীলাদ, শবেবরাত, কুলখানী, চেহলাম, পীর-মুরীদী সবকিছুরই জবাব দিলাম। শেষে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছিল জামায়াতে ইসলামী'র সহযোগী সংগঠন 'ইত্তেহাদুল উম্মাহ' সম্পর্কে। আদর্শিক কারণে আমাকে আয়োজকদের বিরুদ্ধেই বলতে হল। বললাম, যারা মুসলিম উম্মাহকে বিভিন্ন মাযহাব ও তরীকায় বিভক্ত হওয়াকে সমর্থন করেন, তারাই যদি 'ইত্তেহাদুল উম্মাহ' বা উম্মতের ঐক্যের দাবী নিয়ে ময়দানে উপস্থিত হন, তবে তার কোন মূল্য থাকে কী? এতে ঐ দিন মঞ্চে উপস্থিত ইত্তেহাদ নেতৃবৃন্দ আমার উপর কতটুকু নাখোশ হয়েছিলেন জানি না। কিন্তু লক্ষাধিক শ্রোতার স্থির বিস্মিত দৃষ্টি ছিল আমার দিকেই। যা আজও আমার চোখে ভাসে। বক্তৃতার শেষে মানব রচিত যাবতীয় মাযহাব-মতবাদ ও ইযম ছেড়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার ও সে আলোকে সার্বিক জীবন পরিচালনার আন্দোলনে শরীক হবার আহ্বান জানিয়ে ভাষণ শেষ করি। খুলনার আলহাজ আব্দুল হামীদ ও দৌলতপুরের এ. কে. এম ইয়াকূব আলী প্রমুখের সাথে যখন ফিরে আসি, তখন আমাদের সাথে গাড়ী পর্যন্ত হেঁটে আসা কলেজ ছাত্রদের যে অনাবিল ভালবাসা ও ব্যাপক আকুতি সেদিন দেখেছিলাম, তা আজও মনে পড়ে।

(৬) ঐ সালেরই শেষ দিকে বা ১৯৮৬-এর প্রথমে দৌলতপুর মহসিন হাইস্কুল ময়দানে আমাকে পুনরায় দাওয়াত দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য, পরপর এ তিনটি সেমিনারের প্রতিটিরই আয়োজক ছিলেন হানাফী ভাইয়েরা। এই সেমিনারেই প্রথম সাক্ষাত হয় মাওলানা আবুল কালাম আযাদের সাথে (বর্তমান টিভি ভাষ্যকার)। মনে পড়ে ঐদিন সাড়ে তিন ঘন্টা বক্তৃতা শেষে মঞ্চ থেকে নামার সময় এলাকার একজন চিহ্নিত সন্ত্রাসী পায়ে পড়ে তওবা করেছিল, জীবনে আর কোনদিন সন্ত্রাস-ডাকাতি করবে না বলে। *(ক্রমশ)*

লেখা আহ্বান

ইসলামের বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সুস্থ সাহিত্য বিনির্মাণের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে দীর্ঘদিন পর নতুন অবয়বে যাত্রা শুরু করেছে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর মুখপত্র **'তাওহীদের ডাক'**। সত্যানুসন্ধিৎসু যুবক, ছাত্র ও লেখকদের নিকট থেকে বিশুদ্ধ ইসলামী আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ, মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য, আহলেহাদীছ আন্দোলন, মনীষী চরিত, সাময়িক প্রসঙ্গ, কবিতা, মতামত, শিক্ষণীয় গল্প প্রভৃতি বিষয়ে লেখা আহ্বান করা হচ্ছে।

-নির্বাহী সম্পাদক

পার্বত্য চট্টগ্রামে সংঘাত : নাটের গুরু কারা?

শেখ আব্দুছ ছামাদ

পার্বত্য চট্টগ্রামে গত ১৯ ও ২০ ফেব্রুয়ারী যা ঘটেছে তা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। কিছু বিষয়ে অসন্তোষ থাকা সত্ত্বেও কয়েকদিন আগেও পাহাড়ী-বাঙালীরা ছিলেন একে অপরের সুখ-দুঃখের সঙ্গী। একজন বিপদে পড়লে সহযোগিতার হাত বাড়াতেন অন্যজন। কিন্তু সেই সাধারণ পাহাড়ী-বাঙালীদের এমন সুসম্পর্ক এখন সাপে-নেউলে। বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা, কোন স্বার্থান্বেষী কুচক্রী মহল পরিকল্পিতভাবে পাহাড়ী জনপদে অস্থিরতা সৃষ্টি করছে। এ প্রক্রিয়ার অংশ হচ্ছে খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটির বাঘাইছড়ির দাঙ্গা-হাঙ্গামা। লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ডের পাশাপাশি চালানো হয় বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ। সরকারী হিসাব মতে সহিংস ঘটনায় উভয় সম্প্রদায়ে নিহতের সংখ্যা ৪ জন। বেসরকারী হিসাবে আরো বেশী। ঘরবাড়ী পুড়েছে প্রায় সাড়ে চারশ', ১৬শ'র অধিক পাহাড়ী-বাঙালী গৃহছাড়া, ভয়ে-আতঙ্কে গভীর বনে চলে গেছে প্রায় ২ হাজারের বেশী নরনারী ও শিশু।

পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী-বাঙালীদের বর্তমান এ করুণ অবস্থা সম্পর্কে জানতে হলে প্রথমে পাহাড়ী অঞ্চলে তাদের আগমনের ইতিহাস এবং চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলের ইতিহাস সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন। জঙ্গলে ভরা পার্বত্য অঞ্চলে কারা প্রথমে এসে বসবাস করতে শুরু করেছিল, তা নিয়ে নানা অস্পষ্টতা থাকলেও পার্বত্য অঞ্চল বিষয়ক বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, পার্বত্য অঞ্চলে পাহাড়ীরা বসতি স্থাপন করে ১৬০০ খৃষ্টাব্দে। উপজাতিদের মধ্যে মুরং ও কুকিরা এখানে এসেছে আগে আর চাকমা ও মার্মারা এসেছে অনেক পরে। চাকমারা কুকিদের উত্তর-পূর্ব দিকে তাড়িয়ে দেয় আর মার্মা বা আরাকানি মগরা দক্ষিণ থেকে এসে চাকমাদের সরিয়ে দেয় উত্তর-পূর্বে। মার্মারা এসেছে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে, তার আগে নয়। রাঙ্গামাটি যেলার বাঘাইছড়ি উপযেলার সাজেক ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান এল. থাঙ্গা পাঙ্খো বলেন, বাঙালিরা সাজেক ইউনিয়নে এসেছে ১৯৬০ সালের দিকে আর চাকমারা এসেছে ১৯৯৭-৯৯ সালের দিকে পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন উপযেলা থেকে। চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে যেসব উপজাতি বাস করে তাদের মধ্যে সংখ্যায় বেশী চাকমা, আর তাদের পরেই হল মার্মা বা আরাকানি মগ। সূচনা থেকেই উভয়ের মধ্যে কোন সদ্ভাব ছিল না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বর্তমান মিয়ানমারের আরাকান থেকে মগরা এসে চাকমাদের তাড়িয়ে দেয় পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্গম অঞ্চলে। তখন থেকেই এদের মধ্যে মনোমালিন্য। চাকমাদের ভালো চোখে দেখে না পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্য উপজাতিরাও। ত্রিপুরা, মুরং, তঞ্চংগা, কুকি, লুসাই, রিয়াং, বনযুগী ও পাংখুরাও পছন্দ করে না চাকমাদের।

উল্লেখ্য যে, চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে যারা বসবাস করে তারা উপজাতি নাকি আদিবাসী? এ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত ও যুক্তি-তর্ক পরিলক্ষিত হয়। কারো মতে তারা উপজাতি আবার কারো মতে তারা আদিবাসী। এ বিষয়ে ২০০৫ সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘকে স্পষ্ট করে জানিয়েছে যে, 'বাংলাদেশে কোনো আদিবাসী নেই, রয়েছে ক্ষুদ্র জাতিসত্তা। উপজাতি হিসাবে তাদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি রয়েছে এবং বাংলাদেশ সমমর্যাদার নাগরিক হিসাবে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার স্বার্থ রক্ষায় বদ্ধপরিকর'। ২০০৮ সালের ২১ এপ্রিল থেকে ৫ মে পর্যন্ত অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক ৭ম অধিবেশনে বাংলাদেশ পরিস্কারভাবে জানায় যে, 'বাংলাদেশে কোনো আদিবাসী নেই। এখানে রয়েছে বিভিন্ন উপজাতি'। এরপর একই বছরের জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৩তম অধিবেশনের মতামতের জবাবেও বাংলাদেশে আদিবাসী নেই বলে জাতিসংঘকে অবহিত করা হয়। *(আমার দেশ, মঙ্গলবার ২ মার্চ '১০, পৃ. ১৩)*। জানা যায়, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গত ২৮ জানুয়ারী 'উপজাতীয় সম্প্রদায়কে আদিবাসী অভিহিত করার অপতৎপরতা' প্রসঙ্গে যেলা প্রশাসকদের কাছে প্রেরিত এক প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, বাংলাদেশে ৪৫টি উপজাতি বাস করে। বাংলাদেশের সংবিধান, পার্বত্য চট্টগ্রাম যেলা পরিষদ আইন, পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ আইন এবং ১৯৯৭ সালের শান্তি চুক্তিতে উপজাতীয় সম্প্রদায়গুলোকে 'উপজাতি' হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে। কোথাও আদিবাসী অভিহিত করা হয়নি। তথাপি কতিপয় নেতা, বুদ্ধিজীবী, পাহাড়ে বসবাসরত শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ এমনকি সাংবাদিকরাও ইদানিং উপজাতি না বলে আদিবাসী বলছে। এ বিষয়ে সবাইকে সতর্ক করতে প্রজ্ঞাপনে নির্দেশ দেয়া হয়। এতদসত্ত্বেও পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী উপজাতি সম্প্রদায়কে 'আদিবাসী' হিসাবে স্বীকৃতি আদায়ের বিশেষ মিশন নিয়ে মাঠে নেমেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ), স্বঘোষিত চিটাগাং হিলট্রাক্টস কমিশন (সিএইচটি) ও বিদেশী অর্থায়নে পরিচালিত কয়েকটি এনজিও। দেশের কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ ভূমি পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে বাঙালীদের সরিয়ে আদিবাসী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় এসব সংস্থা সমান্ত রালভাবে কাজ করছে বলে মনে করেন দেশের বিশেষজ্ঞ মহল। বাংলাদেশ সরকার উপজাতি সম্প্রদায়কে আদিবাসী বলতে নিষেধ করলেও কয়েকটি মিডিয়া ও তাদের সমর্থক তথাকথিত কতিপয় সুশীল সমাজ উপজাতিদেরকে আদিবাসী হিসাবেই প্রতিষ্ঠা করতে গলদঘর্ম হচ্ছে। বিভিন্ন সংস্থা ও এনজিওদের এসব অপতৎপরতার কারণে দেশের এক দশমাংশ পার্বত্য এলাকা এখন মারাত্মক নিরাপত্তা হুমকিতে পড়েছে।

জানা যায়, জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক চার্টারে 'আদিবাসীদের স্বার্থ রক্ষায় জাতিসংঘ সদস্যভুক্ত যে কোনো দেশে জাতিসংঘ সরাসরি হস্ত ক্ষেপ করতে পারবে'- এমন ক্লজ থাকায় উপজাতীয় কতিপয় নেতা দীর্ঘদিন যাবৎ জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নিজেদেরকে আদিবাসী হিসাবে স্বীকৃতি আদায়ে ব্যাপক লবিং করে আসছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের কতিপয় বাম রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবী বিশেষ ভূমিকা রেখে আসছেন। এছাড়া ইউএনডিপিসহ আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার অর্থায়নে একই লক্ষ্যে দেশের কতিপয় মিডিয়া এবং এনজিও আদিবাসীদের নিয়ে আদা-জল খেয়ে ব্যাপক প্রচার প্রপাগাণ্ডায় মেতেছে। বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, আদিবাসী স্বীকৃতি আদায়ের মাধ্যমে জাতিসংঘের হস্তক্ষেপে পার্বত্য চট্টগ্রামে 'পূর্বতিমুর' এর মতো একটি 'বাফার স্টেট'[১] প্রতিষ্ঠায় মরিয়া দেশী-বিদেশী এ চক্রের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ইইউ এবং তথাকথিত সিএইচটি কমিশন। এসব সংস্থার সহায়তায় অন্যান্য কয়েকটি দেশের অর্থায়নে পার্বত্য চট্টগ্রামে একই উদ্দেশ্যে নিয়োজিত রয়েছে শতাধিক এনজিও। এসব এনজিও পার্বত্য দুর্গম অঞ্চলের উপজাতিদের মাঝে কয়েক বছর থেকেই উদ্দেশ্যমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে।

খবরে প্রকাশ, বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনা প্রত্যাহার আরম্ভ হলে প্রশাসনকে না জানিয়েই দুর্গম এলাকাগুলোতে সফর করে ইউরোপীয় ইউনিয়ন মিশন (ইইউ) ও সিএইচটি কমিশন। সফর শেষে সিএইচটি কমিশন সদস্যরা পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে বাঙালীদের সরিয়ে নিতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানায়। এছাড়াও স্থানীয় প্রশাসনকে অবহিত না করেই বিভিন্ন সময়ে এসব গ্রুপ দুর্গম অঞ্চলে এনজিওদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করতে যায়। এসব মিশন প্রত্যন্ত অঞ্চল ঘুরে আসার পরই সংশ্লিষ্ট এলাকায় উপজাতি ও বাঙালীদের মধ্যে বিরোধ ও সংঘর্ষ হতে দেখা যায়। বিদেশী বিভিন্ন মিশন ও এনজিওর এরূপ উদ্দেশ্যমূলক স্বাধীন তৎপরতাই যে পার্বত্য পরিস্থিতি অবনতির জন্য দায়ী তা এখন অনেকটাই স্পষ্ট। তাছাড়া এটি পার্বত্য এলাকা থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের বিষময় ফল বলে রাজনীতিক পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন।

পার্বত্য অঞ্চলের বর্তমান পরিস্থিতির জন্য কেউ কেউ বাংলাদেশের সেনাবাহিনীকে দায়ী করছেন। যা আদৌ যুক্তিসংগত নয়, বরং বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক। সম্প্রতি গত ২৬ ফেব্রুয়ারী ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) পররাষ্ট্র ও নিরাপত্তা বিষয়ক উর্ধতন প্রতিনিধি ক্যাথরিন অ্যাশটন-এর পক্ষে ব্রাসেলসে দেয়া এক বিবৃতিতে তার মুখপাত্র বলেছেন, '১৯ ও ২০ ফেব্রুয়ারী বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে যে সহিংস ঘটনা ঘটেছে তার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন। .... রাঙামাটি যেলার সহিংস ঘটনায় পাহাড়ী সম্প্রদায়ের অনেক সদস্য নিহত হয়েছে। চারশ' পাহাড়ী পরিবারের ঘরবাড়ী ও সম্পদ জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। ....এ সহিংস ঘটনায় সেনাবাহিনীর সদস্য এবং সেনাবাহিনীর নিয়োগ করা ব্যক্তিরা জড়িত থাকার অভিযোগের ব্যাপারে আমরা পুরোপুরি অবহিত আছি। ....সেনাবাহিনী জড়িত থাকার অভিযোগ দ্রুত ও স্বাধীনভাবে তদন্তের জন্য আমরা বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানাই। বাংলাদেশ সরকারকে

১. দু'টি বৃহৎ বিবদমান রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘর্ষ বা সংঘাত এড়ানোর জন্য দু রাষ্ট্রের মাঝখানে সাধারণত যে-ক্ষুদ্ররাষ্ট্র সৃষ্টি করা বা বজায় রাখা হয়, সেই রাষ্ট্রকেই বলা হয় বাফার স্টেট (Buffer State)। দ্র. রাজনীতিকোষ, পৃঃ ২৬৯।

এটা নিশ্চিত করতে হবে যে, এ লজ্জাজনক ঘটনায় যারা জড়িত তাদের বিচারের মুখোমুখি করা হবে'।

ইইউ'র পক্ষ থেকে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী সম্পর্কে মিথ্যা, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলে কার্যত আমাদের সার্বভৌমত্বকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করেন। পার্বত্য চট্টগ্রামে যা ঘটেছে তা অবশ্যই বেদনাদায়ক। কিন্তু আমাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার নিয়ে সেনাবাহিনী সম্পর্কে এ ঔদ্ধত্যপূর্ণ বক্তব্য প্রদানের সাহস ইইউ পেল কিভাবে? মুক্তিযুদ্ধের দুরন্ত শার্দুল বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আমাদের অহংকার। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীর সদস্য হিসাবে আমাদের সেনাবাহিনী বিভিন্ন দেশে দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করে এরই মধ্যে বিশ্ববাসীর আস্থা অর্জন করেছে এবং প্রশংসনীয় কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের সহিংস ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে সেনাবাহিনীকে কলঙ্কিত করার স্থূল প্রচেষ্টা আসলে সেখান থেকে সম্পূর্ণরূপে সেনা প্রত্যাহারে সরকারকে বাধ্য করার ষড়যন্ত্র বলেই অনুমিত হচ্ছে। স্বাধীনতা লাভের পর থেকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী নিয়ে এমন ঔদ্ধত্যপূর্ণ বক্তব্য এর আগে কখনো শোনা যায়নি। পাশ্চাত্যের খুদ-কুঁড়ো খাওয়া এদেশের কোন কোন বুদ্ধিজীবী 'বাংলাদেশে সেনাবাহিনীর প্রয়োজন নেই' বলে যে মন্তব্য করেন তাদের সেই মন্তব্য আর ইইউ'র বিবৃতি একই সূত্রে গাঁথা। তাদেরই ষড়যন্ত্রে ২৫ ফেব্রুয়ারী পিলখানা হত্যাযজ্ঞ চালানো হয় কিনা তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন বলে সুশীল সমাজ মনে করেন। ৫৭ জন মেধাবী, চৌকস সেনা কর্মকর্তাকে নৃশংসভাবে হত্যা আমাদের সার্বভৌমত্ব রক্ষার ক্ষমতাকে দুর্বল করেছে। আর পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ী-বাঙালীদের মধ্যে হত্যা-সংঘর্ষ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও অখণ্ডতা রক্ষাকে হুমকির সম্মুখীন করে তুলেছে। সীমান্ত রক্ষায় যে বিডিআর ভারতীয় আগ্রাসন মোকাবিলায় বড়াইবাড়ীতে জীবন বাজি রেখে ভারতীয় বাহিনীকে পরাজিত করে নিজেদের দেশপ্রেম ও বীরত্ব প্রমাণ করেছিল, দেশ স্বাধীনের পর থেকে আজ পর্যন্ত যে বিডিআর সীমান্ত রক্ষায় যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করে আসছে, সেই বিডিআরের কিছু বিপথগামী সদস্য দেশী-বিদেশী কুচক্রী মহলের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে গত বছর ২৫ ফেব্রুয়ারী পিলখানায় নারকীয় হত্যাকাণ্ড চালিয়ে আমাদের সেনাবাহিনীর সুদক্ষ অফিসারদের হত্যা করে। আমাদের দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী যেকোন বিদেশী আগ্রাসন মোকাবিলা করতেও বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। তাই এ কুচক্রীমহল চেয়েছিল বিপথগামী এই বিডিআর জওয়ানদের দ্বারা আমাদের প্রতিরক্ষা বাহিনীকে সমূলে ধ্বংস করে দিতে। তারা চেয়েছিল বিডিআর ও সেনাবাহিনীর মধ্যে আক্রোশ-দ্বন্দ্ব ও বিভেদ সৃষ্টির মাধ্যমে দেশে একটি নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে এবং আমাদের প্রতিরক্ষা বাহিনীকে একেবারে নির্মূল করে দিতে। কিন্তু তাতে তারা সফল হতে না পেরে ১৯ ও ২০ ফেব্রুয়ারী পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ী-বাঙালীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে আবার সেই সেনাবাহিনীকে দোষারোপ করার হীন কৌশল অবলম্বন করছে। এ দু'টি ঘটনা মূলত একই সূত্রে গাঁথা।

বাঘাইছড়িতে সংঘটিত সহিংস ঘটনার জন্য অনেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনা প্রত্যাহারের কথা বলছেন। এ বিষয়ে সাবেক রাষ্ট্রপতি ও সেনাপ্রধান জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ বলেন, 'পার্বত্য অঞ্চলে যদি সেনাবাহিনী না থাকতো তাহলে পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের অংশ থাকতো না'। তাঁর মতো অন্যান্য বিশেষজ্ঞরাও মনে করেন, পার্বত্য অঞ্চল থেকে সেনা প্রত্যাহারের ফলে বিভিন্ন সশস্ত্র বিচ্ছিন্নতাবাদীদের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্রে পরিণত হয় পার্বত্য চট্টগ্রামের কোন কোন অঞ্চল। সে পথ বেয়েই অতি সম্প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রামে বড় ধরনের অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। পাহাড়ী ও বাঙালীদের বসতিতে আগুন ধরিয়ে দেয়াসহ হত্যা ও লুটপাটের মত ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটে। সেনা প্রত্যাহারের ফলে যে ভারসাম্যহীন পরিস্থিতি তৈরী হয়েছে, তার কারণে এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে। পাহাড়ী-বাঙালীদের মধ্যে আস্থা ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত না করে সেখান থেকে সেনা প্রত্যাহারের যে ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে, তাতে গোটা পার্বত্য অঞ্চল এখন নিরাপত্তা ঝুঁকিতে পড়েছে। দেশের অখণ্ডতা রক্ষা, পাহাড়ী-বাঙালী উভয় সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে যরুরী ভিত্তিতে আবার সেনা মোতায়েন দরকার। বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অবশ্য বলেছেন,'প্রয়োজনে আবার সেখানে সেনা মোতায়েন করা হবে'। পরবর্তীতে নয়, বরং এখুনি সেখানে পুনরায় সেনা মোতায়েন করা প্রয়োজন বলে সামরিক বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন।

পার্বত্য অঞ্চলে সহিংস ঘটনার জন্য আসলে কারা দায়ী? কারা পাহাড়ীদের বাড়ীঘরে আগুন লাগিয়েছে? এ প্রসঙ্গে রাঙ্গামাটি যেলার বাঘাইছড়ি উপযেলার সাজেক ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান এল. থাঙ্গা পাঙ্খো বলেন, 'চাকমারা নিজেরাই নিজেদের ঘর পুড়িয়ে বাঙালীদের দোষ দিচ্ছে। বাঘাইহাটের সাম্প্রতিক অস্থিতিশীল পরিস্থিতির জন্য চাকমাদের অতি বাড়াবাড়িই দায়ী। কারণ, বাঙালীরা যেখানে বসবাস করে সেখান থেকে ঘরপোড়া স্থানের দূরত্ব এক কিলোমিটার। নিরাপত্তাহীনতার কারণে বর্তমানে তারা সেনা পুলিশ নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে বসবাস করছে। কাজেই বাঙালীদের পক্ষে সেখানে গিয়ে ঘর পোড়ানো অসম্ভব। ফলে বুঝতে কারো অসুবিধা হবার কথা নয় যে, কারা এই আগুন লাগিয়েছে'। *(ইনকিলাব, ৮ মার্চ '১০, পৃ. ১)*। খবরে প্রকাশ, সাজেকে কাচলং নামে একটা নদী আছে। যার একপাশে বাঙালীদের বসবাস আর অন্যপাশে চাকমাদের গুচ্ছগ্রাম, মাঝখানে বাজার। গত ১৯ ফেব্রুয়ারী রাত ১২-টার দিকে চাকমারা বাজার দখলের ঘোষণা দিয়ে 'উজাও উজাও', 'এ্যাডভান্স এ্যাডভান্স' বলে সংগঠিত হতে থাকে। এ সময় তারা বাঙালীদের উচ্ছেদ করার জন্য তাদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। তখন বাঙালীরাও উত্তেজিত হয়ে পড়ে। গঙ্গারামমুখ এলাকায় চাকমারা নিজেরাই নিজেদের অনেক ঘরে আগুন লাগিয়েছে। পরদিন চাকমাদের গ্রাম থেকে বাঙালীদের দিকে গুলি ছোড়া হয়। সে সময় সেনাবাহিনীর সদস্যরা সেখানে উপস্থিত হয়ে তাদেরকে শান্ত করার চেষ্টা করেন। তারা পোশাকধারী ছিল বলে তাদের 'কালো কুত্তা' বলে গালাগালি করতে থাকে চাকমারা। এ সময় সার্জেন্ট রেজাউল নামে এক সেনাসদস্যকে চাকমারা দা দিয়ে কুপিয়ে মারাত্মক আহত করে। এভাবে চাকমাদের কারণেই পার্বত্য অঞ্চলের সর্বত্র সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে।

পার্বত্য অঞ্চল নিয়ে একটি খৃষ্টান রাষ্ট্র গঠনের জন্য পশ্চিমা দেশগুলোর যে ষড়যন্ত্রের কথা শোনা যায় তার সাথে ইইউ'র বিবৃতি হুবহু মিলে যায়। ইইউ উপজাতিদেরকে সুসংগঠিত ও শক্তিশালী করতে পার্বত্য অঞ্চলে অকৃপণ হস্তে কোটি কোটি টাকা খরচ করছে। ফলে পাহাড়ী উপজাতিদের জীবনযাত্রার মান এখন অনেক ক্ষেত্রে সমতল ভূমির মানুষের চেয়ে ভাল। যার ফলে পাহাড়ী-বাঙালীদের মাঝে একটি বৈষম্য তৈরী হচ্ছে। আসলে তাদের উদ্দেশ্য পার্বত্য অঞ্চল নিয়ে একটি পৃথক খৃষ্টান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। জনাব অ্যাডবেরী ইন্দোনেশিয়া ভেঙে পূর্ব তিমুরকে স্বাধীন করেছেন। সেই একই ব্যক্তি এখন আমাদের পার্বত্য অঞ্চলে সদা তৎপর। এটা গভীর উদ্বেগের বিষয়। পাহাড়ীরা আলাদা ভূখণ্ডের দাবী তুলে আলাদা পতাকা ব্যবহারের দাবীকেও সামনে নিয়ে আসছে। পাহাড়ীদের এসব কর্মকাণ্ড এবং ভারতীয় কিছু সংগঠনসহ কিছু আন্তর্জাতিক সংগঠনের সাম্প্রতিক তৎপরতা স্পষ্টতই আমাদের জাতীয় স্বার্থ ও স্বাধীনতা বিরোধী। এমনকি জাতিসংঘের কিছু অঙ্গসংস্থাও এ ব্যাপারে বিতর্কিত ভূমিকা পালন করছে বলে অভিযোগ উঠেছে। উল্লেখ্য, পার্বত্য অঞ্চলে সহিংস ঘটনায় পাহাড়ী-বাঙালী উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ নিহত হয়েছে এবং উভয় সম্প্রদায় একে অন্যের ঘরবাড়ীতে আগুন দিয়েছে। কিন্তু ইইউ'র বিবৃতিতে বাঙালীদের প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে একটি শব্দও উল্লেখ না করে শুধুমাত্র পাহাড়ীদের প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বিষয়টি সর্ব মহলে রীতিমতো রহস্যজনক বলে মনে হয়েছে। তাছাড়া বিদেশী অর্থায়নে পরিচালিত বিভিন্ন এনজিওগুলো উপজাতিদের মাঝে যে হারে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করছে, সে তুলনায় বাঙালীদের মাঝে করছে যৎসামান্য।

পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের চক্রান্তের সঙ্গে দেশের চিহ্নিত একটি মহলের অপতৎপরতাও সবিশেষ লক্ষ্যণীয়। আলাদা রাষ্ট্রের দাবীতে আবার অস্ত্র হাতে তুলে নেয়ার কথা বিশেষভাবে বলছে জ্যোতিবিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার (সন্তু লারমা) অনুসারীরা। সন্তু লারমার সাথীরা কলকাতায় সংবাদ সম্মেলন করে বলেছে, আবার অস্ত্র ধারণের সম্ভাবনার কথা। কিন্তু আরাকানী মগরা চাকমাদের মতো স্বাধীন হতে চাচ্ছে না। চাচ্ছে না অস্ত্র ধারণ করতে। বর্তমানে চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে যা ঘটছে, তা ঘটে চলেছে প্রধানত চাকমাদের জন্য। অন্য কোন পাহাড়ী উপজাতিদের কারণে নয়। সন্তু লারমার সাথীরা ভারতের কলকাতায় সংবাদ সম্মেলন করে বলছে, গোটা পাহাড়ী অঞ্চলকে তারা পরিণত করবে ভিয়েতনামে। কিন্তু সন্তু লারমার সাথীদের মনে রাখা উচিত যে, এটা ভিয়েতনাম নয়, বরং এটা ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশ। ভিয়েতনামের অবস্থা আর বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের অবস্থা এক নয়।

পরিশেষে পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান, বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে পাহাড়ী-বাঙালী ভাই ভাই মনে করে সবাইকে মিলেমিশে থাকাটাই অধিক শ্রেয়। কারণ, পাহাড়ী-বাঙালীর মধ্যে সমঝোতা গড়ে তুলে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মধ্যেই নিহিত রয়েছে সব মহলের জন্য প্রভূত কল্যাণ।

বিভিন্ন মহাদেশে ইসলাম

হোসাইন আল-মাহমূদ

১৯০০ সালে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার শতকরা ১২.৪ ভাগ ছিল মুসলিম। ১৯৮০ সালে ছিল ১৬.৫%। ২০০০ সালে এ সংখ্যা দাঁড়ায় ১৯.৫%। ধারণা করা হচ্ছে ২০২৫ সালে তা ৩০%-এ উন্নীত হবে। ২০০৫ সালে বিশ্বের মোট মুসলিম জনসংখ্যা ছিল ১৫৬৫.২৮ মিলিয়ন (২৩.৫২%)। ২০০৮ সালে ছিল ১৭৯০ মিলিয়ন (২৬.৭৩%)। islamicpopulation.com-এর মতে ২০০৯ সালে তা দাঁড়িয়েছে ১৮২৩ মিলিয়ন (২৭.২২%)। জেনারেল সোর্সগুলোর মতে, ১৬৫৭.৬ মিলিয়ন এবং বর্তমান ক্রমধারা (১.৮৪%) অনুযায়ী ২০২৫ সালের মধ্যে মুসলিম জনসংখ্যা শীর্ষস্থানে পৌঁছাবে। বিশ্বের ৩৪টি দেশে মুসলিম জনসংখ্যা ৮৫ ভাগের বেশী যার মধ্যে ২১টি দেশে এ সংখ্যা শতকরা ৯৫ ভাগের বেশী। ইন্দোনেশিয়াতে সর্বাধিক ২১৩ মিলিয়ন মুসলিম বাস করে। বিশ্বের ২৫টি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম।[২] আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ইরান, মৌরিতানিয়া ও সোমালিয়া ইসলামিক রিপাবলিক দেশ। ওআইসির সদস্য দেশ মোট ৫৭টি। নিম্নে বিভিন্ন মহাদেশে ইসলামের বিস্তার দেখানো হল (উইকিপিডিয়া)।

এশিয়া

এশিয়ায় অবস্থিত ৪৬টি দেশের মধ্যে ২৬টি দেশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ। এর মধ্যে ১৯টি দেশে মুসলিম জনসংখ্যা শতকরা ৮৫ ভাগের বেশী। মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩০ ভাগ মুসলিম। বিশ্বের প্রায় ৭০ ভাগ মুসলিম এশিয়ায় বসবাস করে। বিশ্বের ৩০ শতাংশ মুসলিম ভারত উপমহাদেশের এবং ২০ শতাংশ আরব দেশগুলোর নাগরিক। এছাড়া চীনে ২ কোটি ও ইন্ডিয়ায় ১৬ কোটি মুসলিম রয়েছে।

অঞ্চল	মুসলিম জনসংখ্যা	মোট জনসংখ্যার শতকরা	সমগ্র মুসলিম জনসংখ্যার শতকরা
মধ্যএশিয়া	৭৬,১০৫,৯৬২	৮২.৭০৭%	৫.১৫৫%
পূর্ব এশিয়া	২০,১৭৫,১৬২	১.৩২০%	২.৬৮৩%
মধ্যপ্রাচ্য	২৫২,২১৯,৮৩২	৯১.৭৯১%	১৭.০৮৫%
দক্ষিণ এশিয়া	৪৫৬.০৬২.৬৪১	২৮.৯৪৭%	২৮.১৮৪%
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া	২৩৯.৫৬৬.২২০	৪১.৯৩১%	১৬.২২৮%
মোট	১,০৪৪,১২৯,৮১৭	২৬.৭৪৯%	৬৯.৩৩৬%

উল্লেখযোগ্য মুসলিম জনসংখ্যাবিশিষ্ট কয়েকটি দেশ :

দেশ	মুসলিম জনসংখ্যা	শতকরা হার	মুসলিম জনসংখ্যার শতকরা
সৌদি আরব	২৮,৬৮৬,৬৩৩	১০০%	২.০%
আফগানিস্তান	২৮,০৭২,০০০	৯৯.৭%	১.৮%
ইন্দোনেশিয়া	২০২,৮৬৭,০০০	৮৮.২%	১২.৯%
ইন্ডিয়া	১৬০,৯৪৫.০০০	১৩.০৪%	১০.৩%
পাকিস্তান	১৭৪,০৮২,০০০	৯৬.৩%	১১.১%
বাংলাদেশ	১৫৬,০৫০,৮৮৩	৮৯.৬%	৯.৩%
মালয়েশিয়া	১৬,৫৮১,০০০	৬০.৪%	১.১%
চীন	২১,৬৬৭,০০০	১.৬%	১.৪%

আফ্রিকা

আফ্রিকায় অবস্থিত ৫৩টি দেশের মধ্যে ২১টি দেশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ। এর মধ্যে ১৪টি দেশে মুসলিম জনসংখ্যা শতকরা ৮৫ ভাগেরও বেশী। বর্তমানে এ মহাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬০ ভাগ মুসলিম ও বাকি ৪০ ভাগ খৃষ্টান। বিশ্বের প্রায় ৩০ ভাগ মুসলিম আফ্রিকায় বসবাস করে।

অঞ্চল	মুসলিম জনসংখ্যা	মোট জনসংখ্যার শতকরা	সমগ্র মুসলিম জনসংখ্যার শতকরা
মধ্য আফ্রিকা	১৫,৩৪৭,৩৩২	১৫.৭১৪%	০.৮৫২%
পূর্ব আফ্রিকা	৮১,৮৯০,৫৬৪	২৮.৮৫৯%	৪.৪৯৭%
উত্তর আফ্রিকা	১৭৯,৬২৩,৪৭৭	৮৯.৫৭৯%	১২.১৯৯%
দক্ষিণ আফ্রিকা	৮৮৫,৪৭৪	১.৬৩৯%	০.৬০৫%
পশ্চিম আফ্রিকা	১৩৪,৫৭৭,৭৮৫	৫০.৭৮৩%	৯.০৭৭%
মোট	৪১২,৩২৪,৬৩২	৪৫.৭৬২%	২৭.২৩%

উল্লেখযোগ্য মুসলিম জনসংখ্যাবিশিষ্ট কয়েকটি দেশ :

দেশ	মুসলিম জনসংখ্যা	শতকরা হার	মুসলিম জনসংখ্যার শতকরা
মিসর	৭৮,৫১৩,০০০	৯৪.৬%	৫.০%
নাইজেরিয়া	৭৮,০৫৬,০০০	৫০.৪%	৫.০%
আলজেরিয়া	৩৪,১৯৯,০০	৯৮%	২.২%
মরক্কো	৩১,৯৯৩,০০০	৯৯%	২.০%
সুদান	৩০,১২১.০০০	৭১.৩%	১.৯%
ইথিওপিয়া	২৮,৬৩,০০০	৩৩.৯%	১.৮%
সিরিয়া	২০,১৯৬.০০০	৯২.২%	১.৩%
নাইজার	১৫,০৭৫,০০০	৯৮.৬%	১.০%

ইউরোপ

জার্মানীর সেন্ট্রাল ইন্সটিটিউট ইসলাম আর্কাইভের ২০০৭ সালের পরিসংখ্যানে ইউরোপের ৩১টি দেশে মুসলিম জনসংখ্যা ৫৩ মিলিয়ন যাদের মধ্যে ১৬ মিলিয়ন বাস করে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোতে। ইংল্যান্ডে ২৫ লক্ষ (২.৭%) ও ফ্রান্সে প্রায় ৩৬ লক্ষ (৬.৯%) মুসলিম রয়েছে। বলকান অঞ্চলভুক্ত আলবেনিয়া (৭০%),

২. পৃথিবীর ৪২টি রাষ্ট্রের কোন রাষ্ট্রধর্ম নেই। ১৮টি দেশে খৃষ্টান রাষ্ট্রীয় চার্চ রয়েছে। ১৯৬৭ সালে আলবেনিয়া 'নাস্তিকতা'কে রাষ্ট্রধর্ম হিসাবে ঘোষণা করে। তবে ১৯৯১ সালে তা বাতিল করা হয়।

কসভো ও বসনিয়া-হার্জেগোভিনা (৪৫%) মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ। রাশিয়াতে বর্তমানে সোয়া ২ কোটি (১৫%) মুসলিম বসবাস করছে। যাদের মধ্যে কেবল রাজধানী মস্কোতেই রয়েছে ১.৫ মিলিয়ন। সে দেশের উত্তর ককেশাস ও ভলগা অঞ্চলেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুসলিম জনগোষ্ঠী রয়েছে। মেসিডোনিয়া (৩৩.৩%) ও সাইপ্রাসেও ((১৮%) যথেষ্ট পরিমাণ মুসলিম বসবাস করে। সার্বিয়া ও মন্টিনিগ্রোর মধ্যবর্তী অঞ্চল প্রসিদ্ধ 'সানজাক অব নভিপাজার' এলাকায় মুসলিমরা বসবাস করছে হাজার বছর পূর্ব থেকে। এছাড়া ১৯৫০ সালের আগে-পরে বিভিন্ন দেশ থেকে আগত প্রচুর মুসলিম অভিবাসী ইউরোপের বিভিন্ন দেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। গত ৩০ বছরে এ অঞ্চলে মুসলিম সংখ্যা ৩ গুণ তথা ২৩ মিলিয়ন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ধারণা করা হচ্ছে ২০১৫ সালে এ সংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাবে। এ হিসাবে ২০২৫ সালে ইউরোপের শতকরা ২০ ভাগ এবং ২১০০ সালে শতকরা ২৫ ভাগ হবে মুসলিম। অন্য এক হিসাবে বলা হয়েছে, ১৯৮৯-৯৮ পর্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে শতকরা ১০০ ভাগ। সে হিসাবে ২০২৫ সালে এ সংখ্যা দাঁড়াবে ১.৯ বিলিয়ন যা ইউরোপের মোট জনসংখ্যার ২৪ শতাংশ। ফ্রান্সে বর্তমান মুসলিম জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার অব্যাহত থাকলে আগামী ৩৯ বছরে ফ্রান্স মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে পরিণত হবে। নেদারল্যান্ডে বর্তমানে ৫০% নবজাতকই মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করে। সে হিসাবে ১৫ বছরের মধ্যে দেশটির অর্ধেক জনগোষ্ঠী মুসলিমে পরিণত হবে। একই হিসাবে ২০৫০ সালের মধ্যে জার্মানীও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে।

অঞ্চল	মুসলিম জনসংখ্যা	মোট জনসংখ্যার শতকরা	সমগ্র মুসলিম জনসংখ্যার শতকরা
বলকান	৮,১৬৫,১৩৭	১২.৪৮৩%	০.৫৫৩%
মধ্য ইউরোপ	৫২১,২৮৪	০.৭%	০.০৩৫%
পূর্ব ইউরোপ	২১,৮২৬,৮২৯	১০.২৫৬%	১.৪৭৯%
পশ্চিম ইউরোপ	১৩,৫৭৭,১১৬	৩,৬১৩%	০.৯২%
মোট	৪৪,০৯০,৩৬৬	৬.০৫২%	২.৯৮৭%

উল্লেখযোগ্য মুসলিম জনসংখ্যাবিশিষ্ট কয়েকটি দেশঃ

দেশ	মুসলিম জনসংখ্যা	মোট জনসংখ্যার শতকরা	সমগ্র মুসলিম জনসংখ্যার শতকরা
তুরস্ক	৭৩,৬১৯,০০০	৯৮%	৪.৭%
রাশিয়া	১৬,৪৮২,০০০	১১.৭%	১.০%
উজবেকিস্তান	২৬,৪৬৯,০০০	৯৬.৩%	১.৭%
কাজাখস্তান	৮,৮২২,০০০	৫৬.৪%	০.৬%
জার্মানী	৪,০২৬,০০০	৫%	০.৩%
ফ্রান্স	৩,৫৫৪,০০০	৬.৯%	০.২%
যুক্তরাজ্য	২,৪২২,০০০	২.৭%	০.১%

উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা

আমেরিকায় প্রচুর অভিবাসী থাকার কারণে প্রকৃত মুসলিম সংখ্যার সঠিক হিসাব নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। ২০০১ সালে সকল পরিসংখ্যান একত্রিত করে একটি সংস্থা সিদ্ধান্ত দেয় যে, উত্তর আমেরিকায় এ সংখ্যা ৩.৩ মিলিয়ন। যখন সরকারী হিসাবে বলা হয়েছিলো ৬ মিলিয়ন।

www.islamicpopulation.com-এর মতে ২০০৮ সালের হিসাবে উত্তর আমেরিকায় মুসলিম সংখ্যা ৭.২৬ মিলিয়ন এবং দক্ষিণ আমেরিকায় ২.৪১ মিলিয়ন। সর্বমোট ৯.৬৭ মিলিয়ন বা ৯০ লক্ষ ৬৭ হাযার, যা মোট আমেরিকার জনসংখ্যার ১.৬%। যুক্তরাষ্ট্রে মসজিদের সংখ্যা বর্তমানে প্রায় ১৫০০।

অঞ্চল	মুসলিম জনসংখ্যা	মোট জনসংখ্যার শতকরা	সমগ্র মুসলিম জনসংখ্যার শতকরা
ক্যারিবিয়ান	১৫,৮৬০	০.০৬৭%	০.০০১%
মধ্য আমেরিকা	৮৪,০৩৫	০.১৯৯%	০.০০৬%
উত্তর আমেরিকা	২,৭৫৭,২৬৫	০.৬১৮%	০.৩৪৭%
দক্ষিণ আমেরিকা	৮৯০,৪৯৭	০.২৩৯%	০.২৬৯%
মোট	৩,৭৪৭,৬৫৭	০.৪২৪%	০.৮২২%

উল্লেখযোগ্য মুসলিম জনসংখ্যাবিশিষ্ট কয়েকটি দেশঃ

দেশ	মুসলিম জনসংখ্যা	মোট জনসংখ্যার শতকরা	সমগ্র মুসলিম জনসংখ্যার শতকরা
যুক্তরাষ্ট্র	২,৪৫৪,০০০	০.৮%	০.২%
ত্রিনিদাদ ও টোবাগো	৭৮,০০০	৫.৮%	---
কানাডা	৬৫৭,০০০	২.০%	---
মেক্সিকো	১১০,০০০	---	---
আর্জেন্টিনা	৭৮৪,০০০	১.৯%	০.১%
ব্রাজিল	১৯১,০০০	০.১%	---
ভেনেজুয়েলা	৯৪,০০০	০.৩%	---
পানামা	২৪,০০০	০.৭%	---

ওশেনিয়া

এ অঞ্চলে ইসলামের আগমন ঘটে ৪০০ বছর পূর্বে ১৬০০ সালের দিকে। পাপুয়া নিউ গিনি ও পশ্চিম পাপুয়ার অধিবাসীরা ব্যবসার উদ্দেশ্যে চীন ও মালয় অঞ্চলে গমন কালে প্রথম ইসলামের সাথে পরিচিত হয়। ওশেনিয়ার উত্তরপ্রান্তে ইসলাম অপরিচিত ছিল ১৮০০ সাল পর্যন্ত। যেমন ফিজিতে ইসলামের আগমন ঘটে প্রথম ১৮৭৯ সালে যখন কতিপয় মুসলিম অভিবাসী শ্রমিকদের একটি জাহাজে এ অঞ্চলে আগমন করেন। বর্তমানে সেখানে প্রায় ৬৫ হাজার (৭%) মুসলিম রয়েছে। অষ্ট্রেলিয়ায় বর্তমানে মুসলিম সংখ্যা সাড়ে তিন লাখ (১.৭%) ও নিউজিল্যান্ডে প্রায় ৩৭ হাজার (০.৯%)।

অঞ্চল	মুসলিম জনসংখ্যা	মোট জনসংখ্যার শতকরা	সমগ্র মুসলিম জনসংখ্যার শতকরা
ওশেনিয়া	৩৭২,৯৬৮	০.৫০%	০.০২৫%

উল্লেখযোগ্য মুসলিম জনসংখ্যাবিশিষ্ট কয়েকটি দেশঃ

দেশ	মুসলিম জনসংখ্যা	মোট জনসংখ্যার শতকরা	সমগ্র মুসলিম জনসংখ্যার শতকরা
অষ্ট্রেলিয়া	৩৬৫,০০০	১.৭%	---
নিউজিল্যান্ড	৩৭,০০০	০.৯%	---
ফিজি	৬৫,০০০	৬.৩%	---

ইসলাম ও প্রাচ্যবাদ

আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব

ইসলাম ও প্রাচ্যবাদ
লেখিকা : মরিয়ম জামীলা
অনুবাদ : আব্দুর রাকিব
প্রকাশক : মল্লিক ব্রাদার্স, কলিকাতা।
প্রকাশ : জানুয়ারী ২০০১
মূল্য : ৩৫ টাকা।

লেখিকা পরিচিতি : খ্যাতনামা মুসলিম লেখিকা মরিয়ম জামিলা ২৩ মে ১৯৩৪ সালে নিউইয়র্কে এক জার্মান বংশোদ্ভূত ইহুদি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৬১ সালে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁকে আমেরিকান ইহুদী নারীদের মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী মনে করা হয়। মার্গারেট মার্কাস নাম্নী এই মহিয়সী নারী শৈশব থেকে মানসিক রোগাক্রান্ত ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে অসুস্থতার জন্য তাঁকে কয়েকবার বিরতি দিতে হয়। শেষ পর্যন্ত সিজোফ্রেনিয়া রোগে আক্রান্ত হওয়ায় তাকে অনার্স শেষ না করেই শিক্ষাজীবন শেষ করতে হয়।

স্কুল জীবনেই তিনি আরব সংস্কৃতি ও ইতিহাসের প্রতি আকৃষ্ট হন। বিশেষত: আরব ও ফিলিস্তীনীদের দুর্ভোগ তাকে চরমভাবে ব্যথিত করে তুলেছিল। মাত্র বারো বছর বয়সে তিনি ফিলিস্তীনী আশ্রয়শিবিরকে কেন্দ্র করে একটি গল্পগ্রন্থ লেখেন। একজন ভালো চিত্রকরও ছিলেন তিনি। অতঃপর বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে ইহুদীসহ বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রুপের সংস্পর্শে আসেন, কিন্তু তাদের সকলেই জায়নবাদকে সমর্থন করায় তিনি তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন না। ১৯৫৩ সালে অসুস্থতায় পড়ার পর তিনি ইসলাম ও কুরআনকে জানার সুযোগ পান এবং এর দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হন। মুহাম্মাদ আসাদের বিখ্যাত The Road to Mecca বইটিও তাকে অনুপ্রাণিত করে যা তাকে ইসলাম গ্রহণের পথ তৈরী করে দেয়। ১৯৫৭-৫৯ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ দু'বছর তাঁকে হাসপাতালে কাটাতে হয়। সুস্থ হওয়ার পর তিনি বাড়িতে ফিরে আসেন এবং বিভিন্ন ইসলামী সংগঠনের সাথে যুক্ত হন। দেশ-বিদেশের ইসলামী ব্যক্তিত্বগণের সাথে যোগাযোগ করতে থাকেন। বিশেষ করে পাকিস্তান জামা'আতে ইসলামীর আমীর মাওলানা মওদূদীর সাথে তাঁর যোগাযোগ হয়। শেষ পর্যন্ত ১৯৬১ সালের মে মাসে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মরিয়ম জামীলা নাম ধারণ করেন। ১৯৬২ সালে তিনি মাওলানা মওদূদীর আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে পাকিস্তানে গমন করেন এবং সেখানেই ১৯৬৩ সালে মুহাম্মাদ ইউসুফের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। পরবর্তী কয়েকবছর গভীরভাবে তিনি ইসলামের উপর পড়াশোনা করেন। অতঃপর লেখালেখির সাথে যুক্ত হন। সূক্ষ্ম ও সাহসী চেতনাশক্তির প্রয়োগ ঘটিয়ে তার ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে মুসলিম সমাজে আমদানীকৃত পশ্চিমা বস্তুবাদ, ধনতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও তথাকথিত আধুনিকতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। পরিণত হন একজন খ্যাতনামা কলমসৈনিকে। তাঁর সকল লেখনীতে পশ্চিমাদের মত তথাকথিত আধুনিক মুসলিমদেরকেও কোনরূপ ছাড় দেননি। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় তিরিশটি। এছাড়াও বহু প্রবন্ধ তিনি লিখেছেন। উর্দূ, ফারসী, বাংলা, তুর্কী, ইন্দোনেশিয়ান প্রভৃতি ভাষায় তার বেশ কিছু বই অনুবাদ করা হয়েছে। তাঁর যাবতীয় রচনা, বক্তব্য, ভিডিও ক্যাসেট, চিত্রকর্ম বর্তমানে নিউইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত রয়েছে। তার প্রসিদ্ধ কয়েকটি বই হল- *ইসলাম ও আধুনিকতা*, *পশ্চিমাকরণ এবং মানবকল্যাণ*, *ইসলাম বনাম পাশ্চাত্য*, *ইসলাম বনাম আহলে কিতাব : অতীত ও বর্তমান*, *ইসলাম ও পশ্চিমা সমাজ*, *ইসলাম ও আজকের মুসলিম নারী সমাজ*, *ইসলামী সংস্কৃতি : তত্ত্ব ও প্রয়োগ*, *ইসলাম ও আধুনিক মানুষ*, *পশ্চিমাকরণ বনাম মুসলিম জনগণ* ইত্যাদি। যে অসাধারণ প্রজ্ঞা ও বলিষ্ঠ চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তার প্রতিটি বইয়ে তা এককথায় অসাধারণ। গত শতকে তার মত বিদূষী মুসলিম নারী লেখিকার উদাহরণ খুব কম। তাঁর 'ইসলাম ও প্রাচ্যবাদ'[৩] শীর্ষক বইটি ১৯৮০ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। ২০০১ সালে বইটি বাংলায় অনূদিত হয়। তরুণ প্রজন্ম বিশেষত ছাত্রসমাজকে পাশ্চাত্যের বুদ্ধিবৃত্তিক ষড়যন্ত্রের হাত থেকে রক্ষা করাই বইটি রচনার মূল লক্ষ্য।

গ্রন্থ পর্যালোচনা :

লেখিকা তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে সামনে রেখে বইটিতে ইসলাম ধর্ম ও সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে পশ্চিমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের বিভিন্নমুখী দিক উন্মোচন করেছেন। দেখিয়েছেন কিভাবে আধুনীকিকরণের অজুহাতে, ছদ্মবেশী হিতৈষী হয়ে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের বিদগ্ধ পণ্ডিতগণ ইসলামী মূল্যবোধকে গুঁড়িয়ে দেয়ার জন্য পণ্ডিতি নাশকতায় লিপ্ত হয়েছেন। আর কিভাবে তাদের ধ্যান-ধারণা ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম সমাজে প্রভাব বিস্তার করে চলেছে।

বইটির শুরুতে সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় তিনি প্রাচ্যবিদ নামধারী পশ্চিমা পণ্ডিতদের ইসলামের বিরুদ্ধে আঘাত হানার সাধারণ একটি চিত্র উপস্থাপন করেছেন। কিভাবে কথায় কথায় তারা ইসলামকে পশ্চাদ্গামী, নিশ্চল, প্রতিক্রিয়াশীল, প্রগতিবিরোধী বলে শ্লাঘা বোধ করে। কিভাবে তারা ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপের জন্য পণ্ডিত উপাধি ও বড় বড় পুরস্কার লাভ করে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আলোচনার শুরুতে এনে মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের সতর্ক করতে চেয়েছেন- যেন তারা এই সব অবিবেকী পণ্ডিতকে ইসলামের চূড়ান্ত বিশেষজ্ঞ বলে ভুল না করে বসে। সাথে সাথে পশ্চিমী দুনিয়া ইসলাম ও মুসলমানদের কি চোখে দেখে তা পাঠককে দেখানোও তাঁর অভিপ্রায়। এর বিরুদ্ধে মুসলমান পণ্ডিতদের করণীয় আলোচনা করতে যেয়ে তিনি বলেছেন, 'মিথ্যা মুকাবিলার একমাত্র পথ হল সত্য উপস্থাপনা এবং যুক্তিগ্রাহ্য, বিশ্বাসযোগ্য কারণ-নির্ভর উন্নততর ধারণা সৃষ্টি করা। তাই আমাদের পণ্ডিতমহলের উচিৎ অসম্মতির ছোটখাটো কারণগুলো একপাশে সরিয়ে রেখে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব প্রাণীবিজ্ঞান সম্পর্কিত একটি সামগ্রিক লাইব্রেরী সৃষ্টিতে নিঃস্বার্থভাবে সহযোগিতা করা। মতলববাজ প্রাচ্যবিদদের নিন্দা করতে যেয়ে তিনি ভুলে যাননি প্রাচ্যবাদের কল্যাণকর দিকসমূহ। নিকলসন ও আরবেরীদের মত প্রাচ্যবিদগণ ইউরোপীয় ভাষায় ইসলামী সাহিত্যের

---

৩. *প্রাচ্যবাদ মূলতঃ একটি পরিভাষা যা ব্যবহৃত হয় পাশ্চাত্য দার্শনিক, লেখক ও চিত্রকরদের প্রাচ্য সম্পর্কিত ধারণাকে বুঝানোর জন্য। অর্থাৎ তারা তাদের লেখা ও চিত্রের মাধ্যমে প্রাচ্যের ধর্মসমূহ, চিন্তা-চেতনা, আচার-ব্যবহারকে যেভাবে চিত্রিত করেছেন তাকে প্রাচ্যবাদ হিসাবে অভিহিত করা হয়। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ' নামে আলাদা বিভাগ রয়েছে। পরিভাষাটি উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ব্যবহৃত হওয়া শুরু হয় এবং শেষভাগে এসে এটি পূর্ণাঙ্গ একটি বিষয়ে রূপ নেয়।*

অনুবাদে যে দুঃসাধ্য পরিশ্রম করেছেন তার কৃতিত্ব দিয়েছেন তিনি অকুণ্ঠচিত্তে।

আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত বইটিতে লেখিকা আটজন খ্যাতনামা প্রাচ্যবিদের বইকে সামনে রেখে আলোচনার অবতারণা করেছেন।

১ম অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন 'প্রাচ্যবাদের কাছে ইসলামের ইতিহাস' সম্পর্কে। এখানে তিনি লেবাননী বংশোদ্ভূত বিখ্যাত আমেরিকান ইতিহাসবিদ ড. ফিলিপ কে. হিট্টির 'Islam and the West' বইটির বিশ্লেষণ করতে যেয়ে দেখিয়েছেন লেখকের নিরংকুশ সংকীর্ণতা ও শঠতা। বইটির একেবারে শুরুতেই ড. হিট্টি যুক্তি প্রদর্শন করেছেন যে, নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) ছিলেন একজন প্রতারক (*নাঊযুবিল্লাহ*)। তারপর পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করে গেছেন বিদ্রুপাত্মক ভাষায় নবুয়তের বিভিন্ন পর্যায়গুলো। কুরআনকে তিনি দেখিয়েছেন খৃষ্টান, ইহুদী ও আরব পৌত্তলিকদের প্রভাবজাত জাল রচনা আর ইসলামকে ইহুদী-খৃষ্টান ঐতিহ্যের 'আরব সংস্করণ' এবং 'জাতীয়করণ' হিসাবে। ইসলামের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উপযুক্ততাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে তিনি লেখেন, 'ইসলাম যা জয় করে, তা ধর্ম নয়, রাষ্ট্র। ইসলাম ধর্ম নয়, আরবীয় বৈশিষ্ট্য। একটি সংশয়শূন্য পৃথিবীতে আরবরা আকস্মাৎ ফেটে পড়ে এক জাতীয়তাবাদী ঈশ্বরতন্ত্রের মত-একটি পূর্ণতর বস্তুজীবনের সন্ধানে।' মানবজাতিসত্তায় ইসলামের অবদান আলোচনা করতে গিয়ে বিভিন্ন সম্রাটের রাজ-প্রাসাদের শান-শওকত, নৃত্য-গীত, সুরা, ছূফীবাদ প্রভৃতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও আইন, জ্ঞান-বিজ্ঞান, বিশেষত মানবতার নৈতিক কল্যাণের ক্ষেত্রে ইসলামের অবদানকে তিনি পুরোপুরি এড়িয়ে গেছেন। পরিশেষে বর্তমান মুসলিম বিশ্বে পশ্চিমাকরণের যে প্রবণতা শুরু হয়েছে তার ভূয়সী প্রশংসা করে আবেগাপ্লুত হয়ে তিনি আধুনিক পশ্চিমী সমাজ-সভ্যতা, ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা ও বুদ্ধিবৃত্তিক অগ্রগতির গুণগানে মত্ত হয়েছেন।

লেখিকা হিট্টির এসব হিংসাত্মক অপপ্রচারণার বিরুদ্ধে জওয়াব দিয়েছেন ঠিকই; তবে স্বল্পভাষায়। কেননা তাঁর উদ্দেশ্য মূলতঃ পাঠককে ইসলামের বিরুদ্ধে এঁদের আক্রোশ ও অপপ্রচারণার ভয়াবহতা অনুধাবন করানো।

২য় অধ্যায়ে তিনি আলোচনা করেছেন ইসলামের প্রতি প্রাচ্যবাদের খৃষ্টান দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। এক্ষেত্রে তিনি নির্বাচন করেছেন 'The call of Minaret', 'Counsels in Contemporary Islam' প্রভৃতি বইয়ের লেখক মিশনারী ও ধর্মযাজক পণ্ডিত ড. কেনেথ ক্রাগকে। ড. কেনেথ তার লেখায় খুব নির্লিপ্ত ভাষায় নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নবীত্বকে নিয়ে উপহাস করেছেন আর রাষ্ট্রশক্তি ও সমরশক্তি অবলম্বন করায় ইসলামের আধ্যাত্মিক গুরুত্ব বিপুলভাবে ক্ষয়িত হয়েছে বলে কপট আফসোস প্রকাশ করেন। ইসলামের অপরিবর্তনশীল আইন-কানুনকে নমনীয় করার উপদেশ দিয়ে তিনি লেখেন- সময়ের সাথে অনেক কিছুই বদলে যায়। যেমন প্রাথমিক যুগে আরব সমাজে পৌত্তলিকতার প্রভাব অত্যন্ত বেশী ছিল বলে ছবি-মূর্তি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু বর্তমান সময়ে যখন তাওহীদ মুসলামনদের মনে বদ্ধমূল হয়ে গেছে তখন নির্বোধ কঠোরতার সাথে এটা নিষিদ্ধ করাটা বোকামী হয়ে যায়। তার মতে, আধুনিকতা ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অচল করে দিয়েছে।

তিনি ইসলামকে চিনেছেন বহুরূপে। 'পুরনো ইসলাম', 'মধ্যযুগীয় ইসলাম', 'ঐতিহ্যবাদী ইসলাম', 'উদার প্রগতিশীল ইসলাম', 'তুর্কী-ভারতীয়-পাকিস্তানী ইসলাম' ইত্যাদি তিনি অনর্গল ব্যবহার করেছেন আত্মতৃপ্তির সাথে। তিনি সুপারিশ করেছেন যে মুসলিম সমাজে ধর্মান্তরকে যে অত্যন্ত গর্হিত অপরাধ মনে করা হয় তা থেকে তাদের বেরিয়ে আসতে হবে। এ জন্য প্রয়োজন তাদের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষ ও পরমতসহিষ্ণু মনোভাব জাগ্রত করা। আর খৃষ্টান মিশনগুলোর প্রাথমিক কর্তব্য হবে মুসলিম সমাজকে এই উদার ভাবাদর্শে উজ্জীবিত করার জন্য সার্বিক প্রচেষ্টা চালানো।

লেখিকা এখানে প্রতিটি প্রসঙ্গের জবাব দিয়ে গেছেন এবং এ সকল ক্ষেত্রে খৃষ্টসমাজের দ্বিচারিতার নানা রূপগুলোও দেখিয়ে দিয়েছেন চোখে আঙ্গুল দিয়ে।

৩য় অধ্যায়ে তিনি প্রাচ্যবাদের ইহুদী দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন ইসরাঈলের ইহুদী প্রাচ্যবিদ সোলোমন ডেভিড গোইনতেইনের 'Jews and Arabs' বই অবলম্বনে। স্বাভাবিকভাবেই তিনি আর সব ইহুদীদের মত রাসূল (ছাঃ)-এর নবুওত ও পবিত্র কুরআনের ঐশ্বরিকতাকে অস্বীকার করেছেন। তবে মুহাম্মাদের হাত দিয়ে ইহুদী ও খৃষ্টান ধর্মের ধারাবাহিকতায় অনুরূপ একটি ধর্মের জন্ম হল কিভাবে এ বিষয়ে তার মত হল তৎকালীন ইহুদীদের কাছ থেকে ইহুদী ধর্মগ্রন্থ ইঞ্জীল প্রাপ্ত হয়ে তিনি মূসা (আঃ)-এর উপর এতটাই মুগ্ধ হন যে, অনুরূপ নতুন একটি ঐশী গ্রন্থ উৎপন্ন করতে তৎপর হয়ে উঠেন (*নাঊযুবিল্লাহ*)। ইহুদী আচার-আচরণগুলোর সাথে ইসলামের নিয়ম-কানুনের মিল খোঁজার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে একলাফে এই সিদ্ধান্তে পৌছে যান যে, ইসলাম ইহুদী ধর্মের বিকৃত রূপ মাত্র। ইসলামী শাসনব্যবস্থার অধীনে ইহুদীরা কেমন অবস্থায় ছিল তার বর্ণনায় অবশ্য গোইনতেইন স্বীকার করেছেন যে, মধ্যযুগীয় ইউরোপের চেয়ে তখনকার দিনে ইহুদিরা ঢের ভাল ছিল যদিও নীতি অনুযায়ী তারা সেখানে থাকত দ্বিতীয় শ্রেণীর (?) নাগরিক হিসাবে। ইসরাঈলে ইহুদীরা যে জবরদখলপূর্বক রাষ্ট্র গঠন করেছে এবং নির্বিচারে আরব মুসলমানদের নিধন করেছে তার যৌক্তিকতা দেখাতে তার মত হল, যায়নবাদ আগাগোড়া একটি মানবিক ও শান্তিবাদী আন্দোলন, এখানে সমস্ত বিপর্যয়ের মূল হল আরবদের দোষ-ত্রুটি, যারা ইহুদী জাতির উপর আক্রমণ শুরু করে; অপরদিকে ইহুদীরা কেবল খুব নিস্পৃহভাবে প্রতিশোধ গ্রহণ করে। তার মতে, যায়নবাদের প্রতি আরব জনগণের বিরোধিতা কিছু স্বার্থপর ও দূর্নীতি পরায়ন নেতার কৃত্রিম সৃষ্টি। যদি সাধারণ আরববাসীকে একা ছেড়ে দেয়া হয়, তাহলে তারা ইহুদী সমাজের সাথে শান্তিতে বসবাস করতে চাইবে। এই আধুনিক যুগে এসেও আরবদের কুরআনী ধ্রুপদী আরবী ভাষা ব্যবহারে তিনি বিরক্ত। তার মতে কোরআনের ভাষা এখন সমাজের প্রয়োজন মেটাতে যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন আঞ্চলিক কথ্য ভাষাকে উৎসাহিত করা।

৪র্থ অধ্যায়ে তিনি আলোচনা করেছেন মন্টেগোমারী ওয়াটের 'Islam and the intregration of society' বইটি নিয়ে। এই বইয়ে লেখক সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ইসলামকে বিশ্লেষণ করেছেন। চরম বস্তুবাদী ভাবকল্পকে সামনে রেখে বরাবরের মত স্থান-কালের ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফসল হিসাবে ইসলামকে দেখেছেন। আর ব্যাখ্যায় যেয়ে যে নাতিদীর্ঘ দার্শনিক যুক্তিমালা ও গল্পগাথার বিচিত্র সমাবেশ ঘটিয়েছেন তা তাঁর নিজের কাছেও হয়ত আশ্চর্যরকম ঠেকবে। সমাজের প্রয়োজনে একসময় ইসলামের বিকাশ ঘটলেও এখন তার আবেদন আর অবশিষ্ট নেই। সমাজ সংহতির জন্য কাজ করতে গেলে তাই মুসলমানদেরকে আধুনিক জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন হবে ইসলামকে তার জন্ম-উৎসের সত্যকে তথা এটা যে একটি 'মানবসৃষ্ট' ধর্ম তা স্বীকার করে নেয়া। আধুনিক যুগে ইসলামকে টিকিয়ে রাখতে গেলে এটাই সর্বাধিক প্রয়োজনীয়।- মুসলমানদের প্রতি এই প্রাচ্যবিদের পরামর্শ (!)।

৫ম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে প্রাচ্যবাদের ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। উইলফ্রেড কান্টওয়েল স্মিথের 'Islam in Modern History' বইটি এখানে আলোচনার কেন্দবিন্দু। ড. স্মিথ প্রাচ্যবাদের গতানুগতিকতা থেকে সামান্য সরে এসে অনেকটা নৈর্ব্যক্তিকভাবে আলোচনা শুরু করলেও বইটির ছত্রে ছত্রে মুসলিম সমাজে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রয়োগকে অপরিহার্য দেখানোর আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। কামালপন্থী তুরস্ককে মডেল ধরে তিনি মুসলমানদের অতীন্দ্রিয় বিশ্বাসের মরীচিকা থেকে বেরিয়ে এসে বাস্তববাদী হওয়ার পরামর্শ দেন। পশ্চীমী মডেলে খৃষ্টীয় সমাজ অনুকরণে তুরস্কে যে সংস্কার প্রচেষ্টা চালানো হয় তাকে আকণ্ঠ প্রশংসায় ভিজিয়ে তিনি বলছেন, এসব সংস্কারের উদ্দেশ্য খৃষ্টধর্ম গ্রহণের প্রশ্নের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়; বরং মধ্যযুগের পরিবর্তে আধুনিক যুগে উত্তীর্ণ হওয়ার প্রশ্ন। তিনি বলেন, আধুনিক বিশ্ব গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মাধ্যম দিয়ে সকলকে নিয়ে কিভাবে বাস করা যায় তা দেখিয়ে দিচ্ছে। অতএব মুসলমানদেরকেও ইসলামকে অন্যধর্মের মত সৃষ্টিশীল হিসাবে প্রমাণ দিতে হবে। কেননা একটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক যুগ বা ভৌগলিক এলাকার প্রয়োজন পূরণের পর ইসলামের আদি উপযুক্ততা এখন আর অবশিষ্ট নেই।

লেখিকা এককথায় এর জবাব দিয়ে প্রসঙ্গের সমাপ্তি টেনেছেন- 'যাবতীয় ধর্ম ও দার্শনিক ব্যবস্থা যদি একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর অনুপযোগী হয়ে যায় তাহলে যুক্তির দিক দিয়ে পশ্চিমী সভ্যতার ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার সত্য হবে। আজ আমরা যাকে 'আধুনিকতা' বলছি তা-ও অবশ্যই কালের স্রোতে বিলীন হয়ে যাবে। তবুও কেন পশ্চিমী ছাঁচ বা আদর্শকে অবিনাশী, অপরাজেয় বলা হয়? আর এর সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলারও সাহস কেউ করে না?'

৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম অধ্যায়ে মানবতাবাদী ও আধুনিকতাবাদী দৃষ্টিতে প্রাচ্যবিদরা ইসলামের ব্যাখ্যা কিভাবে করেছেন তা আলোচিত হয়েছে। 'ধর্ম মানুষের সৃষ্টি'- এই প্রতিপাদ্য দিয়েই শুরু হয় বিবর্তনমূলক মানবতাবাদী দর্শন। আর আধুনিকতাবাদী দর্শন তার শেষ টানে 'ধর্ম অবশ্যই সময়ের সঙ্গে পা ফেলে চলবে'- এই প্রতিপাদ্য নিয়ে। অর্থাৎ অভিজ্ঞতার দিগন্ত প্রসারিত হওয়ার সাথে সাথে পুরনো ধ্যান-ধারণা ছুড়ে ফেলে নতুনকে গ্রহণ করতে হবে- এটাই আধুনিকতাবাদের মূল কথা। এই আধুনিকতা যেহেতু পারলৌকিক যাবতীয় প্রসঙ্গকে অপ্রাসঙ্গিক ও অর্থহীন বিধায় বাতিল করে দেয়; তাই ইসলাম যদি নিজেকে পরিবর্তন করতে না পারে তবে তাকে একই ভাগ্য বরণ করতে হবে। এই ঘরানার একজন সৎ ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লেখক প্রফেসর এইচ. এ. আর. গীব পর্যন্ত তার 'Modern Trends in Islam' বইতে আধুনিকতার সাথে ইসলামের সংঘাতের বিষয়টি যথার্থতার সাথে তুলে ধরতে সমর্থ হলেও অন্য প্রাচ্যবিদদের মতই মুসলিম সমাজকে পুনর্গঠনের প্রয়োজনে বার বার খোদ ইসলামের সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার রব তোলা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি।

পরিশেষে সংক্ষিপ্ত উপসংহারে লেখিকা প্রাচ্যবাদের মৌলিক চারটি বক্তব্য উল্লেখ করেছেন- ১. মানুষ জৈবিক বিবর্তনের মাধ্যমে খুব নিম্ন অবস্থা থেকে বর্তমান উন্নত শারিরীক ও মানসিক কাঠামোয় উন্নীত হয়েছে। ২. মানবসমাজও একইভাবে খুবই আদিম স্তর থেকে উঠে এসে ধীরে ধীরে সুউচ্চ সংস্কৃতির শিখরে পৌঁছেছে বিকাশপ্রাপ্ত হয়ে- যার উপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে আধুনিক পশ্চিমী সভ্যতা। ৩. 'পরিবর্তন' একটি চিরন্তন প্রাকৃতিক আইন। সুতরাং পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বিরোধিতা করার অর্থ হল খোদ প্রাকৃতিক আইনকেই লঙ্ঘন করা। নতুনই সর্বোত্তম, পুরাতন সদা পরিত্যাজ্য। তাই পূর্বে প্রতিষ্ঠিত কোন আদর্শ বা নীতিবিধানকে সমর্থন করার অর্থ আদিম ও সীমাবদ্ধ অস্তিত্বের দিকে পশ্চাদগমন করা। সুতরাং ধর্মের যে ধারণা 'সর্বপ্রাণবাদ' দিয়ে শুরু হয়েছিল যা সফল হয়েছিল 'নীতিতাত্ত্বিক একত্ববাদ'-এ, তার কবর রচিত হয়েছে দীর্ঘ মানবীয় অভিজ্ঞতার ফল-ফসল আধুনিক 'বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ'-এর আবির্ভাবে। ৪. বিজ্ঞানভিত্তিক আধুনিক সভ্যতা ঐশী প্রত্যাদেশ ও অতীন্দ্রিয় মূল্যবোধের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ধর্মের ধারণাকে নাকচ করে দেয়। কেননা ঐশ্বরিকতা মেনে নেয়ার অর্থ হল 'পরিবর্তন'কে স্বীকৃতি না দেয়া। কেননা চূড়ান্ত সত্য যখন জানা গিয়েছে, তখন তাকে পরিবর্তন করার উপায় নেই। অথচ 'পরিবর্তন' ছাড়া 'প্রগতি' কোনভাবেই সম্ভব নয়।

এ মাপকাঠিগুলোর উপর প্রাচ্যবিদরা ইসলামকে বিবেচনা করে বলেই ইসলামকে 'সংস্কার' করার জন্য, 'আধুনিকীকরণ' করার জন্য তারা এত মরিয়া। তবে বিশেষকরে আজকের অবক্ষয়ের যুগেও অসংগঠিত, পশ্চাদপদ, হীনবল মুসলমানদের ব্যাপারে তারা এত উদ্বিগ্ন কেন? লেখিকা তার উত্তর দিয়েছেন- এর কারণ দু'টি- **১. ঐতিহাসিক :** ইসলামের শক্তিতে বলীয়ান মুসলমানদের স্বর্ণজ্বল অতীতের সেই দিনগুলোতে পাশ্চাত্য যে তীক্ত অভিজ্ঞতার স্বাদ গ্রহণ করেছে তা তাদের মাঝে আজও অনঢ়ভাবে ক্রিয়াশীল। এজন্য তারা মুসলমানদের অব্যক্ত সম্ভাবনাময় শক্তিকে সবসময় ভয় পায়, ভয় পায় একটি শক্তিশালী ইসলামী রাষ্ট্র বা ঐক্যবদ্ধ মুসলিম এলাকাকে। **২. দার্শনিক :** পাশ্চাত্য আজ যে দর্শনের উপর দাড়িয়ে (প্রাচীন গ্রীস থেকে আমদানীকৃত নাস্তিক্যবাদ, অজ্ঞেয়বাদ, বস্তুবাদ এবং নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদ) রয়েছে, তার বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র অহিপ্রাপ্ত বিশুদ্ধ ভাবাদর্শ হিসাবে ইসলামকে তারা একমাত্র চ্যালেঞ্জ মনে করে। ফলে ইসলামকে প্রতিরোধে মনস্তাত্বিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধের অংশ হিসাবে হিসাবে প্রাচ্যবিদরা এই প্রচারে মুসলিম দেশগুলোকে প্লাবিত করা তাদের অবশ্য কর্তব্য মনে করেন যে, ইসলাম ও ইসলামী জীবন-প্রক্রিয়া হতাশাজনকভাবে 'মধ্যযুগীয়' এবং 'সেকেলে'।

লেখিকা প্রাচ্যবিদদের ষড়যন্ত্রমূলক অপপ্রচারের বিভিন্নধাপের সাথে পাঠককে পরিচিত করিয়ে দিতে তাদের বক্তব্যসমূহ বিস্তারিত আকারে উদ্ধৃত করেছেন এবং প্রয়োজনীয় সকল স্থানেই উপযুক্ত যুক্তি ও ইতিহাস তুলে ধরে তাদের অভিযোগগুলো খন্ডন করেছেন। দেখিয়ে দিয়েছেন তাদের পরম আরাধ্য ও ঢাক-ঢোল পিটানো 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র ব্যর্থতার করুণ চিত্র, যা কেবল দিয়েছে বিনোদন, শিল্পকলা, কামুকতা, অর্থহীন আমোদ-প্রমোদ, জাতিগত ভেদবুদ্ধি, সর্বব্যাপী অপরাধপ্রবণতা, আইন-শৃংখলাহীনতা, অরাজকতা-অত্যাচার, আধুনিক যুদ্ধের অভূতপূর্ব বর্বরতা আর অনর্থক বিলাসিতায় প্রাকৃতিক ও মানবিক সম্পদের বিপুল অপচয়। বিত্ত-বৈভব, বস্তুগত আরাম-উপভোগ ও আত্মচরিতার্থতার সুযোগ সেখানে অবারিত কিন্তু আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উপবাস সেখানে অতি তীব্র। আর এটাই সেই তথাকথিত 'অগ্রগতি' আর 'শিক্ষা-সংস্কৃতি'র বাস্তব ফলাফল!!

বইটি সাধারণ সচেতন পাঠক ছাড়াও বিশেষতঃ বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য খুব প্রয়োজনীয়। কেননা পাঠ্যসূচীর পরিপূরক হিসাবে তাদেরকে প্রায়ই প্রাচ্যবিদ পণ্ডিতদের লেখনী পড়তে হয়। আর অসচেতনতার কারণে তারা সহজেই তাদের অপপ্রচারণার ফাঁদে পড়ে বিভ্রান্ত হয়। অনুবাদক আব্দুর রাকিব যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন বইটি সুখপাঠ্য করার। তবে কিছু স্থানে জটিলতা রয়ে গেছে যা পাঠকের জন্য ক্লান্তির কারণ হতে পারে।

এক জাপানী যুবকের ইসলাম গ্রহণ

ভাষান্তর : আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

*[পূর্ব প্রাচ্যের দেশ জাপানে জন্মগ্রহণকারী ৩০ বছর বয়সী মিশ্র জাপানী-আমেরিকান বংশোদ্ভূত যুবক **ইউয়ামা কেনজী**। সদা প্রাণচঞ্চল, সোজাসাপ্টা বাক্যালাপে অভ্যস্ত এই যুবকের ইসলাম গ্রহণ ছিল স্বতস্ফূর্তভাবেই। ৩ বছর আগে (২০০৬ইং) তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। বর্তমানে দুবাইয়ে অবস্থানকারী কেনজী অনুবাদকের অনুরোধে তাঁর পরিবর্তিত হওয়া এবং পরিশেষে ইসলাম গ্রহণের হৃদয়গ্রাহী কাহিনীটি লিখে পাঠান। তাওহীদের ডাক পাঠকদের জন সেটির অনুবাদ পত্রস্থ করা হল*

'আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি কেবল কেবলই আমার জন্য। অন্য কারো প্রভাবে নয়। আমি আমাকে কখনই নিজেকে 'revert' বা 'convert' বলি না। কেননা 'revert' বলা হয় তাকে যে অমুসলিম অবস্থা থেকে ইসলামের দিকে ফিরে এসেছে, আর 'convert' বলতে বুঝায় তাকে যে অন্য ধর্ম পরিত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করেছে। আমি মনে করি এর কোনটাই আমি ছিলাম না। কেননা আমার বদ্ধমূল বিশ্বাস যে, মায়ের কোল থেকেই যেন আল্লাহকে চিনতাম। জন্ম থেকেই আমি ছিলাম আধ্যাতিকতাবোধসম্পন্ন। শৈশবের অবচেতন দিনগুলোতেও আমার মনে সবসময় একটা অনুভূতি জাগ্রত ছিল যে, আমি যেন কোন একজনের পর্যবেক্ষণে রয়েছি আর আমি তাতে নির্ভার ও প্রশান্তি বোধ করতাম। যেহেতু জাপানের গ্রাম্য এলাকায় আমি বড় হয়েছি, তাই তখন উন্মুক্ত প্রান্তরে একাকী খেলাধুলা করতাম সে সময়ও আমার মাঝে এই অনুভূতি কাজ করত। আমি মনে করি না বর্তমান যুগের শিশুদের যেমন অনেক কিছু থেকে বাধা দেয়া হয় তার চেয়ে আমাকে বেশী কিছু করার সুযোগ দেয়া হয়েছিল। তারপরও আমার মনে 'অদৃশ্য পর্যবেক্ষণ' অনুভূতিটা সবসময় কার্যকর ছিল যা আমাকে সবসময় এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত রাখত যে কোন কিছুই আমাকে ক্ষতি করতে পারবে না। কিন্তু বড় হতে হতে এই ধারণা একসময় আমি হারিয়ে ফেললাম। কেন তা বলতে পারব না তবে আমার ধারণা ধীরে ধীরে বাচ্চারা যখন আশপাশের প্রতিকুল চিত্র দেখে অভ্যস্ত হয়ে উঠে তখন এ অনূভূতি সে হারিয়ে ফেলতে থাকে।

আমার মাতা বৌদ্ধ আর পিতা ছিলেন খৃষ্টান পরিবার থেকে আসা। ধর্মচর্চায় তারা তেমন অভ্যস্ত ছিলেন না। আমি আমার মায়ের সাথে মাঝে মাঝে বৌদ্ধ ধর্মসভায় যেতাম। যদিও তার ধর্মে আমার বিশ্বাস ছিল না। আমার কাছে এটা ছিল এমন যে, কতিপয় নারী-পুরুষ একটি সাধারণ লোকের পিছনে একত্রিত হয়ে মিলিত স্বরে কিছু মন্ত্র সুরসহযোগে পাঠ করা। আমি সেগুলো বোঝার চেষ্টা করতাম কিন্তু আমার কানে এটা বিরক্তিকর কোলাহলের মত ঠেকত। এজন্য আমি বাইরে এসে উচু পাহাড়ের চুঁড়ায় অবস্থিত মঠের বিড়ালগুলোর সাথে খেলতাম অথবা সাকুরা গাছে চড়তাম, কখনওবা গভীর খাদে ঢিল ছুড়ে নিবিষ্ট চিত্তে পর্যবেক্ষণ করতাম।

অন্যদিকে আমার পিতার পরিবার থেকে আমি খৃষ্টান ধর্মও শিখেছিলাম। আমি তাদের সাথে রবিবারের প্রার্থনা সভাতে যেতাম। সেখানেই আমি প্রথম শিখেছিলাম গড, ইবরাহীম, ইউসুফ, দাউদ, সোলায়মান প্রভৃতি নামগুলো এবং অবশ্যই যিশুর নাম। আমি প্রার্থনাসভার শিক্ষকদের দেখতাম গড, যিশু এবং পবিত্র আত্মা শব্দগুলো একই অর্থে ব্যবহার করতে। এতে আমি ঐ ছোট বয়সেও বেশ ধাঁধাঁয় পড়ে যেতাম। মনে হত কোথাও ভুল হচ্ছে। একদিন রবিবারে প্রার্থনার পূর্বে পাদ্রী আমাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখছিলেন। বলছিলেন ঈসা (আঃ) ও তার সঙ্গী-সাথীদের গল্প। কিভাবে ঈসা (আঃ) সামান্য কিছু মাছ ও রুটি দিয়ে উপস্থিত সকলকে পরিতৃপ্ত করেছিলেন ইত্যাদি। বক্তব্যের মাঝে কোন এক প্রসঙ্গক্রমে আমি হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলাম, 'যিশু কেন এই বন্যা সৃষ্টি করলেন?' পাদ্রী বললেন; 'এ প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক নয়, কেননা আমরা এখন যিশু সম্পর্কে কথা বলছি।' জবাবে বললাম 'কিন্তু যিশু তো নিজেই গড, গডই যিশু। অতএব যিশুই বন্যা সৃষ্টি করেছেন।' পাদ্রী থতমত খেয়ে ইতস্ততভাবে বললেন, 'না, যিশু সেখানে উপস্থিত ছিলেন না।' আমি আবার পূর্বের ন্যায় প্রশ্ন করলাম। কিন্তু আমার চাচাতো ভাইরা প্রার্থনার কাজ দ্রুত শেষ করার জন্য আমাকে সেখানেই থামিয়ে দিলেন। যাহোক বয়স বাড়ার সাথে সাথে এসব প্রশ্ন আমাকে আরো বেশী ধাক্কা দিতে লাগল। আমি পাদ্রীদের প্রায়ই এসব প্রশ্ন করে নিশ্চুপ করে দিতাম। ফলে অধিকাংশই আমাকে বলত যে, আমার এসব ধৃষ্টতাপূর্ণ প্রশ্নের কারণে আমি নরকের দিকে ধাবিত হচ্ছি। আমি ভাবতাম, এই সাধারণ নিষ্পাপ প্রশ্নগুলোর কারণে আমাকে নরকে যেতে হবে কেন? প্রশ্নই তো শিক্ষার দুয়ার খুলে দেয়, আর তাতে বিশ্বাসও পোক্ত হয়। তাহলে এরা প্রশ্ন করতে বাধা দেয় কেন? যাহোক তারা সবাই এ কারণে আমাকে খুব অপছন্দ করত।

জীবনের প্রথম ধাপেই আমি পড়াশুনার বিষয়টি রপ্ত করে ফেলেছিলাম। ইতিহাস, জীবনী, আত্মজীবনী ইত্যাদি বিষয়গুলো আমার খুব ভাল লাগত। আমি যখন ক্রুসেড সম্পর্কে পড়া শুরু করি তখনই প্রথম ইসলাম শব্দটির সাথে পরিচিত হই। শব্দটি উচ্চারণ করতাম 'ই-স্লাম', 'ইস-লাম', 'ইসল-আম' ইত্যাদিভাবে। পরে একদিন গ্রন্থাগারিককে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন উচ্চারণটি হবে 'ইজলাম'। যুদ্ধের ইতিহাস পড়ার শুরুতেই আমি দেখলাম একপক্ষ গড, যিশু ও পবিত্র আত্মার নামে যুদ্ধ করছে। আমি চিন্তা করলাম গড তো মানুষ হত্যা করতে নিষেধ করেছেন, অথচ এই পক্ষটি বলছে এটা গডের ইচ্ছারই প্রতিফলন! আরেক পক্ষ যারা মুসলিম তারাও বলছে তারা মানুষ হত্যা করছে আল্লাহর জন্যই। এটা আমার কাছে বিস্ময়কর লাগছিল যে, এসব মুসলিম কেন যুদ্ধ করছে এমন লোকদের বিরুদ্ধে যারা বলছে তারাও স্রষ্টার জন্যই যুদ্ধ করছে?। আমার পড়া বইগুলোতে মুসলিমদের দেখানো হয়েছিল যে তারা মরু থেকে আসা একদল অসভ্য বর্বর লোক, যারা খৃষ্টান ধর্মকে ধ্বংস করতে চায়। আর যারা ইসলাম গ্রহণ করে না তাদেরকে তারা শিরচ্ছেদ করে দেয়। এ চিত্র মুসলমানদের সম্পর্কে আমাকে ভয়ংকর বিরূপ ধারণা দিয়েছিল। অন্যদিকে যখন আমি পড়লাম মোঙ্গলদের ইতিহাস যেখানে তারা বোখারা, সমরকন্দ, বাগদাদ, পারস্যের মুসলমানদের উপর নির্মম, নৃশংস আক্রমণ চালিয়েছিল, তখন কিছুটা সহানুভূতিশীল দৃষ্টিতে ভাবছিলাম এখানে মুল কারণটা কী? এরা প্রত্যেকেই কেন মুসলমানদের এত ঘৃণা করে? গড বা যিশুও কি এদের প্রতি এমন ক্রোধন্মত্ত? ত্রিত্ববাদের প্রতি বিশ্বাসটা আমার কখনই ছিল না সেই শৈশবের প্রশ্নের উত্তর না পাওয়ার পর থেকে। এ ইতিহাস পড়ার পর সে বিষয়টি আমার সামনে আবার আসল সাথে আরো কিছু প্রশ্নসহ। শেষপর্যন্ত আমার মনে হল গড এবং যিশুই ছিলেন মূল কারণ যে কারণে এসব নৃশংস যুদ্ধ হয়েছিল।

হাইস্কুলে থাকতে আমি ধর্ম সম্পর্কে মানুষের কাছ থেকে কিছু শোনা বাদ দিয়েছিলাম, আর নিজেও কারোর সাথে এ সম্পর্কে কথা বলতাম না। কিন্তু আমি বিশ্বাস করতাম একজন স্রষ্টা রয়েছেন এবং কোন একটি ধর্মকে অবশ্যই সঠিক হতে হবে। কিন্তু সেটা কোনটা? ইহুদী (আমি তাদের সম্পর্কে ও তাওরাত সম্পর্কে পড়েছিলাম এবং বাইবেলের সাথে তার বিবরণ তুলনা করেছিলাম)? না খৃষ্টান (কিন্তু তারা বলে যিশুই হলেন গড, আবার বলে তিনি মানুষ, একটু দাড়াও...তিনিই হলেন, পবিত্র আত্মা। খুবই বিভ্রান্তিকর!)? না মুসলিম (নাহ! তারা তো খুব ভয়ংকর। কিভাবে স্রষ্টা তাদের সাথে থাকতে পারেন তরবারী নিয়েই যাদের কাজ?)?। এ তীব্র সংশয়ের মাঝে আমি স্রষ্টা সম্পর্কে কথা বলা বন্ধই করে দিলাম। কেননা এ কথা শুনতে শুনতে আমি এতই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম যে, অপরিণামদর্শী ও সমস্যাসৃষ্টিকারী প্রশ্ন উত্থাপনের জন্য আমাকে নরকেই যেতে হচ্ছে। এরপর আমি কয়েকমাস স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস পর্যন্ত ত্যাগ করেছিলাম। তখন কে ভুল আর কে ঠিক এটা নিয়ে আমি আর চিন্তা করতাম না। আমি শুধু চাইতাম, সবাই নিজেদের মধ্যে এসব নিয়ে গন্ডগোল করুক কিন্তু আমাকে আমার নিজস্ব চিন্তাধারার উপরে ছেড়ে দিক।

জাপানে আমি টোকিওর দ্রুতগতির জীবনে বসবাস করতাম। সপ্তাহ জুড়ে কাজ অতঃপর শুক্র ও শনিবার নাইট পার্টি এবং রবিবার সারাদিন ঘুম এই ছিল আমার জীবন। আমার দেশী-বিদেশী অনেক বন্ধু ছিল। কেননা টোকিও বিদেশীদের জন্য বেশ আকর্ষণীয় স্থান। কিন্তু তাদের মধ্যে মাত্র একজনই ছিল মুসলিম, যে ছিল মিশ্র টার্কিশ-জাপানী। তবে সে আমাকে ইসলাম সম্পর্কে কিছুই বলত না। আমি মুসলিম বলতে বুঝতাম কিছু পাকিস্তানী বা ইন্দোনেশীয়দেরকে যারা খাওয়ার পর আমার সঙ্গী-সাথীদের মত লাইভ কনসার্ট বা ইজেকায়া দেখতে বসে না, লাঞ্চ ব্রেকের সময় ফেমিরেসু (ফ্যামিলি রেস্ট্যুরেন্ট)-তে মেয়েদের মোবাইল নাম্বার সংগ্রহে ব্যস্ত হয় না। আমি তাদের চিনতাম সাইতামা বা সিজোকা এলাকার কিছু ফ্যাক্টরী শ্রমিক হিসাবে। জাপানে মুসলমানদের সাথে পরিচিতি বলতে আমার এতটুকুই।

অতঃপর আমি বাহরাইনে চাকুরীর প্রস্তাব পাই। বাহরাইন সম্পর্কে আমি কিছুই জানতাম না। তবুও আমি যাওয়ার সিদ্ধান্তই নিলাম। আমার গার্লফ্রেন্ডও আমার সাথে বাহরাইনে এল। আমরা ছিলাম এখানে নব আগন্তুক প্রাণীর মত। আর দেশটিও ছিল আমাদের কাছে নতুন গ্রহের মত। জাপানের সুপার ফাস্ট, অতি আধুনিক লাইফস্টাইলের তুলনায় এখানকার জীবনযাত্রা সবকিছু খুবই ধীরগতির। আমরা দু'জনই খুব বিরক্ত বোধ করতাম। তবুও আরো কিছুদিন দেখার সিদ্ধান্ত নিয়ে আমরা থেকে গেলাম। এক ছুটির দিনে আমরা 'আল-ফাতেহ' মসজিদে বেড়াতে গেলাম। এই মসজিদেই প্রথমবারের মত আমি ইসলামের সরাসরি সংস্পর্শে আসলাম। সেখান থেকে আমি ইংরেজী ও জাপানী ভাষায় অনূদিত কুরআনের কপি সংগ্রহ করলাম। আমার গার্লফ্রেন্ডও সে সময় এ ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠে। সেখানকার মুসলিম তরুণীদের বোরকা আর পরিধেয় বস্ত্রাদি তাকে মুগ্ধ করে। ছুটির দিনগুলোতে আমরা আশপাশে প্রচুর বেড়াতাম, দুবাইতেও গিয়েছিলাম অনেকবার। আটমাস সেখানে অবস্থানের পর আমরা জাপান চলে আসার সিদ্ধান্ত নেই। কিন্তু চুক্তির মেয়াদ আরো একবছর বর্ধিত হওয়ায় তা সম্ভব হল না। অবশ্য বেশ কিছুদিন পর ছুটি পেয়ে আমরা জাপান যাই। কিছুদিন থাকার পর পুনরায় বাহরাইন ফেরৎ আসার সময় আমার গার্লফ্রেন্ড আমার সাথে আর এল না। সেখানেই তার সাথে আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। আমি অবশ্য এতে খুশিই হলাম। কারণ আমার মনে পড়ে একদিন কোরআন হাতে নিয়ে পড়ার সময় সে আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বলেছিল 'তুমি এটা পড় না আর প্রতিজ্ঞা করো কোনদিন পড়বে না' বললাম, 'কেন? এটা তো শুধুমাত্র একটি বই'। সে বলল, 'না, আমার ভয় হয় তুমি মুসলিম হয়ে যাবে।'

যাহোক আমি বাহরাইনে এসে আবার কাজে যোগ দিলাম। এখানে বাহরাইনী যুবকদের সাথে আমার একটা বন্ধু সার্কেলও গড়ে উঠল। আমরা কফি শপ এবং শিসা জয়েন্টগুলোতে একত্রিত হতাম এবং শিসা, কফি, মিন্ট চা ইত্যাদি পান করার ফাঁকে বিবিধ আলোচনায় মত্ত হতাম। ধর্ম নিয়েও মাঝে মধ্যে আলোচনা আসত। তারা ধর্মের বিভিন্ন প্রসঙ্গে যখন বলত, আমি বলতাম যে আমিও এটা জানি। তারা অবাক হয়ে জানতে চাইতো আমি এটা জানলাম কিভাবে? আমি বলতাম বাইবেল ও তাওরাতেও এর বর্ণনা আছে। তারা অভিভূত হত যে পূর্ব প্রাচ্যের এই জাপানীও বাইবেল ও তাওরাত, খৃষ্টান ও ইহুদী ধর্ম সম্পর্কে জানে। সাথে সাথে আমিও বর্ণিত ঘটনাগুলো যখন কুরআনে আছে জানলাম তখন কুরআনের প্রতি আমার আগ্রহ নিবদ্ধ হল। আমি বাসায় যেয়ে কুরআন নিয়ে বসলাম এবং পড়তে শুরু করলাম। চমৎকার! আমি যেন এক অসাধারণ ইতিহাস বইয়ের মুখোমুখি হলাম। বিভিন্ন স্থানে আমি এমন অনেক বিষয় পেলাম যার সাথে আমি পূর্ব থেকেই পরিচিত। আমি অন্য দু'টি ধর্মের সাথে ইসলামের গভীর আন্তঃসম্পর্ক খুঁজে পেলাম। এ ঘটনার পর কোন সুস্পষ্ট কারণ ছাড়াই আমি একদিন শৈশবে শেখা সেই প্রার্থনা করা আবার শুরু করলাম। কাজে যাওয়ার সময়, লাঞ্চ ব্রেকের সময়, বাড়িতে ফিরে যখন-তখন আমি প্রার্থনা করতাম। এটা ছিল অনেকটা এখনকার দো'আ করার মত। দিনে দিনে ইসলাম সম্পর্কে জানার প্রতি আমার আগ্রহ বাড়তে লাগল।

কাঙ্খিত সেই দিনটি- একদিন আমার এক বন্ধুর সাথে কথা বলার এক পর্যায়ে বললাম, চল আমরা আল ফাতেহ মসজিদ থেকে ঘুরে আসি। সে জিজ্ঞাসা করল, 'কেন?' আমি বললাম, 'সেখানকার কারো সাথে আমি একটু কথা বলব।' সে বলল, 'তুমি কি নিশ্চিত যাচ্ছ?' 'অবশ্যই! আমি বললাম।' খানিকবাদে আমরা মসজিদে যেয়ে পৌছলাম এবং সোজা পাঠ কক্ষে প্রবেশ করলাম। সেখানে পাঠরতদের উদ্দেশ্য করে বললাম, আপনাদের কোন একজনের সাথে আমি একটু কথা বলতে চাই। এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমাদের কাছে যে আসলো তার নাম ছিল ফাহদি। আমরা তার সাথে পরিচিত হবার পর সে জিজ্ঞাসা করল আমরা কী জানতে চাই। আমি তাকে বললাম, 'আমাকে আপনি এমন একটি কমন বিষয়ের কথা বলুন যেটা ইসলাম এবং আহলে কিতাবীদের মাঝে সম্পর্ক নির্দেশ করে।' প্রশ্নের উত্তরটি আমার মাথায় আগে থেকেই ছিল; আমি কেবল বুঝতে চেয়েছিলাম যে, সে বিষয়টি কিভাবে ব্যাখ্যা করে। ফাহদি বলল, 'নবীদের ধারাবাহিক আগমণই এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ, যদিও ইহুদী ও খৃষ্টানরা কয়েকজন নবীকে অস্বীকার করে। প্রত্যেক নবীই মানুষের নিকট উপস্থিত হয়েছেন এই দা'ওয়াত নিয়ে, তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে এ বার্তা নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন যে, প্রত্যেক মানুষকে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে, আর এজন্য তাদেরকে মূর্তিপূজা বা আল্লাহ্‌র সাথে কারো শরীক স্থাপন করা থেকে বিরত থাকতে হবে নতুবা তাদেরকে জাহান্নামের মুখোমুখি হতে হবে।' আমার চক্ষু যেন নতুনভাবে উন্মোচিত হল। হ্যা! তাওরাতের যিশুর মত আমিও যেন বলে উঠলাম, 'আমি পেয়ে গেছি আমার পথ!' 'আমার পিতার কাছে পৌছানোর পথ আমার সামনে উপস্থিত।' ঠিক যেভাবে রাসূল (ছা.) বলেছিলেন, 'আমি পথ পেয়ে গেছি'...'হ্যা, এটাই সেই পথ'.. 'আমি আমার পথ পেয়ে গেছি'। এই সেই পথ যার দিকে মুহাম্মাদ (ছাঃ) সকল জ্ঞানবান নারী-পুরুষকে আহবান জানিয়েছিলেন, 'হে মানুষ! তোমরা আল্লাহর দিকে ফিরে এস এবং একমাত্র তারই ইবাদত কর। একমাত্র তার কাছেই আত্মসমর্পণ কর। তোমাদের সামনে রয়েছে চিরস্থায়ী এক জীবন। যদি তোমরা তোমাদের প্রভুর আনুগত্য করতে অস্বীকার করে তবে তোমাদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে জাহান্নামের মর্মন্তুদ শাস্তি।'

অতঃপর ফাহদি আমাকে নিশ্চিত করল যে আমি সত্যিই আমার সেই পথ আবিষ্কার করে ফেলেছি এবং নিজ থেকেই আমি বুঝে ফেলেছি যে, ইসলামই গড তথা স্রষ্টাকে উপাসনা করার সেই কাঙ্খিত সত্য পথ। আমি তখনই কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করলাম (*আলহামদু-লিল্লাহ*)। সেদিন থেকে এ পবিত্র পথে আমার যাত্রা শুরু। ইনশাআল্লাহ কখনো এ পথকে আমি হারাব না।

হা হা...বন্ধু! অনেকে বলে, মুহাম্মাদ (ছা.) যা কিছু জেনেছেন তা নাকি ছিল ইহুদী ও খৃষ্টানদের সাথে তার মেলামেশার ফলশ্রুতি। এটা কোন যুক্তির কথা? নাহ্...চিন্তা করুন, একজন মানুষ সুস্থ মাথায় শুধুমাত্র একটা খেয়ালের পিছনে ছুটতে যেয়ে জীবনের সবকিছু ত্যাগ করে? শুধুমাত্র মানুষকে বোকা বানিয়ে নতুন একটি ধর্মে দীক্ষিত করার জন্য কোন মানুষ চূড়ান্তভাবে তার মানসিক, শারীরিক পরিশ্রম ব্যয় করতে পারে? কে এমন রয়েছে যে দিনের পর দিন নিজের প্রতি এভাবে আবর্জনা ও উচ্ছিষ্ট নিক্ষেপকে সহ্য করে যাবে? কোন মানুষ নিজেকে নিজের বাসস্থান থেকে, নিজের শহর থেকে বিতাড়িত হওয়া ও রুক্ষ মরুভূমিতে খাদ্য-পানীয় বিহীন অবস্থায় নির্বাসিত হওয়াকে স্বেচ্ছায় বরণ করতে পারে? আর একই ভাগ্য বরণ করার নিশ্চিত সম্ভবনা দেখেও কোন মানুষই বা এমন একটা লোকের অনুসরণ করতে যাবে? যদি কারো মানুষের মনস্তত্ব সম্পর্কে সামান্য জ্ঞান থাকে, সে নিশ্চয়ই এতক্ষণে বুঝে ফেলেছে এর উত্তর মোটাদাগে **'না'**। কোন সুস্থ বিবেকসম্পন্ন মানুষ নিজেকে এই কঠিন, অসহনীয় পরীক্ষার মধ্যে ফেলতে পারে না যেভাবে আমাদের রাসূল (ছা.) ফেলেছেন, যতক্ষণ না এই বিশ্বাস তার বুকে বদ্ধমূল হয় যে তিনি যা কিছু নির্দেশপ্রাপ্ত হয়েছেন, যা কিছুর প্রতিশ্রুতি পেয়েছেন, যা কিছু জেনেছেন তার সমস্তকিছুই সত্য সত্যই মহান স্রষ্টা আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত।

এই হল আমার ইসলাম গ্রহণের পর্বটি। ও হ্যা, আমার সেই জাপানী বন্ধুকে বিয়ে করার সুযোগ আমার হয়নি। তবে বিনিময়স্বরূপ সে আমার জন্য সবচেয়ে বড় একটা কাজ করেছে। আর তা হল সে আমাকে যা কিছু বলে কুরআন থেকে বিরত রাখতে চেয়েছিল তার মাধ্যম দিয়ে আল্লাহ আমাকে চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলেন তাকে খুঁজে বের করার। আলহামদুলিল্লাহ আমি আজ তাকে খুঁজে পেয়েছি...যিনি এই বিশ্বচরাচরের মহান স্রষ্টা, সকল প্রভুর প্রভু, সকল রাজার রাজা। সমগ্র সৃষ্টিরাজি তার কাছে মাথানত করে। তিনি 'হও' বলা মাত্রই সকল কিছু হয়ে যায়। হে প্রভু! আমরা কেবলমাত্র তোমারই ইবাদত করি। কেবল তোমার কাছেই আমাদের ফিরে যেতে হবে। তোমার উর্ধ্বে আর কেউ নেই। তোমার সার্বভৌমত্বে কারো অংশীদারী নেই। তুমি আমাদের সকলকে তোমার পথে অটল রেখে জান্নাতের সুমহান নে'আমতের অধিকারী হওয়ার তাওফীক দান কর। আমীন!!

সৌন্দর্যের লীলাভূমি সিলেটে তিনদিন

মুকাররম বিন মুহসিন

প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর সিলেট ভ্রমণের ইচ্ছা ছিল বহুদিন থেকে। কিন্তু সময়-সুযোগের অভাবে তা যেন হয়ে উঠছিল না। হঠাৎ করেই আমাদের প্রিয় মারকায 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী', নওদাপাড়া থেকে বাৎসরিক শিক্ষা সফরের স্থান নির্ধারণ করা হল সেই কাঙ্খিত স্বপ্নভূমি সিলেট। এ সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া না করে সফরের প্রস্তুতি শুরু করলাম।

যাত্রা : ৯ই ফেব্রুয়ারী'১০ মঙ্গলবার দিবাগত রাত ১০ টায় আমাদের গাড়ি মাদরাসা প্রাঙ্গণ থেকে রওনা দেয়। যাত্রার পূর্ব মুহূর্তে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব এক সংক্ষিপ্ত বৈঠকে ছাত্র-শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে উপদেশ ও পরামর্শমূলক বক্তব্য রাখেন। সফর পরিচালনায় ছিলেন মারকাযের সম্মানিত স্যার জনাব শামসুল আলম। তার সহযোগিতায় ছিলেন মারকায শিক্ষক শফীকুল ইসলাম এবং ইমামুদ্দীন। খাবার ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে মোযাম্মেল ও শের আলী ভাইসহ সর্বমোট প্রায় ৭০ জন যাত্রী নিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু হল। মাঘের তীব্র শীত তখন প্রায় যাই যাই করছে। বসন্তের আমেজ শুরু হতে যাচ্ছে প্রকৃতিতে। চমৎকার আবহাওয়া, ঘুম, ভ্রমণের আনন্দ সবকিছু মিলিয়ে এক উপভোগ্য রাত্রি কাটিয়ে নরসংদীর কাছাকাছি এক এলাকায় সকালের নাশতা সেরে নিলাম। মাঝে গাজীপুরে ফজরের ছালাত আদায় করে নিয়েছিলাম। আবার যাত্রা শুরু হল। প্রকৃতির অসাধারণ সৌন্দর্যে গা এলিয়ে সিলেটের পথে দীর্ঘ যাত্রা অব্যাহত থাকল। মাইকে বেজে চলেছে আমীরে জামাআতের বক্তৃতা, কখনো আল-হেরার উজ্জীবনী সুর। উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে সিলেটের মাটিতে যখন পা দিলাম তখন দিনমণি মধ্যগগণে প্রায় পৌঁছে গেছে। শিডিউল টাইমের অনেক পরে পৌছানোয় শহরে অপেক্ষা না করে রওয়ানা হলাম দেশের পূর্বাঞ্চলীয় একমাত্র সীমান্ত বর্ডার তামাবিলের পার্শ্ববর্তী অপরূপ সৌন্দর্যের লীলাভূমি জাফলং-এর উদ্দেশ্যে। দু'ঘন্টাবাদেই সীমান্তপারের অধরা কৃষ্ণকায় বিশাল পাহাড়কে ছোঁয়ার প্রতিযোগিতা করতে করতে পৌছে গেলাম গন্তব্যপানে। মেঘের কোলে পাহাড়ী শয্যাকে পাশে রেখে নিঃশব্দে অপরিমেয় সম্পদ নিয়ে বহমান সুরমা নদীর কাঁচ সদৃশ স্বচ্ছ টলটলে সুনীল জলধারার মনোমুগ্ধকর কলরোল নিমিষেই যেন প্রাণবায়ু স্থির করে দিল। সামনে যেন কল্পনার জগৎ কত সৌন্দর্যপিয়াসীর বিস্ময়-বিমুগ্ধ দৃষ্টি, কত কবির হৃদয়হারী অভিব্যক্তি, যুগ যুগ ধরে বয়ে চলেছ হে স্রোতস্বীনী! কত সুন্দরই না তোমার সেই মহান স্রষ্ঠা যার হাতের ছোয়া কি অপরূপ সাজে সাজিয়েছেন তোমাকে! সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম। নীচে নেমে আসলাম নদীর কূলে। লোভ সামলাতে না পেরে আমাদের অনেকেই গা ভাসিয়ে দিয়েছে শীতল অগভীর নদীর বুকে। নদীর স্থানে স্থানে অবাক করা দৃশ্য। স্বল্প জায়গায় কত লোক, কত ক্রেন, কত ট্রাক, কত নৌকা, কত পানির পাম্প কাজে লাগানো হচ্ছে তার যেন ইয়ত্তা নেই। বড়জোর ১০০ বর্গগজের মধ্যে কাজ করছে প্রায় শতাধিক শ্রমিক। অল্প পানি ও বালির মধ্য থেকে তারা প্রতিনিয়ত পাথর উত্তোলন করছে। কেউ নিচ থেকে উঠাচ্ছে, কেউ বহন করছে, ট্রাক ভর্তি করছে, কেউ পানির পাম্পের কাছে আছে। মাছ শিকারের মত নৌকা থেকে জাল ফেলে পাথরও যেন শিকার করা হচ্ছে। সেখান থেকে নৌকায় চড়ে সীমান্তের কাছাকাছি গেলাম। পাথরের স্তূপ পাড়ি দিয়ে বর্ডার ক্যাম্পের নিকটবর্তী হলাম। পরবর্তী ধাপ ফেললেই ভারত। দু'পাশে দুদেশের প্রহরা ক্যাম্প। ভারতেই নদীটির উৎপত্তি স্থল। ভারত অংশের চমৎকার দৃশ্য আমাদেরকে মুগ্ধ করল। দুই পাহাড়ের মাঝ দিয়ে নদী বয়ে গেছে। আর একটি ঝুলন্ত ব্রীজ পাহাড়দ্বয়কে সংযুক্ত করেছে। পানি বেশী স্বচ্ছ হওয়ার কারণে পানির ৫/৭ ফুট নিচের সবকিছু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। হাটু পানিতে পাথরের উপরে কিছুক্ষণ হাটাহাটি করতেই পানির শীতলতা আমাদের স্থান ত্যাগে বাধ্য করল। স্থানীয়দের সাথে আলাপচারিতায় জানা গেল যে, বর্ষাকাল ছাড়া সারা বছর এখানে পাথর আহরণ চলে। নদীর তলদেশ খুড়ে পাথর উঠান হয় বলে বড় বড় গর্তে নদী এলাকা সম্পূর্ণ এবড়ো থেবড়ো হয়ে যায়। অতঃপর বর্ষাকালে পাহাড়ী ঢল আসায় বন্যার সৃষ্টি হয় এবং সমস্ত গর্ত পুণরায় পাথরে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। তারপর আল্লাহ্র অসীম কুদরতে সেগুলোর আকার বৃদ্ধি পেতে থাকে। বর্ষাকাল শেষ হওয়ার পর নদীর পানি যখন শুকিয়ে আসতে শুরু করে তখন বড় বড় পাথর নদীর তলদেশ খুড়ে তোলা হয়। সেখান থেকেই দেখলাম সীমানা ঘেঁষে যাওয়া ইন্ডিয়ার বিশাল পাহাড়গুলো এবং পাহাড়ী গ্রামসমূহ। সেখানে একটি ঝুলন্ত পাথর রয়েছে। প্রকাণ্ড এই পাথরটি পাহাড়ের উপর বিপরীত দিকে এমনভাবে হেলে আছে যেন এখনি নিচে পড়ে যাবে। ঝুলন্ত পাহাড় নামকরণ এজন্যই। অতঃপর পাশ্ববর্তী পাথর ভাঙা কারখানাগুলি পরিদর্শন শেষে বিকাল পাঁচটার দিকে আমরা ফিরে আসলাম আমাদের রান্নার আয়োজনস্থলে। ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত অবস্থায় শের আলী ও মোযাম্মেল ভাইয়ের সুস্বাদু রান্না গোগ্রাসে খেয়ে নিলাম। এবার ফিরতি যাত্রা। পার্শ্ববর্তী তামাবিল জিরো পয়েন্টের উদ্দেশ্য রওনা হলাম। এ এলাকায় শুধু কয়লা আর কয়লা যার সবই ভারত থেকে আমদানীকৃত। সেখানে পৌঁছে বিডিআর ক্যাম্পে জওয়ানদের সাথে দেখা হল উভয় সিমান্তে বিডিআর-বিএসএফ এর সতর্ক প্রহরা। সেখানে জওয়ানদের সাথে কথা বলে আমাদের বেশ ভাল লাগল। দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় তাদের দৃঢ় মানসিকতায় খুব উৎসাহবোধ করলাম। আমাদের রাত্রি যাপনের জন্য ব্যবস্থা ছিল জৈন্তাপুর থানার আহলেহাদীছ অধ্যুষিত গ্রাম সেনগ্রামে। মেইন রোড ছেড়ে সাবওয়ে ধরে যেতে যেতে গ্রামে পৌছানোর ২ কি.মি. পূর্বে একটি বরই গাছের ডালে আটকে গেল আমাদের বাসটি। তাই অনেকটা রাস্তা আমাদের হাঁটতে হল। যাইহোক স্থানীয় দাখিল মাদরাসায় আমাদের থাকার ব্যবস্থা হল। সেখানে পৌঁছে মাদরাসা

সুপার জনাব ফয়যুল ইসলামসহ অন্যান্য শিক্ষক-ছাত্র-কর্মচারীদের গভীর আন্তরিকতা ও ভালবাসা আমাদেরকে মুগ্ধ করল। অচেনা-অপরিচিত মানুষগুলো আমাদেরকে এভাবে গ্রহণ করবেন তা আমরা ভাবিনি। যাইহোক খাওয়া-দাওয়া, ছালাত আদায়ের পর সারাদিনের ক্লান্তিতে আমরা গভীর ঘুমে হারিয়ে গেলাম।

পরদিন ভোরে সেনগ্রাম মাদরাসা ও স্কুলের সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি জনাব শফিকুল ইসলাম মাষ্টার আমাদের আগমনের খবর শুনে ছুটে আসেন এবং কুশল বিনিময় করেন। গতরাতে আটকে পড়া গাড়ির খবর শুনে তিনি নিজে উপস্থিত থেকে গাছটি কাটিয়ে গাড়িটি মাদরাসা প্রাঙ্গনে আনার ব্যবস্থা করেন।

দেশের অন্য প্রান্তের শেষ সীমানায় যেখানে তাওহীদ-সুন্নাতের অনুসারীর সংখ্যা অতি বিরল সেখানে একটি আহলেহাদীছ গ্রাম পেয়ে আমরা অভিভূত হয়েছিলাম। যে সিলেটকে শিরক-বিদ'আতের আড্ডাখানা হিসাবেই জানি তারই এক প্রান্তে তাওহীদ ও সুন্নাতের জীবন্ত স্বাক্ষর হয়ে গ্রামটি আজও তার অস্তিত্বের জানান দিচ্ছে, এ দৃশ্য আমাদের হৃদয়মনে পরিতৃপ্তির সুবাতাস বইয়ে দিচ্ছিল। সর্বোপরি তাদের আলাপচারিতা, মেহমানদারী ইত্যাদিতে আমরা এত আনন্দ ও স্বস্তি পেয়েছিলাম যে, তার প্রশংসায় কিছু বলতে চেয়েও মুখ ফুটে কিছু বের করতে পারিনি। আজকে এই কলমের আঁচড়ে তাদেরকে গভীরভাবে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি ও তাদের জন্য আন্তরিক প্রার্থনা করছি- আল্লাহ তাদের উত্তম প্রতিদান দিন এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাদেরকে হেদায়েতের পথে টিকিয়ে রাখুন। আমীন! সেখানে গিয়ে বুঝতে পারলাম, তাওহীদের ডাক তথা কুরআন-সুন্নাহর আহ্বান কত সুমধুর। হাবলুল্লাহর পতাকাতলে একত্রিত হওয়ার মাহাত্ম্য টের পেলাম আরো একবার।

হরিপুর গ্যাসফিল্ড : সকাল ৮ টা নাগাদ আমরা হরিপুর গ্যাসফিল্ডের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে পথিমধ্যে জৈন্তাপুরের হীরা বিবির রাজবাড়ীতে যাত্রাবিরতি করলাম। সেখান থেকে আরো ১৫/২০ মিনিটের পথ অতিক্রম করে পৌঁছলাম হরিপুর গ্যাসফিল্ড এলাকায়। বিশাল এলাকা, চারিদিকে পাহাড়-টিলা, গাছ-পালা, সবুজে ঘেরা বৈচিত্র্যময় এলাকা হরিপুর। মাটির নিচ গ্যাসে পরিপূর্ণ হওয়ায় চারিদিকে গ্যাসের আলামত। একটি পাহাড় দেখলাম যার স্থানে স্থানে গ্যাসীয় আগুন ধিকি ধিকি জ্বলছে। কিছুদূর এগিয়ে যেতেই প্রায় ১ বিঘা আয়তনের একটি ছোট পুকুর দেখলাম, যার মধ্য থেকে অবিরাম ধারায় বুদ বুদ করে গ্যাস উত্থিত হচ্ছে। পানির উপর গ্যাস ফেনার মত হয়ে আছে। যার উপর জ্বলন্ত ম্যাচের কাঠি নিক্ষেপ করলে আগুন জ্বলে উঠছে। লোকমুখে জানলাম, এই পুকুরটার কোন তলা খুঁজে পাওয়া যায় না যদিও অস্বাভাবিক কিছু নজরে পড়ল না। তবে পুকুরে কোন জীবনের অস্তিত্ব নেই। ইতিপূর্বে গ্যাস উঠানো হত এমন একটি জায়গায় দেখলাম অল্প অল্প আগুন বের হচ্ছে। যা প্রায় ৭ বছর থেকে জ্বলছে। আমাদের মধ্যে যারা ইতিপূর্বে সিলেট এসেছে কিন্তু হরিপুর দেখেনি, তাদের কাছে এটাই ছিল সিলেট সফরের স্বার্থকতা। জৈন্তাপুর মাদরাসার সুপার জনাব ফয়যুল ইসলাম এ সময় আমাদের সাথে উপস্থিত থেকে পুরো এলাকা ঘুরিয়ে দেখান।

সিলেট শহর : গ্যাসক্ষেত্র দেখে আমরা রওনা দিলাম সিলেট শহরের দিকে। প্রথমেই গেলাম শাহজালাল (রহ.)-এর ভাগ্নে শাহপরাণ (রহ.)-এর মাযার দর্শনে। সেখানে পূর্ব থেকেই আমাদের অপেক্ষায় ছিলেন সিলেটের তাসলীম ভাই ও সজীব ভাই। যেলা 'আন্দোলনে'র সাবেক সভাপতি জনাব আব্দুস সবুর ভাই কোন কাজে ঢাকা অবস্থান করায় এই দু'ভাইকে আমাদেরকে ঘুরিয়ে দেখানোর জন্য সাথী করে দেন। মাযারে গিয়ে দেখলাম আজব দৃশ্য। প্রায় ৩৫ ফুট মত উঁচু জায়গায় তাঁর কবর। সেখানে মানুষ সিজদা করছে, ছালাত আদায় করছে, দোয়ার মাধ্যমে তাদের কামনা-বাসনা প্রকাশ করছে, সন্তান চাচ্ছে ইত্যাদি আরো কত কি! একদল মানুষ দান করার জন্য সবাইকে অবিরাম আহ্বান করে চলেছে। কবরের ঘেরার মধ্যে লাখ লাখ টাকার ছড়াছড়ি, মোমবাতি, আগর বাতির স্তূপ দেখে বিস্মিত হলাম। সাথে সাথে খাদেমদের আয়ের কথা চিন্তা করে হতবাক হলাম। অসীলা পূজার মাধ্যমে সৌভাগ্য কামনায় মানুষের গভীর আন্তরিকতা দেখে জাহেলী যুগের মুশরিকদের অবস্থার কথা স্মরণ হল। ফিরে আসার সময় দেখলাম মানুষ কবরের সম্মানার্থে নামার সময় উল্টো হয়ে নামছে। কুসংস্কারচ্ছন্ন মানুষগুলির প্রতি বড়ই আফসোস হল আর নিজেকেও বড় ব্যর্থ মনে হ'ল এই ভেবে যে, আমরা হয়তো আমাদের দাওয়াতী দায়িত্ব কিছুই পালন করছি না।

এরপর আমাদের পরবর্তী গন্তব্য শাহজালাল (রহ.)-এর মাযারের দিকে অগ্রসর হলাম। দুই মাযারের মাঝে দূরত্ব ৩/৪ কি.মি.। সেখানে আমাদের অপেক্ষায় ছিলেন বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের সাবেক কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক আবু তাহের ভাই ও হাম্মাদ ভাই। মাযারের বিশাল প্রাঙ্গনে প্রবেশ করে একটু ভিমরী খেলাম। আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা, ধনী-গরীব নির্বিশেষে কত কিসিমের মানুষের ভীড়। একপাশে উঁচু মিনার বিশিষ্ট মসজিদ। প্রাঙ্গনের প্রান্তে রয়েছে জালালী কবুতরদের বাসা, আরেকপাশে গজার মাছের পুকুর, টাকা-পয়সা, নযর-মানত প্রদানের স্থান। আরো রয়েছে জমজম কূপে সাথে সংযুক্ত বলে কথিত একটি পুকুর (নাউযুবিল্লাহ)। মূল মাযারে ঢুকে দেখলাম এলাহী কারবার। বিশাল এলাকা জুড়ে মূল কবরটি, একপাশে পীর সাহেবের উদ্দেশ্যে ছালাত আদায়ের স্থান, আরেকপাশে কুরআন পড়ার স্থান। একদল মানুষ কুরআন তেলাওয়াত করছে। কবরের প্রাচীরের পাশেই কয়েকজন অর্থ-কড়ি, নযর-নেওয়াজ প্রদানের জন্য সকলকে নির্দেশনা দিচ্ছে। আর কবরের চারপাশ ঘিরে বড় একদল মানুষ চরম আন্তরিকতা ও আধ্যাত্মিকতার সাথে পীর সাহেবের উদ্দেশ্যে নীচু স্বরে ক্রন্দনের সাথে অশ্রু বিসর্জন দিয়ে নিজের চাওয়া-পাওয়ার কথা জানাচ্ছে। মাযারের পাশেই বিশাল কবরস্থান। বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ কিছু ব্যক্তির কবর এখানে রয়েছে। বর্তমানে যে কোন ব্যক্তিই ৫ লক্ষ টাকা দিয়ে নিজের কবরের স্থানটি এখানে ক্রয় করতে পারে। আফসোস! এই সম্মানিত ব্যক্তিরা হয়ত কোনদিনই তাঁদের অনুসারীদের এসব করতে বলে যাননি। কিন্তু তাঁদের মৃত্যুর পর মুরীদদের বাড়াবাড়ি রকম ভক্তি তাঁদেরকে যেমন আক্ষরিক অর্থেই পূজনীয় আসনে বসিয়েছে, তেমনি সিলেটের মাটিকে পুণ্যভূমির নামে অপুণ্যভূমি আর শিরকী আড্ডাখানা বানিয়ে ছেড়েছে। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে হাযারো মানুষ এখানে আসছে প্রতিনিয়ত এবং ফিরে যাচ্ছে মুশরিকের খাতায় নিজের নাম লিখিয়ে। যে মানুষটি

এসেছিলেন এ অঞ্চলের মানুষকে খাঁটি তাওহীদপন্থী বানাতে, আজ তাঁর মাযারে এসে মানুষ ফিরে যাচ্ছে তাওহীদবিরোধী জাহেল মুশরিক গোমরাহ হয়ে (হাদানাল্লাহ ইয়্যানা ওয়া ইয়্যাহুম.. আমীন!)।

দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে মাযার থেকে বের হয়ে একটি রেস্তোঁরায় দুপুরের খাবার খেয়ে শহরের ড্রীমল্যান্ড পার্ক পরিদর্শনে গেলাম। তবে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর সিলেটে সম্পূর্ণ কৃত্রিম এই পার্কটি আমাদের ভ্রমণ অনুভূতির সাথে ছিল বেমানান। যাইহোক সেখানে কিছু সময় কাটিয়ে আমাদের সঙ্গী সিলেটি ভাইদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার ফিরে এলাম একদিনেই মমতা লেগে যাওয়া সেই সেনগ্রামে। খাওয়া-দাওয়া, ছালাত শেষে গভীর নিদ্রায় রাত্রি অতিক্রান্ত হল। উল্লেখ্য, সিলেট শহরে তাবলীগী ইজতেমা ২০১০ এর পোষ্টার বিভিন্ন জায়গায় লাগিয়ে দিয়েছিলাম।

পরদিন সকালে বিদায়ের পালা। বিদায়ের আগে এখানে একটি সাংগঠনিক প্রোগ্রাম করার কথা ছিল। কিন্তু আমাদের ক্লান্তি ও সময়ের স্বল্পতায় তা আর হয়ে উঠল না। মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষক সহ গ্রামবাসীকে তাবলীগী ইজতেমা-২০১০ এর দাওয়াত দিয়ে সকলের কাছে বিদায় নিয়ে বিশেষত: জনাব শফিকুল ইসলাম মাষ্টারের সাথে তাঁর বাড়িতে সৌজন্য সাক্ষাৎ করে আমরা পরবর্তী গন্তব্য শ্রীমঙ্গলে অবস্থিত দেশের একমাত্র জলপ্রপাতের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম।

মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত : মাধবকুণ্ডের মূল আকর্ষণ জলপ্রপাত। সেখানে যাওয়ার পথটির সৌন্দর্যও ভোলার নয়। পথিমধ্যে আমাদের একজন গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ায় আমরা শঙ্কিত হলেও আল্লাহর ইচ্ছায় সে দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠল। মূল ঝর্ণা থেকে ৫০০ মিটার দূরে মূল ফটক। অনেক মানুষের আনাগোনা। সকলের হৃদয়ে জলপ্রপাত দেখার আকাংখা। যাইহোক সকলের সাথে আমরাও বিপুল কৌতূহলে পদব্রজে সারি সারি পাহাড়ের মাঝ দিয়ে অগ্রগামী হতে থাকলাম। অবশেষে তার দেখা মিলল। ইন্ডিয়ার পাথারিয়া পাহাড়ে উৎপন্ন জলপ্রপাতটি প্রায় ২০০ ফুট উচ্চতা থেকে অবিরল ধারায় পতিত হচ্ছে। যতদূর সম্ভব নিকটবর্তী হয়ে তার সৌন্দর্য উপভোগ করলাম। এবার উঁচু পাহাড়ের যে স্থান থেকে অবিরাম জলধারা পতিত হচ্ছে তার উৎস দর্শনের পালা। অনেক পরিশ্রমসাধ্য রোমাঞ্চকর পথ পাড়ি দিয়ে প্রায় খাড়া পাহাড়টির উপর আরোহণ করার সময় নিজেদের পর্বত অভিযাত্রী মনে হচ্ছিল। উপরে উঠে একেবারে ঝর্ণাধারা নেমে যাওয়ার স্থানে উপস্থিত হলাম। অজানা স্থান থেকে পাথুরের আঁকাবাঁকা নালা বেয়ে পানির ধারা বয়ে এসে আছড়ে নেমে পড়ছে ২০০ ফুট নীচে । নিচের দর্শনার্থীদের দেখা যাচ্ছে পিপীলিকার মত। এত উপর থেকে নীচের অসাধারণ ল্যান্ডমার্কের দৃশ্য আমাদেরকে যেন মেঘের জগতে নিয়ে গেল। ভাষায় বোঝানো কঠিন কি অপরূপ সে সৌন্দর্য। আল্লাহু আকবর! বার বার মনে পড়ছিল আল্লাহর বাণী 'তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ কিভাবে আল্লাহ সৃষ্টিকর্ম আরম্ভ করেছেন'। সেখানে হাযারো মানুষের ভীড়। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসেছে আল্লাহ্র সৃষ্টিকর্ম উপভোগ করার জন্য। আমাদের ৬৫ জন ছাত্রের সবচেয়ে কম বয়সী ছেলেটিকেও বাঁধা দেওয়া যায়নি এত উপরে উঠতে, এমনকি সেই অসুস্থ ছেলেটাকেও। সন্দিহান ছিলাম শামসুল স্যারকে নিয়ে। কিছুক্ষণ বাদে উনাকেও উপরে দেখে সবাই হৈ চৈ করে উঠল। আল্লাহ্র অপরূপ সৃষ্টিকে দেখার জন্য কোন বাধাই যেন কেউ মানতে চাচ্ছে না, কেউই এ থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখতে চাচ্ছে না। ঘণ্টা দুই সেখানে অবস্থানের পর আমরা আবার বাসে ফিরে এলাম।

শ্রীমঙ্গল : মাধবকুণ্ড থেকে রওনা দিলাম শ্রীমঙ্গলের দিকে। কুলাউড়া হয়ে আমরা শ্রীমঙ্গলে পৌঁছলাম বিকাল ৪ টার সময়। দুপুরের খাবার বাকি। তারপরেও যেন কারো ক্ষুধা নেই। চারদিকে অনিন্দ্য সুন্দর নয়নজুড়ানো থরে থরে সুসজ্জিত চা বাগানে মোড়া বিস্তীর্ণ টিলাভূমি সকলকে উদ্বেলিত করে তুলেছে। যতদূর চোখ যায় শুধুই চায়ের বাগান। বিভিন্ন কোম্পানী হাযার হাযার হেক্টর এলাকা জুড়ে চা বাগান করেছে। দেশের রপ্তানী আয়ের বড় অংশ আসে এই চা থেকে। এছাড়া ছোট ছোট পাহাড় ও সংলগ্ন প্রান্তরে অবস্থিত সারি সারি রাবার বাগান, আনারস বাগান, লেবু বাগান হৃদয়ের গভীরে যে ভালোলাগার অনুভূতি এনে দিল তা যেন ভুলবার নয়। মাইলের পর মাইল জনমানবশুন্য বিস্তৃত বাগান। দেখলাম রাবার গাছ থেকে কিভাবে আঠা সংগ্রহ করা হচ্ছে। অনেক বড় বাগান অথচ রাবার গাছগুলোতে একটি পাতাও নেই। সেসব বাগানে শেষ বিকেলের রক্তিম আলোর মিষ্টি ছটায় আমেরিকার আরিজোনার ল্যান্ডস্কেপগুলোর ছবি যেন মূর্ত হয়ে উঠল। বেশ কয়েকটি চা বাগানে ঢুকে আমরা প্রদক্ষিণ করলাম। শ্রীমঙ্গলের আরেকটি অভিজ্ঞতা হল- সাত রঙের চা পান। এককাপ চা-এ ৭ টি ভিন্ন ভিন্ন রঙের স্তর। আরো মজার ব্যাপার হল প্রতিটি রং এর স্বাদ ভিন্ন ভিন্ন। খুব সুস্বাদু না হলেও চিত্তাকর্ষক। মূল্য ৭০ টাকা। সেখানকার মাত্র একজন ব্যক্তিই এ চায়ের আবিষ্কারক ও কারিগর। পর্যটক মহলে এ চায়ের বেশ সমাদর রয়েছে।

মাগরিব ছালাত আদায়ের পর আমাদের রান্নাস্থলে ফিরে এসে দেখি রান্না শেষ। ক্ষুধার্ত অবস্থায় প্রবল আগ্রহের সাথে দুপুর ও রাতের খাবার গ্রহণ করলাম। রাত ৮ টায় রাজশাহীর উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। সফরে অংশগ্রহণকারী সকলের মাঝে বিতরণ করা হল মারকাযের নামাঙ্কিত বাৎসরিক ক্যালেন্ডার এবং কলম। আয়োজন করা হয়েছিল সাধারণ জ্ঞান ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা। ছিল আকর্ষণীয় সব পুরস্কারের ব্যবস্থা। সবশেষে ৩ দিনের সুখস্মৃতি চারণ করতে করতে ১৩ ফেব্রুয়ারী ফজরের আযানের ঠিক ১০ মিনিট পূর্বে মারকায প্রাঙ্গনে ফিরে আসলাম। ফালিল্লাহিল হামদ। যেন ক্লান্ত ভ্রমণ শেষে পাখির নীড়ে ফেরা। বাংলার রূপকে আরো একবার নিবিড়ভাবে দেখার সুযোগ ঘটল আমাদের ৩ দিনের স্মরণীয় এ সফরের মাধ্যমে। এজন্য আল্লাহ্র দরবারে জানাই শুকরিয়া। সাথে সাথে এ শিক্ষা সফর বাস্তবায়নে যারা শ্রম দিয়েছেন এবং বিশেষত সিলেটি ভাইরা যারা আমাদের সার্বিক সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি আন্তরিক মোবারকবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

বাংলা অভিধানের কথা

রায়হানুল ইসলাম

ইংরেজী Dictionary শব্দের অর্থ 'শব্দভাণ্ডার', আর 'অভিধান' শব্দের অর্থ শব্দার্থ। কিন্তু Dictionary বা অভিধান বর্তমানে ব্যাপক অর্থ বহন করে। পাঠক নানা প্রয়োজনে এ জাতীয় গ্রন্থের দ্বারস্থ হয়। অভিধানে শব্দের বানান, অর্থ, উচ্চারণ, প্রতিশব্দ, পরিভাষা, প্রতিবর্ণ ও ব্যাকরণবিষয়ক নির্দেশ থাকে। একটি শব্দ বাক্যের মধ্যে কত অর্থে প্রযুক্ত হতে পারে, অভিধান থেকে তাও জানা যায়। সেখানে শব্দের উৎস ও ব্যুৎপত্তিনির্দেশও পাওয়া যায়। অনেক সময় অভিধান সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষের দায়িত্ব পালন করে। তাই জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুষঙ্গে জড়িত অনেক শব্দের সংজ্ঞা অভিধানে লিপিবদ্ধ থাকে। প্রায় অভিধানেই পরিশিষ্ট থাকে, ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োজনীয় বহু খুঁটিনাটি তথ্য সেখানে সংকলিত হয়, যা অনেক সময় গাইড-বুকের কাজ করে।

বাংলা মূলত দক্ষিণ এশীয় ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা। পর্তুগিজ ধর্মযাজক মানোএল দ্য আসসুম্পসাঁউ (Manoel da Assumpcam) সর্বপ্রথম বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেন। তিনি তখন ঢাকা অঞ্চলে ধর্ম প্রচারের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। সুতরাং বাংলা অভিধানের ঐতিহ্য খুব দীর্ঘকালের নয়। দ্বিভাষিক অভিধান দিয়ে এর সূচনা। ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে পর্তুগালের লিসবন শহর থেকে রোমান হরফে মুদ্রিত তাঁর লেখা Vocabolario em idioma Bengalla, e Portuguez dividido em duas Partes শীর্ষক গ্রন্থটির প্রথমার্ধে রয়েছে একটি সংক্ষিপ্ত, খণ্ডিত ও অপরিকল্পিত বাংলা ব্যাকরণ। এর দ্বিতীয়াংশে রয়েছে বাংলা-পর্তুগিজ ও পর্তুগিজ-বাংলা শব্দাভিধান। মানোএল ভাওয়ালের একটি গির্জায় ধর্মযাজকের দায়িত্ব পালনের সময় নিজের ও ভবিষ্যত ধর্মযাজকদের প্রয়োজনে এই ব্যাকরণ রচনা করেন; বাংলা ভাষার বিকাশ ঘটানো তাঁর লক্ষ্য ছিল না। লাতিন ভাষার ধাঁচে লেখা এই ব্যাকরণটিতে শুধু রূপতত্ত্ব ও বাক্যতত্ত্ব আলোচিত হয়েছে, কিন্তু ধ্বনিতত্ত্ব নিয়ে কোনো আলোচনা করা হয়নি। এছাড়া পুরো আঠারো ও উনিশ শতকে লোকচক্ষুর আড়ালে থাকায় এই গ্রন্থটি বাঙালী ও বাংলা ভাষার কোন উপকারেও আসেনি তখন। এর পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ৬০২।

বাংলা ভাষার দ্বিতীয় ব্যাকরণটি রচনা করেন ইংরেজ প্রাচ্যবিদ ন্যাথানিয়েল ব্র্যাসি হ্যালহেড (Nathaniel Brassey Halhed) । ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গভর্ণর ওয়ারেন হেস্টিংসের (Warren Hastings) অনুরোধে তরুণ লেখক হ্যালহেড বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনায় হাত দেন। তাঁর লেখা A Grammar of the Bengal Language গ্রন্থটি ১৭৭৮ সালে প্রকাশিত হয়। এ ব্যাকরণটি অনেক কারণে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পূর্বের পর্তুগিজ ধর্মযাজকদের মতো নিজ প্রয়োজনে নয়, নিঃস্বার্থ বুদ্ধিজীবী হ্যালহেডের ইচ্ছা ছিল বাংলা ভাষাকে একটি বিকশিত ভাষাতে পরিণত করা।

বাংলা হরফে মুদ্রিত ও কলকাতা থেকে প্রকশিত প্রথম বাংলা অভিধানের নাম 'ইঙ্গরাজি ও বাঙ্গালি বোকেবিলোরি' (১৭৯৩); পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪৪৫। বাংলা ভাষায় প্রথম সুবৃহৎ অভিধান রচনার কৃতিত্ব হেনরি পিটস ফরস্টারের। ১৭৯৯ সাল থেকে ১৮০২ সালের মধ্যে তিনি দুই খণ্ডে ৮৪৪ পৃষ্ঠার বাঙ্গালা-ইঙ্গরেজী অভিধান প্রকাশ করেন, যাতে ২০,০০০ বাংলা শব্দের ইংরেজী অর্থ স্থান পায়। এরপর প্রকাশিত আরও কয়েকটি দ্বিভাষিক বাংলা অভিধান হচ্ছে : A Vocabulary :Bengali and English (মোহনপ্রসাদ ঠাকুর, কলকাতা, ১৮০৫), A Dictionary of Bengalee Language (উইলিয়াম কেরী, কলকাতা, ১৮১৫), Dictionary in English and Bengali (জন মেন্ডিস, শ্রীরামপুর, ১৮২২), A Dictionary in Bengalee and English (তারাচাঁদ চক্রবর্তী, কলকাতা, ১৮২৭), দ্বিভাষার্থকাভিধান (উইলিয়াম মর্টন, কলকাতা, ১৮২৮), A Vocabulary : English and Bengalee (জে ডি পিয়ার্সন, কলকাতা, ১৮২৯), A Dictionary :Bengali and sanskrit (জি সি হটন, কলকাতা, ১৮৩৩) এবং A Dictionary in English and Bengalee (রামকমল সেন, কলকাতা, ১৮৩৪)।

বাংলা ভাষায় মুদ্রিত প্রথম সম্পূর্ণ বাংলা-বাংলা অভিধান হচ্ছে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের বঙ্গভাষাভিধান। এটি প্রকাশিত হয় ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে কলকাতা থেকে। এরপর প্রকাশিত আরও কয়েকটি একভাষিক বাংলা অভিধান হচ্ছে : বঙ্গভাষাভিধান (রামেশ্বর তর্কালঙ্কার, কলকাতা, ১৮৩৯), শব্দাম্বুধি (মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ, কলকাতা, ১৮৫৩), প্রকৃতিবাদ অভিধান (রামকমল বিদ্যালঙ্কার, কলকাতা, ১৮৬৬), সরল বাঙ্গালা অভিধান (সুবল মিত্র, কলকাতা, ১৯০৬), বাঙ্গালা ভাষার অভিধান (জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, কলকাতা, ১৯১৭), চলন্তিকা (রাজশেখর বসু, কলকাতা, ১৯৩০), বঙ্গীয় শব্দকোষ (হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৯৩২), ব্যবহারিক শব্দকোষ (কাজী আব্দুল ওদুদ, কলকাতা, ১৯৫৩), সংসদ বাঙ্গালা অভিধান (শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, কলকাতা, ১৯৫৫) ইত্যাদি।

১৯৫৫ সালে ঢাকায় বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠার পর বাংলা অভিধানের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। প্রতিষ্ঠার পরবর্তী ত্রিশ বছরে বাংলা একাডেমী প্রায় ৬০ খানা অভিধানজাতীয় গ্রন্থ প্রকাশ করে। এ প্রতিষ্ঠানের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান (১৯৬৫), ব্যবহারিক বাংলা অভিধান (১৯৭৪), ছোটদের অভিধান (১৯৮৩), চরিতাভিধান (১৯৮৫), উচ্চারণ অভিধান (১৯৮৯), সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান (১৯৯২), সমকালীন বাংলা ভাষার অভিধান (১৯৯৩), ইংলিশ-বেঙ্গলি ডিকশনারি (১৯৯৩), বেঙ্গলি-ইংলিশ ডিকশনারি (১৯৯৪), বানান অভিধান (১৯৯৪), সহজ বাংলা অভিধান (১৯৯৫), লেখক অভিধান (১৯৯৮) প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

The Thief And The Three Homes

An Important Excerpt from Ibnul Qayyim's Book `Wabilu Sayyib'

Indeed the servant is able to strengthen his (during it) if he is successful in overcoming his desires and cravings. However if his heart has been conquered, his desires have taken him captive, and the Shaytan is able to find a place within it, then how can this individual escape the whispers and thoughts (that disturb him during prayer)!

Verily the hearts are of three types:

1. The heart which is void of Eeman and all types of good, this is the dark heart. The Shaytan no longer needs to confront this heart with whispers because he now dwells in it. He decrees what he wishes in it and has taken complete control of it

2. The heart which has been illuminated with the light of Eeman. Faith has kindled its lanterns within it, but at the same time there is still present some darkness of desires and winds of disobedience. The Shaytan approaches and retreats from this category of hearts, and at times he takes advantage of opportunities. The war (in this heart) is sometimes severe and at other times calm. The affair of the individuals who fall into this category of hearts varies between many and few. Some possessors of this category are usually victorious over their enemy, while others regularly allow their enemy to get the upper hand. A third group are those who have equal moments of defeat and victory.

3. The heart which is filled with faith. This heart is illuminated with the light of Eeman and the veil of desires and darkness has been lifted from it. The light of Eeman is glowing within the chest and that glow contains flames. If desires attempt to approach the heart they are burned by the flames (of Eeman). This heart is protected similar to the protection of the sky by the stars. If the Shaytan attempts to advance toward the sky to steal (information) he is flogged with a star and he burns. The sky is not more precious than the believer and Allah's protection of the believer is greater than His protection of the sky. The sky is a place of worship for the Angels, it is also the place of revelation (The Quran was brought to the last sky and then revealed to The Prophet (sallallaahu alayhi wasallam) piece by piece), and in it (the sky) are the rays of obedience. But the heart of the believer is the place of Tawheed, love (of Allah, the Prophet ýMay the peace and blessings of Allah be upon him-, Islam, etc...), understanding and faith. In it are the rays of the previously mentioned elements, and therefore it is befitting that it is protected from the plots of the enemy. As a result of this, he (the enemy) can not obtain anything from it (the heart of the believer) except by deceitfully seizing it.

A good example of this has been made with the example of 3 homes:

1. The home of the king: In it are his treasures and precious jewels and belongings.

2. The home of the slave: In it is his wealth and precious jewels and belongings, but indeed his belongings are much less (in value and quantity) than that of the king's.

3. The empty home: There is nothing present in it. A thief approaches with the intention of stealing from one of the homes, which one would he burglarize?

If you say that he would rob the empty home, this is something impossible because the empty home possess nothing for him to steal. Based on this (reality), it was mentioned to Ibn Abbass (May Allah be pleased with him): Verily the Jews claim that they do not experience whispers (distractions) in prayer. Ibn Abbass thereupon commented: "What would the Shaytan do to a heart that is already destroyed"

If you said that he would steal from the home of the king, this would also be impossible due to the strong presence of guards, consequently the thief can not approach this home. How could he, while the king himself is protecting his own home! How could he come close while this home is surrounded and guarded by an army!

Consequently there is nothing left for the thief except the third home. This is the home the thief attempts to approach.

It is incumbent for the intelligent individual to reflect upon this example with true reflection and contemplation, and apply this example to the hearts for indeed it is applicable.

Vocabulary : শব্দার্থ

শব্দ	বাংলা অর্থ	আরবী অর্থ
Excerpt	কোন গ্রন্থের অংশবিশেষ	المقتبس، المقتطف
Remembrance	স্মৃতি, স্মরণ	ذكري ، تذكار
concentration	পূর্ণ মনোযোগ, কেন্দ্রীকরণ	كثافة، تركيز
focus	কেন্দ্রবিন্দু, নিবদ্ধ করা	بؤرة، يركز
overcome	পরাভূত করা, দমন করা	يفوز، يتغلب علي
desire	কামনা, ইচ্ছা, আকাঙ্খা করা	رغبة، يرغب في
crave	ব্যাকুলভাবে কামনা করা, ব্যাগ্রতা	توقي شديد
conquer	দখল করা, পরাজিত করা	ينتصر، يغزو
captive	বন্দী	أسير، مقيد
escape	পালিয়ে যাওয়া, মুক্তি পাওয়া, পলায়ন	يفر، ينجو، نجاة
whisper	ফিসফিস করে বলা	يهمس، همس
void	শূন্য, রিক্ত, বর্জিত, বাতিল করা	فارغ، خالي،باطل يفرغ، فجوة
confront	মুখোমুখি হওয়া, পরস্পর বিপরীত হওয়া	يتحدي، يواجه، يقابل، يقارن
dwell	বাস করা	يقيم، يكمن
decree	হুকুম, অধ্যাদেশ, রায় দেয়া	حكم قضائي، يقضي ب
illuminate	আলোকিত বা উদ্ভাসিত করা	يضئ، يوضح
kindle	আগুন ধরানো, উদ্দীপ্ত করা বা হওয়া	يشعل، يثير
lantern	লণ্ঠন	الفانوس، برج صغير، منارة
approach	নিকটবর্তী হওয়া, নিকটে আগমন, দ্বারস্থ হওয়া	يقترب، يقرب، طريقة لفهم الموضوع
retreat	পশ্চাদপসারণ করা, প্রত্যাহার করা, কথার বরখেলাপ করা	يسحب، يتراجع، يرتد
calm	স্থির, শান্ত, নিস্তরঙ্গ	هدوء، هادئ، يهدئ
possessor	মালিক, স্বত্ত্বাধিকারী	المالك، المتملك
veil	অবগুণ্ঠন, নেকাব, যবনিকা, ঢাকা বা গোপন করা	خمار، يحجب، يستر
lift	তোলা, উঁচু করা, উত্তোলন	ارتفاع، يرفع
glow	উজ্জ্বলতা বিকিরণ করা, আরক্ত হওয়া, রক্তিমাভা	اتقاد، يتوقد
chest	সিন্দুক, বক্ষদেশ, বুক	صدر، وعاء
flame	অগ্নিশিখা, জ্বলে ওঠা	لهب، يتوهج
flog	প্রহার করা, বৃথা চেষ্টা করা, ঠেঙানি, কশাঘাত	يدفع، ينتقد
steal	চুরি বা অপহরণ করা	سرقة، يسرق
worship	পূজা, উপাসনা করা, ভক্তি প্রকাশ করা	عبادة ، يعبد
revelation	প্রকাশ, গুপ্ত তথ্য ফাঁস	وحي، إظهار
ray	রশ্মি , কিরণ, আশার ক্ষীণ রেখা	شعاء، يشع
element	উপাদান, অংশ	عنصر، جزء
befit	মানানসই বা যথাযথ হওয়া	يلائم
plot	নকশা, মানচিত্র, ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত করা	خريطة، مؤامرة
seize	জব্দ করা, গ্রেফতার করা	يعتقل، يستولي علي
deceit	কপটতা, ছলনা, প্রতারণা	خداع، كذبة
treasure	সম্পদ, গুপ্তধন, সঞ্চয় করা	كنز، يدخر
quantity	পরিমাণ, আয়তন, ওজন, সংখ্যা	كمية، مقدار
intention	অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য, সংকল্প	مفهوم، عزم، هدف
burglarize	সিঁধ কেটে চুরী করা, চুরি করা	يسطو علي المنازل
rob	বলপূর্বক সম্পত্তি হরণ করা, ডাকাতি	يسرق، غصب، اختطاف
empty	শূন্য, খালি	فارغ، باطل، يفرغ
destroy	ধবংস/নষ্ট/বিধ্বস্ত করা	يهدم، يدمر
consequently	ফলস্বরূপ, ফলত:	بناء علي ذلك
protect	নিরাপদ বা সুরক্ষিত করা, বাঁচানো	يحمي، ينجى
surround	বেষ্টন করা, পরিবৃত করা	يطوق، طوق
incumbent	দায়িত্ব, অবশ্য কর্তব্য, পদাধিকারী	صاحب منصب، إلزامي
contemplation	গভীর চিন্তা, পরিকল্পনা, প্রত্যাশা	تأمل، توقع
applicable	প্রয়োগযোগ্য, প্রযোজ্য, যথার্থ	ملائم، قابل للتطبيق

আলোকপাত

???? *বর্তমানে ফিলিস্তীন, আফগানিস্তান, ইরাকসহ বিশ্বের নানা দেশে মুসলমানরা কাফিরদের হাতে নির্যাতিত-নিপীড়িত হচ্ছে। দূর থেকে আমরা তাদের দুর্দশায় শোকাকুল হয়ে পড়ি, কিন্তু করণীয় খুঁজে পাই না। তাদের প্রতি আমাদের কোন কর্তব্য আছে কি? তাদের সাহায্য করার জন্য আমরা কী করতে পারি?*

-রায়হানুল ইসলাম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

একজন মুসলিমের জন্য তার অপর বিপদগ্রস্থ মুসলিম ভাইয়ের প্রতি হক হল তাকে সম্ভব্য সকল উপায়ে সাহায্য করা। উল্লিখিত দেশগুলোতে মুসলমানদের উপর যে নির্যাতন নেমে এসেছে তাতে তাদেরকে সর্বোচ্চ সামর্থ্য দিয়ে সহযোগিতা করা বিশ্বের সকল মুসলমানদের জন্য ঈমানী কর্তব্য। দূরবর্তী স্থান থেকে সহযোগিতার সম্ভব্য কিছু উপায় হল- ১. প্রথমতঃ ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ সম্পর্কে সচেতন হওয়া, যা পরস্পরের মাঝে ভালবাসার অটুট বন্ধন গড়ে তোলে। কেননা এ বোধ না থাকলে সহযোগিতার গুরুত্ব উপলব্ধি ও সেমতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ কোন কিছুই সম্ভব নয়। ২. অর্থনৈতিকভাবে সাহায্যের জন্য প্রচেষ্টা নেয়া। ৩. বক্তব্য-বিবৃতি, পত্র-পত্রিকায় লেখনী প্রভৃতির মাধ্যমে সকল মুসলমানদেরকে তাদের অবস্থা সম্পর্কে জানানো এবং বিশেষ বিশেষ লোকদের কাছে তাদের সমস্যাগুলো তুলে ধরা ও তাদেরকে সেসব দেশে অর্থ পাঠানোর জন্য উৎসাহিত করা। ৪. সর্বোপরি ধৈর্য্য সহকারে আল্লাহ্র কাছে রাত্রির গভীরে, দিনের প্রন্তসমূহে তাদের জন্য খাছভাবে দো'আ করা। মনে রাখতে হবে দো'আ মু'মিনের জন্য সার্বক্ষণিক অস্ত্র। বিশেষতঃ বিপদ-আপদ ও বিপর্যয়ের সময়। আল্লাহ খালিছ অন্তরে কৃত দো'আকে কবুল করেন বলে অঙ্গীকার করেছেন। তাঁর অঙ্গীকার মিথ্যা নয়। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের প্রভু বলেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব' *(মু'মিন ৬০)*। আল্লাহ আরো বলেন, 'বল কে নিঃসহায়ের ডাকে সাড়া দেন যখন সে ডাকে এবং কষ্ট দূরীভূত করেন, আর তোমাদেরকে পৃথিবীতে পূর্ববর্তীদের স্থলাভিষিক্ত করেন। আছে কি আল্লাহ্র সাথে আর কোন উপাস্য? তোমরা অতি সামান্যই স্মরণ কর' *(নামল ৬২)*।

???? *আমি আল্লাহ্র কাছে সবসময় আমার পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি। কিন্তু আমার মনে হয় আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করবেন না। আমাকে কখনই পাপের পথ থেকে ফিরাবেন না। বিশেষ করে যখন একই পাপ বার বার করি। আমি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কি করতে পারি? কিভাবে বুঝব আল্লাহ আমার তওবা কবুল করেছেন?*

- হিযবুল্লাহ, সাতক্ষীরা।

আল্লাহ ক্ষমা করবেন না- এ ধারণা শয়তানের কুমন্ত্রণা, যেন মানুষ তাওবা-ইস্তিগফার থেকে নিরাশ হয়ে পড়ে এবং পাপের সাগরে ডুবে থাকে। কোন অবস্থাতেই আপনি তাওবা-ইস্তিগফার পরিত্যাগ করবেন না। জেনে রাখুন, যদি বান্দার অনুশোচনা, তাওবা সত্যিকার অর্থে হয়ে থাকে তবে অপরাধ যত বড়ই হোক না কেন আল্লাহ তা ক্ষমা করে দিতে পারেন। আপনার তাওবা আল্লাহর কাছে কবুল হয়েছে কি না তা বুঝবেন যখন নিজের মধ্যে তাওবা-ইস্তিগফারের অনুভূতি ও সৎআমল আগের চেয়ে বেশী মাত্রায় পাবেন। আল্লাহ যখন আপনার তাওবা কবুল করবেন তখন আপনাকে পাপ থেকে প্রত্যাবর্তনের পথ সহজ করে দেবেন। আর তখনই শয়তানের
কুমন্ত্রণার হাত থেকে রক্ষা পাবেন। আর আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা যত বৃদ্ধি পাবে শয়তানের ওয়াসওসাহ থেকে ততই দ্রুত মুক্তি লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ!

???? *লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে কি একই জিনিস নয়? কোন পরিকল্পনা গ্রহণে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পৃথকভাবে ব্যক্ত করার কারণ কি?*

-আরব আলী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রতিটি বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত একটি আদি ও মৌলিক অনুষঙ্গ। এ দু'টো সমার্থক শব্দ নয়। একই ধারার হলেও উভয়টির মাঝে সূক্ষ্ম পার্থক্য বিদ্যমান। লক্ষ্য বলতে বুঝায় সেই পথকে যার মাধ্যমে আমরা উদ্দেশ্য পূরণ করি। যেমন পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করা, কোন কাজে সফল হওয়া এটা আমাদের লক্ষ্য থাকে। কিন্তু কেন? এর পিছনে কোন মৌলিক লক্ষ্য নিশ্চয়ই আছে। সেটাই হল উদ্দেশ্য। অর্থাৎ উদ্দেশ্য হল একটি সর্বোচ্চ বিষয় যা মানুষ আকাংখা করে। আর লক্ষ্য হল সাময়িক কোন চাহিদা যা মানুষ পেতে ইচ্ছুক হয়। প্রতিটি মানুষের জীবনে কিছু লক্ষ্য থাকে তবে উদ্দেশ্য সবার থাকে না।

বিশেষজ্ঞরা বলেন, উদ্দেশ্য হল ক্রমস্তর বিশিষ্ট একটি উচ্চতম বিমূর্ত অবস্থানের নাম যা অর্জনের জন্য বিশেষ যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হয় এবং মানুষ মর্যাদা ও শ্রদ্ধার সাথে তা আকাংখা করে। নিষ্ঠাবান প্রচেষ্টার মাধ্যমে উদ্দেশ্য পুরণের কাছাকাছি হওয়া যায় তবে পুরোপুরি তা অর্জন সম্ভব নয়। আর লক্ষ্য হল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও পরিমাপযোগ্য বিষয় যা পুরোপুরি অর্জন করা সম্ভব। অর্থাৎ সেটা এমন একটি কামনা যা সামর্থের মধ্যে থাকা অবস্থায় নির্ধারিত ও প্রয়োজনীয় সময়ের মধ্যেই বাস্তবায়ন করা যায়।

সুতরাং উদ্দেশ্য হল মানুষের কর্মস্পৃহার অনুঘটক। এটি এমন একটি গুরুত্ববহ ও উচ্চতম দৃষ্টিভঙ্গি যাকে আশ্রয় করে মানুষ কোন বিশেষ লক্ষ্য নির্ধারণ করে এবং তা অর্জনে সচেষ্ট হয়।

পশ্চিমী চিন্তাধারার সাথে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পার্থক্য হল উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে। পাশ্চাত্যের কাছে সময়নির্ধারিত, পরিকল্পনা মাফিক লক্ষ্য অর্জন যেখানে মূখ্য, ইসলাম সেখানে প্রাধান্য দেয় উদ্দেশ্যের সততা ও বিশুদ্ধতার দিকে। ইসলামে মানুষের সমস্ত কর্মকাণ্ডের একমাত্র উদ্দেশ্য হল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি। আর পাশ্চাত্য চিন্তাধারায় আত্মতুষ্টিই (Indivisualism) প্রধান উদ্দেশ্য।

???? *আমি আপন কর্মস্থলে যথাসম্ভব খুলুছিয়াতের সাথে কাজ করি। কিন্তু সহকর্মীরা আমার প্রতি সন্তুষ্ট নয়, যদিও আমার কর্মতৎপরতাকে তারা স্বীকার করে। আমি জানি না আমার কাজে তার অসন্তুষ্ট না আমার আচরণে। ফলে সবসময় আমাকে একটা গুমোট পরিবেশে বসবাস করতে হচ্ছে। এমতবস্থায় মানসিক দ্বিধা-সংকট কাটিয়ে উঠা ও তাদের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার জন্য আমার করণীয় কি?*

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

আপনার উপলব্ধি দেখে বোঝা যায় আপনি সমস্যাটি বোঝার চেষ্টা করেছেন। মূলতঃ এ সময় সমস্যাটি চিহ্নিত করাই বেশী যরূরী। নিজ থেকেই যদি সমস্যাটি ধরতে পারেন তাহলে নিজেই সহকর্মীদের সাথে আলাপচারিতার মধ্য দিয়ে যত দ্রুত সম্ভব মিটিয়ে নিন। যদি সমস্যাটি হয় আচরণগত তাহলে নিজেকে শুধরে নেওয়ার জন্য সাধ্যমত প্রচেষ্টা নিন। সহকর্মীরা যা যা অপছন্দ করে তা থেকে দূরে থাকুন (যদি তা পাপ না হয়)। দৃষ্টিভঙ্গি সবসময় ইতিবাচক রাখার চেষ্টা করুন। ইনশাআল্লাহ আল্লাহ্র সাহায্যে আপনার কর্মস্থল আপনার জন্য প্রশান্তিময় হয়ে আসবে। তারপরও যদি সমস্যা থেকে যায় তবে আল্লাহ্র উপর সবকিছু ছেড়ে দিন। মনে রাখবেন মানুষের প্রশংসা বা নিন্দা যেন আপনার খুলুছিয়াতকে নষ্ট করে না ফেলে। কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই অন্তর অবনত থাকলে একজন প্রকৃত মু'মিন সর্ববস্থায় আপন মর্যাদায় সমুন্নত থাকে যদিও মানুষ তাকে নিন্দা-অপমান করে। প্রশংসাকারীর প্রশংসায় যেমন সে বিগলিত হয় না, নিন্দুকের নিন্দায়ও সে তেমন ভেঙ্গে পড়ে না। কেননা সে তো যা করে আল্লাহর জন্যই করে; মানুষের জন্য নয়।

জীবনের বাঁকে বাঁকে

ঢাকার রাজপথে

-শামসুল আলম

সারাদিন ভীষণ কর্মব্যস্ততায় অতিবাহিত হল ঢাকার উচ্চ আদালত পাড়ায়। অনেকগুলো মামলা পরিচালনার দায়িত্ব ঘাড়ে। মাথায় চিন্তার জট নিয়ে শত শত মানুষের সাথে বেরিয়ে যাচ্ছি। ভাবছি হাযারো দুর্নীতি-অনিয়মে ভরা বেহাল হাইকোর্ট নিয়ে। কত মানুষ প্রতিদিন সকালে ন্যায়বিচারের একবুক আশা নিয়ে এখানে ঢোকে। আবার দিন শেষে হতাশার মেঘ নিয়ে বের হয়। আবার বুক বাঁধে নতুন আশায়। এভাবেই তো গড়িয়ে গেল বিগত পাঁচটি বছর। বিকাল প্রায় পাঁচটা বাজে। মনের মেঘের সাথে যোগ হয়েছে আকাশের কালো মেঘের ঘনঘটা। বিজলীর শব্দে প্রকম্পিত আকাশ। পড়ন্ত বেলায় শীতের কনকনানি, বাতাসের ঝনঝনানি আর ছিটেফাঁটা বৃষ্টিতে মনটা তেতো হয়ে গেল। প্রধান ফটকের সামনে এসে কোন দিকে যাব এক দণ্ড ভাবি। মনটা ভাল না। মনে হ'ল একটু বেরিয়ে আসি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এস. এম হলে শ্যালক ঢাবি যুবসংঘ সেক্রেটারী আব্দুর রাকীবের সাথে দেখা হয় না অনেকদিন। রিক্সায় উঠলাম। জিজ্ঞাসা করি রিক্সাওয়ালাকে কোন দিক দিয়ে যাবে। রিক্সাওয়ালা সহসা জবাব দেয়, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পাশ দিয়ে। রিক্সা বেশ দ্রুতগতিতে চলছে। গুড়িগুড়ি বৃষ্টির মাঝে পর্দার আড়ালে বসে বেশ ওম ওম লাগছে। ভাবুক দৃষ্টি নিয়ে আনমনে দেখে যাই ব্যস্ত রাজপথ। মেডিকেলের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎই দৃষ্টি আটকে যায়। কত মানুষই না কষ্ট পাচ্ছে এই ভবনের মাঝে। জাহান্নামের কিছুটা নমুনা দেখা বা শাস্তি উপলব্ধির জন্য এই এক মেডিকেলই যথেষ্ট। বার্ণ ইউনিট নামটি দেখে আতংকিত হয়ে ওঠে হৃদয়। মনে পড়ে যায় কয়েকবছর পূর্বে বড় ভাবীর অগ্নি ঝলসানো দেহের করুণ আর্তনাদ। দু'ফোটা অশ্রুবিন্দুতে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে। প্রধান গেট পার হতেই হঠাৎ দৃষ্টি যায় একটা ডাস্টবিনের দিকে। ভালভাবে তাকিয়ে বুঝতে পারি একজন মধ্য বয়সী মানুষ ভাঙ্গা ডাস্টবিনের মাঝে ময়লার স্তূপের মাঝে মাথা ঝুঁকিয়ে বসা। সামান্য নড়াচড়ায় বোঝা যায় প্রাণসম্পন্ন দেহ ওটা। খাবার অথবা আরো কিছুর খোঁজে হয়তবা এসেছিল। আর নড়তে পারেনি। পক্ষাঘাতগ্রস্থের মত শক্তিহীন, জীর্ণ শরীরের এই আদম সন্তানের চোখে বোবা দৃষ্টি। ফ্যালফ্যাল চোখে কখনওবা মাথা ঠুকরাচ্ছে। আশাহীন জীবন নিয়ে, বীভৎস ঐ দেহ নিয়ে সে যেন প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। হয়ত এ রাতটি তার পার হবে না। হয়ত কুকুর শিয়ালই তাকে ছিঁড়ে-কুটে খেয়ে ফেলবে। তখন বাধাদানের মত তার হয়ত সামান্য শক্তিও থাকবে না।

পাশ দিয়ে হেঁটে চলেছে হাযার হাযার মানুষ। কারও দৃষ্টি নেই। হয়তবা মাদকসেবী মনে করে চরম অবহেলায় এড়িয়ে যাচ্ছে তাকে। আহা তারপরও তো মানব সন্তান। আর দশটা মানুষের মত ওর জীবনটাও আল্লাহ্‌রই সৃষ্টি। এক পলকে এই দৃশ্য দেখে আর যেন থেমে থাকতে পারি না। কিন্তু কি করব ভেবে কুলিয়ে উঠতে পারি না। রিক্সা থামিয়ে ওর পাশে যাব? ওকে কিছু সাহায্য করব? ভাবতে ভাবতে রিক্সাটি লাগামহীন ঘোড়ার মত ছুটে পালায়। এই বৃষ্টিতে নেমে একাকী কিইবা করতে পারতাম। পার্শ্বেই মেডিকেলে যেখানে হাযারও মানুষের চিকিৎসা হচ্ছে সেখানে কি ভর্তি করাতে পারতাম? নাহ! আর ভাবতে পারি না। অবশেষে আর দশটা মানুষের মত আফসোসের হাতেই আত্মসমর্পণ করলাম। অপরাধবোধে মাথাটা নুয়ে এল। জানি না মানুষ হয়ে মুসলমান হিসাবে মহান আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমার যোগ্য হব কি-না।

তবে একথা সত্য যে, মুসাফির হিসাবে আমি আল্লাহ্‌র নিকটে ক্ষমাপ্রার্থী হতে পারি। কিন্তু মানবতার নিরীখে ঐ মানুষটিকে করুণ মৃত্যু দশা থেকে উদ্ধার করা অথবা দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষকে জানানোর কোন সুযোগ কি কারো নেই? কোন আড়ালে অগোচরে নয়, একেবারে জনসম্মুখে অসহায় বনু আদম পড়ে থাকবে আর মানুষ চেয়ে চেয়ে দেখবে এ কি হতে পারে? স্বাধীন দেশ, স্বাধীন সরকার আর সভ্য দেশে মানবাধিকারের জন্য কত দল, কত পন্থী রাজপথ সরগরম করছে প্রতিদিন। অথচ অসহায় ঐসব মানুষের মুক্তি ও কল্যাণের জন্য কারো কি কিছুই করার নেই? কেউ কি নেই এসব চিকিৎসাহীন বনু আদমের সাহায্যের জন্য হাত প্রসারিত করার? মানবাধিকারের শ্লোগান নিয়ে বিভিন্ন সংগঠনকে যখন রাজপথ কাঁপিয়ে তুলতে দেখি, তখন ঐসব বুভুক্ষ অনাহারক্লিষ্ট বনী আদমের মুখ সামনে ভেসে ওঠে। এক অব্যক্ত মন:পীড়ায় মনের রাজ্যে গভীর অন্ধকার নেমে আসে।

নানাজীর কথকতা ও পীর প্রসঙ্গ

-শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ সেলিম

যাঁর সঙ্গে আমার সখ্যতা না থাকলেও আন্তরিকতা আছে, যিনি আত্মীয়তার সম্পর্কে সম্পর্কিত না হলেও আঞ্চলিকতার ঐক্যে গ্রথিত, এমনই একজন ব্যক্তি কেরামত নানা। মৌলভীগিরির সুনামের পাশাপাশি চুল ছাঁটায়ও তাঁর বেশ কেরামতি আছে। ধারেপাশেই দোকানের জিনিসের মত তাঁকে সব সময় হাতে পাওয়া যায়। তাছাড়া শৈশবে উনার কাছে 'কায়দা সিপারা' পড়েছি ও ধর্মশিক্ষার জন্য গিয়েছি। তাই উনি যে একাধারে হৃদ্যতার যোগানদার ও দাবীদার তা অস্বীকার করলে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হবে বৈকি।

পীর সাহেবের মুরিদ আমার সেই নানার সঙ্গে রাজশাহীস্থ আলিয়াবাড়ী গ্রামের খাটিয়ামারি দরগাহ থেকে সিন্নি খেয়ে উদরাময় নিয়ে বাড়ী ফিরছি। সান্তাহার স্টেশন। নামার সময় আমার পিছনে নানাজী। প্রচণ্ড ভীড়। আমি নেমে প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছি। ট্রেনের সীটে বা নামার লাইনে থাকার সময় আমার ও উনার মধ্যস্থানের দূরত্ব যত ছিল তার চাইতে 'আমার নামা' ও 'উনার নামা'র মধ্যবর্তী সময়ের দূরত্বটা একটু

বেশী হতেই চলল। ভাবলাম বয়সের ভার - দেহ ভারী; তাই বুঝি অলিম্পিকের মত এই শক্ত প্রতিযোগিতায় খুব একটা সুবিধা করে উঠতে পারছেন না।

প্রচণ্ড ভীড়। বস্তা বোঝাই বস্তুর মত চেপে ধরা মানুষের নিঃশ্বাস নিঃসৃত কার্বনডাই অক্সাইডের চাপে যে দম বন্ধ হয়ে অক্কা পেতে হয়নি সে সৌভাগ্যের কথা স্মরণ করে 'আল-হামদুলিল্লাহ' পাঠ করছি।

ট্রেন থেকে নামার সে অভিযানে নেমে কেরামত নানার হাল হাকীকত যে কেশরঞ্জন বাবুর পরিপাটি কেশের মত সাবলীল নাই এমন ধারণা পোষণ করাই বাঞ্চনীয় হবে। তাই মাটিতে এক পা ফেলে আর এক পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উনিও নেমে আমার গা -এর সঙ্গে গা ঠেকাতে পারলেন না কেন এই চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠিনি।

বয়স বেশী হলেও কেরামত নানার চেহারা মোবারক কিন্তু একেবারে মানচিত্রের মত অসংখ্য দাগ ও ভাঁজে কুঞ্চিত হয়নি। তাই আর যা-ই হোক উনাকে থুত্থুড়ে বলা যায় না কিছুতেই। কারণ ইতিপূর্বে উনাকে বহুবার খাসীর মত ছুটাছুটি করা ভুষণ্ডির কাক-এর মত বগলদাবা করে ওরস মোবারকের মহতী ময়দানে হাজির করতে দেখা গেছে।

নানাজী ট্রেন থেকে নামলেন। টুপীটা নেড়ে পাঞ্জাবীটা ঝেড়ে হঠাৎ কি মনে করে এতক্ষণ মধ্যাকর্ষণ শক্তির অনুকূলে ধরে থাকা হাতের ছাতাটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে আকাশের দিকে তাক করে বললেন, 'আমার টাকা'? সওয়াল করে জওয়াব পেলাম উনি নামার চেষ্টা করার সময় বগলে কাতুকুতু ও বিব্রত বোধ করেন। বুঝতে দেরী হল না সুসংঘবদ্ধ পকেটমারদের কেউ তাঁর বগলে মনোহারী কাতুকুতু দিয়ে মনটা ভুলিয়ে রেখেছে। আর অন্যরা পকেটের দফা রফা করে ছেড়েছে। নানাজী থানায় ডায়রী করলেন। কিন্তু তাঁর ওয়ারেন্ট জড়পদার্থ ডায়রীতে নিস্প্রাণ হয়ে নিঃশব্দে রয়ে গেল। অদ্যাবধি কোন ফল হয় নাই।

স্টেশন ত্যাগ করে রিক্সায় চলতে চলতে আমি বললাম 'নানাজী! আগে আমাদের বাড়ীতে না হয় চলেন।' তাই বলে সে আমন্ত্রণ জনৈক বন্ধুর 'ঈদের দিনে আসলে এসো' নিমন্ত্রণের মত ছিল না কিন্তু। অন্তর থেকেই উচ্চারণ করেছিলাম। কিন্তু তালগোল পাকিয়ে যাওয়া অবস্থায় পড়ার ফলে বিনয়মিশ্রিত কথাটিও বেকায়দায় বিশ্রী হয়ে বেরিয়ে এলো। ওনার উত্তর অশ্রাব্য গালির মত চপেটাঘাত হেনে আমার কানে ঢুকল। তা হল- 'বাড়ী বাড়ী গোল্লা দেওয়ার সুখবর আছে নাকি? তাই আগে হাসিমুখে অন্যের বাসায় ঢুকব?'

কিম্ভূতকিমাকার পরিস্থিতির প্যাঁচে পড়ে কেরামত নানার দয়ার শরীর যে এখন রাগের শরীরে পরিণত হয়েছে- ভয়ে ভয়ে ভেবে নিয়ে ভদ্র ছেলের মত চুপ হয়ে গেলাম। বন্ধমুখে দু'চোখে দেখলাম, রিক্সার চাকা উনার বাড়ীর দিকেই যাচ্ছে।

বাড়ীর গেটে পৌঁছার পর টাকা চুরি হওয়ার অপমানে শোকে-দুঃখে-ক্ষোভে-লজ্জায় লাল আর বেগুনের মত বাঁকা হওয়া নানাজীর শরীরের দিকে তাকিয়ে খালাম্মা যেন একটু আঁৎকে উঠে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি খবর আব্বা?' আঁৎকে উঠায় তার ছোট করতে চাওয়া গলার স্বরটি বড় হয়ে যায়। নানাজীর কৃতিত্বের বিবরণ শুনে অবলা কিন্তু মানসিক দিক দিয়ে সবলা নারী বললেন, 'বাবা! যা হবার হয়েছে। চোখ মুখ ধুয়ে ভাত খেয়ে নাও। আল্লাহ যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন'।

কেরামত নানার চোরের উপরে থাকা এতক্ষণের রাগ মেয়ের উপরে ঝেড়ে বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখতেই তো পাচ্ছি। ঠিকই বলেছ। আল্লাহ আমার মঙ্গল করে দুনিয়া পুলকিত করে ফেললেন। এতগুলো টাকা যে হারিয়ে গেল তা আমার মঙ্গল হওয়ার আলামত তাই না?'

নানার রাগ তো ধরারই কথা। কারণ ইতিপূর্বে উনি এক শীতে আজমীরপথে গিয়ে চাদর, কাঁথা, বালিশ ও শীতের কাপড়-চোপড় হারিয়ে কাঁপতে কাঁপতে বাড়ী ফিরে এসেছেন। হয়তো জীবনে কোনদিন খেলার জগতে নেমে ফুটবলে পা ঠেকাননি কিন্তু হারানো দিনগুলোর তল্পী-তল্পা হারাবার জগতে উনার বার বার বিজয়ই হয়েছে। কেন যে হয়? উনি তো এত বিজয় চাননি। সেদিন পথিমধ্যে ট্রেনের কামরায় দেখেছিলাম এক মহিলা মুড়ি রাখার টিনের মধ্যে তাঁর অসংখ্য বাচ্চা-কাচ্চার বেহিসাবী কাপড়-চোপড় গাদাগাদি করে রেখেছেন। তাঁর সুসন্তানেরা রাস্তার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বৃষ্টির মত মুষলধারে মল-মূত্র নির্গমন করে চলেছে। প্রয়োজনবশতঃ ভদ্র মহিলা টিনের মুখ খুলে কোন নির্দিষ্ট কাপড় খোঁজার চেষ্টা করছেন ও সেগুলো বাইরে নিয়ে খুলছেন। তখন দেখি কাপড়ের দল একটা একটা করে যাদুর ফিতার মত বেরিয়ে আসছে। এতদিন জানতাম মুড়ির টিনের মধ্যে মুড়িই থাকে, কিন্তু এখন দেখছি তাতে কাপড়ও স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করতে পারে।

অতীব সন্তর্পণে অতি বিনয়মিশ্রিত আওয়াজে ভদ্র মহিলাকে 'ঘটনা কি'? জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম একদিক ধরতে আর একদিক ফসকে যাওয়া ব্যাঙাচির মত বাচ্চা-কাচ্চার উৎপাতে বেসামাল হয়ে সর্বস্ব হারিয়ে দুনিয়াদারী শেষ হওয়ার ভয়ে উনি এ ব্যবস্থা করেছেন। ভাবছি হারানোর হাত থেকে রেহাই কল্পে নানাজীর জন্য অমন হাস্যকর কোন বুদ্ধি বাতলাতে হবে।

শুরুতে বলেছিলাম বোধ হয় ওরস শরীফের খানা খেয়ে পেটে ঈসা খাঁ ও মানসিংহের মল্লযুদ্ধ অনুভবের কথা। পেট খারাপ হ'ল কেন? তবে কি হাভাতের মত খুব বেশী খেয়েছি? না। 'তবারক' বা 'সিন্নী' মুরগীর খাবারের মতই ঠুকরে খাওয়ার মত অল্প খাবার। তবে পেটে মেঘের মত ডাকাডাকি হচ্ছে কার অঙ্গুলি হেলনে? আমরা সাধারণতঃ মনে করি পবিত্র মাযার শরীফের পবিত্র খাবার তবারক খেলে পুষ্টিহীন বাঙ্গালীর রোগ,গুনাহ মাফ হয়ে দেহ পরিপুষ্ট হবে। কিন্তু বাস্তব অবস্থা পরিদৃষ্টে আমার মনে হল এটা মুখে দিলে বাংলার মানুষ অনাহার জনিত কারণে অপুষ্টিতে ভুগবে না; উদরাময় জাতীয় কারণে অপুষ্টিতে মরবে। এই খাবারগুলো একবার রান্না করে ওরস শরীফ যতদিন পর্যন্ত চলে ততদিন পর্যন্ত সদ্ব্যবহার করা হয়। খাবারের মধ্যে সুগন্ধি উৎক্ষেপণকারী আগরবাতি ও নূরবিকীর্ণকারী মোমবাতি প্রবিষ্ট করানো হয়েছে হয়তো পবিত্র পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য। সেগুলো পুড়ে ছাই ও গলিত মোম ক্ষির ও পোলাও -এর সঙ্গে মসলার মত মিশে যাচ্ছে। ঐ রুচিভর্তি খাবারগুলো তুলে এনে আবার সমবেত মুরীদানদের ফূর্তি সহকারে উদরপূর্তি করানো হচ্ছে। পায়েশ, ফিরনী, ফলমিশ্রিত খিচুরীর পাত্রগুলো যেন খাবারের পাত্র নয়-মাছি বন্দর। সত্যিই

সেগুলো আর এক পার্ল হারবারে পরিণত হয়েছে। বিমানবন্দরে বিমান যেমন উঠানামা করে, খাদ্যপাত্রে মাছিও তেমন উঠানামা করছে। বিমান যেমন সোঁ সোঁ শব্দে সমগ্র বন্দর মুখরিত করে, মাছিও তেমন ভোঁ ভোঁ শব্দে সমুদয় খাবার বাজীমাত করে ছেড়েছে। সে খাবার খেলে যে কেউ কুস্তিগীর 'গামা' ফিগার লাভ করবে না; বরং তার পেটের মধ্যে কুস্তি শুরু হবে তেমন আশা করাই বিজ্ঞজনোচিত হবে।

মরহূম পীর ছাহেব যেখানে শায়িত সেখানে আর এক অদ্ভূত দৃশ্য দেখলাম। দেখতে পেলাম লোকজন দক্ষিণ দিকে মুখ করে ঢপাঢপ টিপ দিচ্ছেন। উল্টা দিকে সিজদা। আমি তো জানি বাংলাদেশে সিজদার দিক পশ্চিম। ভাবলাম সূর্য কি আজ দক্ষিণ দিকে উঠল না-কি? ধাঁধা ধরা মনে তানতারা চোখে আকাশের দিকে চেয়ে দেখি প্রকৃতির নীতি ঠিকই আছে। দুরু দুরু বক্ষে আজব দিকে সিজদা করার কারণ জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম, 'ওটা হ'ল পীর সাহেব কেবলা।' আরও পরে জানতে পারলাম 'ঐ দিকে মুখ করে মরহুম পীর সাহেব শুয়ে আছেন।' হ্যাঁ, সত্য বলছি। ঐ রকম স্থানে সূর্য্যের মতিগতি ঠিক থাকলেও সিজদার গতি অন্যরকম। যদি আমার এ কথা গ্যালিভার্স ট্রাভেল্স-এর মত কাল্পনিক মনে হয় তবে কিন্তু আপনার কাছে আমি শুধু 'কল্পনাকারী' নই 'মিথ্যুক' বিশেষণেও বিশেষিত হব। আর যদি তা-ই হয় আপনি একটু চেষ্টা করলেই ঘটনাটি নিজে চাক্ষুস দেখে চক্ষু শীতল ও বক্ষ উতলা করতে পারেন। কিন্তু যদি দেখেও দর্শিত ব্যাপারটি এড়িয়ে যান বা তেমন কিছু মনে না করেন তবে কিন্তু আপনার কাছে আমার বিশেষণটি পাল্টাবে না। আমাকে যখন lawyer এর মত lier মনে হচ্ছে ও আমার কথা অবিশ্বাস হচ্ছে তখন এ কথাটি স্মরণ করুন 'আপনার সমর্থিত জিনিস ভুল হলেও তাকে ঠিকই মনে হয়।' গ্রামে বাচ্চারা মারামারি করতে লাগলে মায়েরা এসে যদি জানতে পারেন যে নিজের ছেলে অপরাধ করেছে তবে কিন্তু তারা নিজের ছেলেকে মারেন না, বরং ছেলেকে সমর্থনের পাশাপাশি তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেন; শুধু ছেলেকে নিয়ে গযল বানাতে বাকী রাখেন মাত্র।

বান্দার মত ভক্ত মুরীদবৃন্দের ভাষ্য অনুসারে মৃত পীর সাহেবের কাছে তাঁদের এই ধর্ণা অসীলা হিসাবে তাঁকে পাবার আশায়। দীর্ঘদিন দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছেন- স্বাস্থ্য হচ্ছে না। তাই কেউ পীরের দরগায় গিয়েছেন রোগমুক্তির আশায়। বিয়ে হয়েছে দশ বছর হল তবু বাচ্চা হচ্ছে না, তাই কেউ সেখানে গিয়েছে সন্তান লাভের আশায়। কেউ গিয়েছে পরীক্ষায় ফার্স্ট ক্লাস পাবার আশায়, কেউ গিয়েছে প্রীতি বৃদ্ধির আশায়, কেউ গিয়েছে বেহেশতী সুখের আশায়, কেউ গিয়েছে স্ত্রীর হাতে ঝাঁটাপিটা খেয়ে স্ত্রীকে বশীভূতকরণের আশায়, কেউ গিয়েছে মন্ত্রীত্ব ঠিক রাখার আশায়, কেউ গিয়েছে পরকালীন মুক্তির আশায়। এমনকি হরতাল, ধর্মঘট ও বিক্ষোভের চোট সইতে না পেরে কোন কোন সময় দেশের প্রেসিডেন্টকে বিদেশ থেকে প্লেনে করে উট এনে মৃত পীরের পদপ্রান্তে দিতে দেখা যায় তাঁর শাসনদণ্ড সোজা রাখার আশায়।

কিন্তু একটু চিন্তা করলেই বুঝা যায়- এই ভুরি ভুরি আশার জগৎ অমাবশ্যার অমানিশার মতই অন্ধকার। তাঁদের অনেকের ধারণা- মরহূম পীর ছাহেব তাঁদের জন্য আল্লাহ্র কাছে সুপারিশ করবেন। আমরা জানি হাশরের ময়দানে হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) ছাড়া অপরাপর সকল নবী, খলীফা, ছাহাবা, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন, বুযর্গ, বাদশাহ ও মানুষ 'ইয়া নাফসী ইয়া নাফসী' করবেন। আখেরী নবী 'ইয়া উম্মাতী' উচ্চারণ করবেন। কাজেই আশা করি আমাদের পীর সাহেবও ইয়া নাফসী ওয়ালাদের মধ্যেই পড়বেন। পরকালে যাঁর মুখের মন্ত্র 'আমার কি হবে?' তিনি কি করে 'অন্যের ভাল করা যাবে' এই চিন্তা করবেন তা ভাবা খুব শক্ত।

একটি পারসিক গল্প আছে। মধ্যপ্রাচ্যে একজন অত্যন্ত পরাক্রমশালী যালিম শাসক ছিলেন। বল প্রয়োগ করে সম্পদ সঞ্চয়ই ছিল তাঁর নেশা। তাঁর অত্যাচারে অতীষ্ঠ হয়ে বুদ্ধি করে এক দরবেশ একদিন তাঁকে বললেন, মৃত্যুর পর তাঁর আরাম-আয়েশের উপকরণের কোন অভাব থাকবে না, শুধু একটি ত্রুটি ছাড়া। তা হল তাঁর স্বর্গের সোনার মশারীতে থাকবে শুধু একটি ছিদ্র। কিন্তু সেখানকার মশারা এত বিষাক্ত যদি একটি মশা কোনক্রমে তাঁর শরীরে একটি বার চুম্বন করতে পারে তবে তা তাঁর সমস্ত সুখ বিনাশ করে ছাড়বে। রাজা মুক্তির উপায় জিজ্ঞাসা করলে তাঁকে বলা হল, 'রাজামশাই! আপনার তো এত প্রতাপ, প্রভাব ও ধন-দৌলত, তার মধ্য থেকে আপনি শুধু একটি সূঁচ সঙ্গে নিয়ে মারা যাবেন। আর কিছু দরকার নেই'। রাজা মশাই বললেন, 'আমি কখন মরব তা কি আমি জানি'? দরবেশ বললেন, ঠিক আছে আপনি মারা গেলে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় আপনার কফিনের সঙ্গে একটি সূঁচ দিয়ে দেব। রাজা সহেব বললেন, 'মৃত্যুর পর আমি তো ওটা কাজে লাগাতে পারব না। যিনি এই পৃথিবীতে অগাধ ঐশ্বর্য, সম্মান ও প্রতিপত্তির মালিক ছিলেন মৃত্যুর পর তিনিও নিষ্ক্রিয় প্রমাণিত হলেন। পাঠক একবার ভেবে দেখুন! কীভাবে আমরা আশা করতে পারি কোন মৃত ব্যক্তি আমাদের কোন উপকার করতে পারে? এর পরেও কি আমরা আবার পোঁটলা বেঁধে মৃত পীরের আস্তানায় যাব?

লেখার কলেবর প্রকাণ্ড করতে হচ্ছে আরও একটি কথা বলে যা না বললে কিছু সত্য অপ্রকাশিত থেকে যায়। যারা সেখানে যান তাদের অধিকাংশই অত্যন্ত ভাল মনে এমনকি এমনও অনেকে আছেন যাঁরা সত্যিকারের হজ্জগামীর মত পবিত্র মন নিয়ে যান। সত্যিকারের হাজী বলার কারণ এই যে, হাজীদের মাঝে এমনও আছেন যাঁরা কিন্তু আল্লাহতে মনোযোগী কপালকে পুণ্যভূমিতে ঠেকানোর জন্য যান না; যান নিজের গরম টাকাওয়ালা হাত বিক্রেতার ভাগ্য লালকারী বিদেশী লাল হাতে ঠেকানো জন্য। হজ্জের কার্যকলাপ বাদ রেখে হাজীরা টাকা ঢালছেন আর সেখানকার জিনিসপত্র বাচ্চা কোলে নেওয়ার মত দু'হাতে জড়িয়ে ধরছেন ও ঝুড়ি ভরছেন- এই হ'ল হজ্জের আধুনিক দৃশ্য। তবে আর যা-ই হোক হাজীদের বাড়ী থেকে মক্কা রওয়ানা কিন্তু একত্ববাদের চর্চার জন্যই; কিন্তু আজমীর-মহাস্থান, বায়েজীদ বোস্তামী, সিলেট-বাগদাদ গামীদের অধিকাংশই যান কাঁধের উপর বসে থাকা কিরামান কাতেবীন-এর খাতায় 'মুশরিক' এর তালিকায় নিজের অজ্ঞাতসারে বা উদাসীনতাভরে নাম লেখানোর জন্য।

ভিনদেশের চিঠি

দুনিয়াবী জীবন অতি সংক্ষিপ্ত

-ফ্রান্সেসকা হ্যামিলটন

বিশ্বের অধিকাংশ মানুষের জীবনযাত্রা পার্থিব কর্মকাণ্ডের সাথে এমনভাবে জড়িত যেন তারা ভেবে নিয়েছে যে, তারা কখনও মৃত্যুর মুখোমুখি হবে না। ফলে ধর্মের সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও মৃত্যু বা পরকালীন জীবন সম্পর্কিত ভাবনাকে তারা সযত্নে এড়িয়ে যাচ্ছে। অথচ যে পৃথিবীর সাথে তারা এত প্রবলভাবে অন্তরঙ্গ সেই পৃথিবীর জীবন অতি সংক্ষিপ্ত ও ক্ষণস্থায়ী। এমনকি যারা দীর্ঘ জীবনপথ পাড়ি দিয়ে এসেছে তারাও নিশ্চিতভাবেই জানে যে অবধারিতভাবে তারা মৃত্যুর মুখে পতিত হতে যাচ্ছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে অনেক আয়াতে মানুষকে এ চিরন্তন সত্যের ব্যাপারে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। সূরা মু'মিনূনে এসেছে, 'তোমরা পৃথিবীতে কতদিন অবস্থান করলে বছরের গণনায়? তারা বলবে আমরা একদিন বা দিনের কিছু অংশ অবস্থান করেছি। অতএব আপনি গণনাকারীদের জিজ্ঞাসা করুন। আল্লাহ বলবেন, তোমরা তাতে অল্পদিনই অবস্থান করেছ, যদি তোমরা জানতে'! *(১১২-১১৪)*।

সূরা রূমে এসেছে 'যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন অপরাধীরা কসম খেয়ে বলবে যে, এক মুহূর্তেরও বেশী অবস্থান করিনি। এমনিভাবে (দুনিয়াতে) তারা সত্যবিমুখ হত' *(৫৫)*।

পূর্বোক্ত আয়াতের এই আলোচনা হচ্ছে এমন লোকদের মাঝে যারা কিয়ামত দিবসে হিসাব প্রদানের জন্য একত্রিত হয়েছে। তাদের আলোচনা আমাদের এটাই স্মরণ করিয়ে দেয় যে, মৃত্যুর পর মানুষ বুঝতে সক্ষম হবে যে তারা এই পৃথিবীর বুকে খুব অল্প সময়ের জন্যই অবস্থান করেছিল; আর এটা এমনই এক স্বল্প সময় যেটা পার্থিব জীবনে ষাট বা সত্তর মনে হত, অথচ সেদিন তারা তা একদিন বা তারও কম বলে অনুভব করবে। বিষয়টি অনেকটা এমন যে একজন মানুষ স্বপ্নে একদিন, একমাস বা একটি বছর পর্যন্ত কাটিয়ে আসে, অথচ ঘুম ভাঙ্গার পর সে বুঝতে পারে যে, সে স্বপ্নে কেবল কয়েকটি সেকেন্ড কাটিয়েছে। আরও উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিস্কার হবে। যেমন- প্রতিটি মানুষ নিজ জীবন সম্পর্কে কিছু পরিকল্পনা করে এবং কিছু লক্ষ্য নির্ধারণ করে। কিন্তু এই পরিকল্পনা গ্রহণ ও লক্ষ্য অর্জন প্রক্রিয়া কখনই শেষ হয় না। আপেক্ষিকভাবে একটা শেষ হলে আরেকটা এসে উপস্থিত হয়। এভাবে প্রক্রিয়াটি অব্যাহতভাবে চলতেই থাকে। সাধারণভাবে একজন ব্যক্তি হাইস্কুল সমাপ্ত করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়, অতঃপর কোন একটি চাকুরী গ্রহণ করে জীবিকা নির্বাহে সচেষ্ট হয়। এই পর্যায়গুলোর সবগুলোই কিন্তু এক একটি অস্থায়ী অভিজ্ঞতা। শৈশবে কল্পনা করতে কষ্ট হয় যে, তিরিশ বছর বয়স পর্যন্ত পৌঁছব। অথচ দেখতে দেখতেই আমরা চল্লিশের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাই। এভাবে পার্থিব জীবনের এই স্বল্পতা এতই সুস্পষ্ট যে, যে কোন ব্যক্তি তার মৃত্যুর পূর্বেই তা অনুভব করতে পারে। আল্লাহ এই অস্থায়ী জীবন সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, 'পার্থিব এ জীবন তো কেবল উপভোগের বস্তু, আর পরকাল হচ্ছে স্থায়ী বসবাসের গৃহ' *(গাফির ৩৯)*। 'নিশ্চয়ই এরা পার্থিব জীবনকে ভালবাসে এবং এক কঠিন দিবসকে পশ্চাতে ফেলে আসে' *(ইনসান ২৭)*।

(যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের জেনেটিক্যাল সাইন্সের এই ছাত্রী ২০০৫ সালে ইসলাম গ্রহণ করেছেন, ফালিল্লাহিল হামদ!)

ফিলিস্তীন থেকে বলছি

-হেবাতুল্লাহ, ফিলিস্তীন।

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। প্রিয় ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ! আপনাদের কাছে আমার একটি আবেদন। দয়া করে আমাকে হতাশ করবেন না। আমার আবেদনটি খুব সাধারণ। তবে খুব বড় একটা বিষয়ে। হে বায়তুল আকছার কল্যাণকামী উম্মত!! দয়া করে আমার এ চিঠিটি ফেলে না রেখে আপনার নিকটস্থদের নিকট পৌঁছে দিন। কেবল পাঠ করা নয়, আল-আকছা এখন আপনাদের অন্ত রখোলা দো'আর জন্য খুব বেশী মুখাপেক্ষী; যেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিকৃষ্ট দখলদারদের হাত থেকে তাঁর ঘরকে রক্ষা করেন। কয়েকদিন আগ থেকে আল-কুদসের বাজার এলাকাগুলো সরিয়ে নিয়ে ও কুদসের প্রাচীর থেকে প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী পাথরগুলো অপসারণ করে জায়নিস্টরা সেখানে সুরম্য শহর গড়ে তোলার কাজ জোরদারভাবে শুরু করে দিয়েছে। আল্লাহর কসম! সেখানকার পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে যেন কেয়ামত হয়ে গেছে। তারা সেখানে মুসলিম প্রবেশকারীদের বাধা দিচ্ছে, অথচ ইহুদীরা সদর্পে সেখানে এমনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে যেন তারা নিজ বাসস্থানে অবস্থান করছে আর শত্রুদের হাত থেকে মসজিদকে রক্ষার দায়ভার নিয়েছে। ইতিমধ্যে তারা হারাম শরীফ ও প্রাচীরের অভ্যন্তরে অবস্থানরত পরিবারগুলোকে তাদের বাড়ি থেকে বিতাড়িত করেছে এবং অবশিষ্টদের উপর এতবেশী কর ধার্য করেছে যেন তারা অচিরেই সেখান থেকে বেরিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এছাড়া আক্রমণাত্মকভাবে ভয়-ভীতি প্রদর্শন তো অব্যাহত রয়েছেই। প্রায়ই তারা নারীদের বিনিময়ে পুরুষদের আটক করে কারারুদ্ধ করছে।

অতএব হে মুসলিম পরিচয় ধারনকারী উম্মত! আমরা আপনাদের সমর সহযোগিতা চাই না, চাই না আপনাদের অর্থ সহযোগিতা, এমনকি সহমর্মিতাও। আমাদের একটাই মাত্র চাওয়া আপনাদের কাছে তা হল- রাত্রির গভীরে, প্রতি ছালাত আদায়ের পর এবং আযান ও ইক্বামতের সময় একটুখানি অন্তরখোলা দো'আ ও খালিছ নিয়তের কয়েকফোটা অশ্রুবিন্দু। আমার বিশ্বাস এতে আপনাদের খুব কষ্ট হবে না। আবারও বলছি, দয়া করে আমার চিঠির বিষয়বস্তু যেন আপনাদের না ভাবায় যে, আমাদের সহযোগিতা প্রয়োজন। আমাদের প্রয়োজন শুধুমাত্র আপনাদের দো'আ, কেবলই দো'আ, আর কিছুই নয়। হে বায়তুল আকছার প্রভু! আকছার এ পবিত্র মাটিকে অভিশপ্ত ইহুদী-নাছারাদের কবল থেকে রক্ষা কর। হে আদ ও ছামূদ কওমের ধ্বংসকারী প্রভু! তুমি এই যালিমদের সংঘবদ্ধ আক্রমণকে ধুলিস্যাৎ করে দাও। তুমি আমাদের অন্তরকে তোমার দ্বীনের সাহায্যে অবনত করে দাও। আমাদের মাঝে অনৈক্যের প্রাচীর অবলুপ্ত করে আমাদের নিয়তের খুলুছিয়াত ফিরিয়ে দাও। তোমার দ্বীনের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করার শক্তি ও ধৈর্য আমাদেরকে দান কর। ফিলিস্তীনসহ সকল দেশের মযলূম মুসলিমদেরকে তুমি রক্ষা কর। আমীন ইয়া রব্বাল আলামীন!! *(৫ মার্চ, ২০১০)*

কবিতা

আ কা শ-না বি ক

-ফররুখ আহমদ

এখানে শোনো না গোধূলি শান্ত শীষ
পেয়েছো শ্রান্ত দিনশেষে শুধু কালো রাত্রির বিষ
হালকা পালক ওড়েনা তুফানে ঝড়ে,
ক্রমাগত শুধু নুয়ে পড়ে ভেঙ্গে পড়ে,
হায় নীড়হারা ক্ষুধা মন্বন্তরে
সকল দুয়ার রুদ্ধ কোথায় ঠাঁই তার, ঠাঁই তার
এ অচেনা বন্দরে?
ফেরে না তো পাখী তার পরিচিত ঘরে
আখরোট বনে
বাদাম, খুবানি বনে।

সে কি ভুলে গেছে ঝড়ের আঘাতে তার পরিচিত ঘর!
তুফানে সে পাখী মেনেছে কী পরাজয়?
বুক-চেরা স্বর ভাসছে বাতাসে তূতীর আর্তস্বর,
আজ কি জীবনে ঘনায়েছে পরাজয়?
হে বিহঙ্গ! তুমি তো জীবনে কখনো পাওনি ডর,
কখনো তো তুমি মানো নাই পরাজয়!
সাত আকাশের সফেদ মুক্তি! কালো রাত্রির ফণা
গ্রাস ক'রল কি তুমি ছিলে যবে সুপ্ত অন্যমনা?
তবু জানি তুমি এ অপমৃত্যু ছাড়ায়ে উঠতে পারো!
তবে কেন আছো প'ড়ে?
হে বিহঙ্গ এই জিঞ্জিরে প্রবল আঘাত হানো,
সাত আকাশের বিয়াবানে ফের উদার মুক্তি আনো;
এখানে থেক না প'ড়ে।

কথা ছিল তুমি, হে পাখী! কখনো মানবে না পরাজয়,
তোমার গানের মুক্ত নিশান উড়েছে আকাশময়,
দূর আকাশের তারারা দেখছে তোমার এ পরাজয়;
তোমার পতন দেখে আজ পাখী সবে মানে বিস্ময়!

হে বিহঙ্গ! এ শুধু শ্রান্তি বুঝতে পারোনা তুমি,
ক্ষণ-বিস্মৃতি জাগায় সামনে বালিয়াড়ি মরুভূমি
দেখছো কেবল তৃষ্ণায় ভরা কালো রাত্রির বিষ-
সূর্যোদয়ের পথে দেখ নাই মিঠে পানি; ওয়েসিস।
ডুবে গেছে চাঁদ? আঁধারে যায় না দেখা?
হে পাখী! এখনো নেভেনি তোমার তারার শুভ্র রেখা,
তোমার শিরীণ ভোলেনি তো তার গান,
তোমার জোছনা হয়নি তো আজো ম্লান
আখরোট বনে
বাদাম, খুবানি বনে।

আজকে আবার সেখানে ফিরতে হবে।
পার হয়ে এই যক্ষ্মাবসাদ শ্রান্ত ব্যাধিতে ঘেরা,
পার হয়ে এই বজ্র নিপাত আকাশের বুক-চেরা
দিতে হবে ফের আঁধারের বুকে চাষ,
ভরাতে আনারকলিতে বন্ধ্যা মরুভূর অবকাশ,
আনতে নতুন বীজ যেতে হবে ফারাণের অভিযানে,
ভরাতে মাটির রুক্ষতা সেই প্রবল জোয়ার টানে।

যদিও সূর্য বন্দী এখন আঁধারের ঝরোকা'তে
পূব দিগন্তে জেগেছে আলোর গান :
সাত আকাশের যৌবন অম্লান।

তবে সুর তোলো নীল জোয়ারের আলোকিত ঝর্ণাতে।

হে পাখী তোমার এ জড়তা ঘুচে যাক,
তোমার শীর্ণ ক্লিন্নতা মুছে যাক
কালো রাত্রির সাথে-ক্ষীয়মাণ ঝরোকাতে।

আবার আতশী গান,
আবার জাগুক দিগন্ত সন্ধান,
আরক্ত আভা তোমার তূতীর কণ্ঠ রবে না ঢাকা,
আবার মেলবে রক্তিম আঙ্‌রাখা
নীল আকাশের তারার বনের স্বপ্নমুখর মনে
আখরোট বনে
বাদাম, খুবানি বনে।

সংগঠন সংবাদ

কর্মী ও সুধী সম্মেলন

দূর্গাপুর, রাজশাহী ১৭ ফেব্রুয়ারী বুধবার : অদ্য বাদ মাগরিব 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী উত্তর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক কর্মী ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা যুবসংঘের সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মুস্তাকীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক আরীফুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এলাকা আন্দোলন-এর সভাপতি জনাব এমদাদুল হক।

চণ্ডিপুর, যশোর ২১ মার্চ রবিবার : অদ্য বাদ মাগরিব 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' চণ্ডিপুর শাখার উদ্যোগে এক তাবলীগী সভার আয়োজন করা হয়। আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আধ্যাপক সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক আকবর হুসাইন, কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন, যশোর যেলা আন্দোলনের সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ বযলুর রশীদ, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল আহাদ, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক মুত্ত্বালিব বিন ঈমান প্রমুখ।

বড়গাছী, নওহাটা, রাজশাহী ২২ মার্চ সোমবার : অদ্য বাদ আছর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বড়গাছী এলাকার উদ্যোগে বড়গাছী উত্তরপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। 'আন্দোলন'-এর এলাকা সভাপতি এমদাদুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সংসদ সদস্য জনাব মেরাজুদ্দীন মোল্লা। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বড়গাছী ইউপি চেয়ারম্যান জনাব মোবারক হোসাইন। সম্মেলনে প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি শায়খ আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল আল-মাদানী। বক্তব্য রাখেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক শেখ আব্দুছ ছামাদ এবং তাবলীগ সম্পাদক আরীফুল ইসলাম।

কদমতলা, সাতক্ষীরা ২৫ মার্চ বৃহস্পতিবার : অদ্য বিকাল ৫-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সাতক্ষীরা সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে 'তাবলীগী ইজতেমা'১০' কে সফল করার লক্ষ্যে কদমতলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা যুবসংঘের সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মাদ শাহীদুয্যামান ফারূকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা যুবসংঘের সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মুযাফ্ফর রহমান, প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ লুৎফর রহমানসহ যেলা যুবসংঘের প্রায় সকল দায়িত্বশীল। সমাবেশে সাতক্ষীরা যেলার বিভিন্ন এলাকা ও শাখার দায়িত্বশীলবৃন্দ সহ বিপুল সংখ্যক কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

কর্মী প্রশিক্ষণ

জাফরনগর, যশোর, ২১ মার্চ রবিবার : অদ্য বাদ যোহর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঝিকরগাছা, জাফরনগর এলাকার উদ্যোগে জাফরনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। যেলা যুবসংঘের সভাপতি আব্দুস সালাম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যুবসংঘের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক আকবার হোসাইন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যুবসংঘের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যশোর এম এম কলেজ শাখা যুবসংঘের সভাপতি মুহাম্মাদ মনিরুযযামান শাহীন, ফতেহপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদের ইমাম মুহাম্মাদ ইয়ানুর রহমান প্রমুখ।

ছাত্র সমাবেশ

মজিদপুর, কেশবপুর, যশোর ৭ ফেব্রুয়ারী রবিবার : অদ্য বাদ আছর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' যশোর যেলার মজিদপুর শাখার উদ্যোগে এক ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মজিদপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদের ইমাম মুহাম্মাদ ইসমাঈল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ছাত্র সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুবসংঘের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক আকবর হোসাইন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা যুবসংঘের সভাপতি আব্দুস সালাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আমীনুর রহমান, দফতর সম্পাদক আব্দুল কুদ্দুস প্রমুখ। উক্ত ছাত্র সমাবেশে এসএসসি, দাখিল ও কারিগরী পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা হাদিয়া দেয়া হয়।

কৃতি ছাত্র সংবর্ধনা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে ঢাকা যেলা যুবসংঘ অফিসে কৃতি ছাত্র সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয়য়ের সভাপতি হুসাইন আল-মাহমূদ -এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যুবসংঘের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা যেলা আন্দোলনের অর্থ সম্পাদক হারূনুর রশীদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-সভাতি আহসানুর রাকীব, সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাকীব, জসীমুদ্দীন হলের সাংগঠনিক সম্পাদক আল-আমীন। কুরআন তেলাওয়াত করেন জিয়া হলের অর্থ সম্পাদক হাফেয অহিদুয্যামান এবং ইসলামী জাগরণী পেশ করেন ঢাবির অর্থ সম্পাদক মেহেদী আরীফ।

বিশেষ জ্ঞাতব্য

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর মুখপত্র 'তাওহীদের ডাক'-এ সংগঠনের কর্মতৎপরতার সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে। সেকারণ শাখা, এলাকা ও যেলা পর্যায়ের সাংগঠনিক প্রোগ্রামের রিপোর্ট লিখে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হল।

নিয়মাবলী:

১. রিপোর্ট কাগজের একপিঠে পরিস্কার হস্তাক্ষরে লিখিত অথবা টাইপকৃত হতে হবে।
২. প্রোগ্রামের তারিখ, স্থান, সময় অতিথিবৃন্দের নাম পদবী সহ লিখতে হবে।
৩. প্রোগ্রামের ধরন, আয়োজক শাখা, এলাকা ও যেলার নাম উল্লেখ করতে হবে।

আপনাদের দ্বীনী ভাই
নূরুল ইসলাম
সাংগঠনিক সম্পাদক
বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

সাম্প্রতিক মুসলিম বিশ্ব

পরিকল্পনা অনুমোদন করেছে। ১৫ বছর পূর্বে ইসরাঈলী সরকারের 'রামাত শ্লোমো' বসতি স্থাপন পরিকল্পনার ধারাবাহিকতায় এই অনুমোদনটি সম্পন্ন হল। উল্লেখ্য যে, ১৯৬৭ সালের ৬ দিনের যুদ্ধে ইসরাঈল পূর্ব জেরুজালেম দখল করে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এটার স্বীকৃতি দেয়নি এবং আলোচনার মাধ্যমে এ নগরীর মর্যাদা বজায় রাখার আহ্বান জানায়। কিন্তু ইসরাঈল সকল আপত্তি ও নিন্দা উপেক্ষা করে এ পর্যন্ত দখল বজায় রেখেছে এবং তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী সমগ্র জেরুজালেমকে রাজধানী করে ইসরাঈলী রাষ্ট্র গঠন করতে চাচ্ছে। জেরুজালেমের মেয়র নীল বারাকাত স্কাই নিউজকে বলেন, ১৬০০ বসতি নির্মাণ মূলতঃ ইহুদী-আরব সম্মিলিত ৫০,০০০ বসতি নির্মাণ পরিকল্পনার প্রথম ধাপ। আন্তর্জাতিক চাপ সত্ত্বেও আমরা নির্মাণ কাজ অব্যাহত রাখব। কেননা জেরুজালেম সার্বভৌম ইসরাঈলের অংশ। জেরুজালেম ইসরাঈলের একক একটি শহর, একে পূর্ব ও পশ্চিম বিভক্তিকরণ আমি সমর্থন করি না। আমাদের পরিকল্পনায় এই শহরে ইহুদী অধিবাসীদের প্রতিনিধিত্ব থাকবে দুই-তৃতীয়াংশ এবং আরব প্রতিনিধিত্ব থাকবে এক-তৃতীয়াংশ'। এদিকে এ পরিকল্পনা ইসরাঈল-ফিলিস্তীন পরোক্ষ শান্তি আলোচনা পিছিয়ে দিবে- যুক্তরাষ্ট্রের এমন আপত্তির জবাবে ইসরাঈলী প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু তাদের অবস্থানকে অটল রাখার ঘোষণা দিয়ে বলেন, 'জেরুজালেম নিয়ে আমাদের নীতি গত ৪২ বছরের সব ইসরাঈলী সরকারের মতোই। এর পরিবর্তন হয়নি। আমার জানা মতে, জেরুজালেমে বসতি নির্মাণ তেলআবিবে বসতি নির্মাণের মতোই। এটাকে বিতর্কের বিষয় হিসাবে না অবতরণা করাকেই আমি বেশী গুরুত্ব দেয়া দরকার মনে করি'।

আল-কুদসে ইহুদী সিনাগগ নির্মাণ

আল-কুদস এরিয়ার অভ্যন্তরে আল-আকছা মসজিদ ও বোরাক প্রাচীর থেকে মাত্র ৩০০ মিটার পশ্চিমে ১৫ মিলিয়ন ইউরো ব্যয়ে গত ১৫ মার্চ কল্পিত ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর 'কানিসাতুল খারাব' নামে নতুন একটি ইহুদী সিনাগগের উদ্বোধন করা হয়েছে। সহস্রাধিক দখলদার ইসরাঈলী সৈন্যের উপস্থিতিতে দেশের প্রধান রাব্বী রোফেন রিফলিন, কয়েকজন মন্ত্রী ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণসহ শতাধিক ইসরাঈলী

প্রতিনিধি এ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এ উপলক্ষ্যে আল-কুদস এলাকায় নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। স্থানীয় সামান্য কয়েকজন স্থানীয় অধিবাসী ব্যতীত কাউকে সেখানে প্রবেশ করতে দেয়া হচ্ছে না। ফলে পুরাতন আল-কুদস এলাকা ও প্রাচীন বাজারটি প্রায় পরিত্যক্ত হয়ে পড়েছে। অপরদিকে নবনির্মিত ইহুদী পল্লীটি জনসমাগমে সরগরম হয়ে উঠছে। এদিকে এর প্রতিবাদে হামাস পরদিন ১৬ মার্চ বিক্ষোভ কর্মসূচী পালন করে। একে কেন্দ্র করে ইসরাঈলী সৈন্যদের সাথে সংঘর্ষে ওয়াসেদ আল-কুদ্দূস ও মুহাম্মাদ ইবরাহীম নামে দুই তরুণ নিহত হয়। আহত হয়েছে ১০ জনের মত। গ্রেফতার হয়েছে শতাধিক। ফাতাহ মুখপাত্র আব্দুল কাদের এ পদক্ষেপের নিন্দা জানিয়ে বলেছেন, 'এই সিনাগগ নির্মাণ সাধারণ কোন ঘটনা নয়, এটা হারাম শরীফে ইহুদীরা কল্পিত হায়কালে সুলায়মান নির্মাণের যে ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে তার আনুষ্ঠানিক ধাপ।' অবিলম্বে এটি চরমপন্থী ইহুদীদের আস্তানায় পরিণত হবে বলে তিনি আশংকা প্রকাশ করেন। হামাস আল আকছার অবস্থান রক্ষার্থে সমগ্র ফিলিস্তীনী, আরব ও ইসলামী রাষ্ট্রগুলোকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক দিয়েছে। তারা বলেন, মসজিদে আকছার প্রাচীরের পাশেই এই সিনাগগ নির্মাণের মাধ্যমে ইহুদীরা তাদের কল্পিত তৃতীয় হায়কালের হাজরে আসওয়াদ স্থাপনের অপচেষ্টা চালাচ্ছে।

ইকুয়েডরে ইসলামের প্রসার

দক্ষিণ আমেরিকার দেশ ইকুয়েডরে ইসলামের আগমন ঘটে ওছমানীয় খেলাফতের পতনের পর আরব বংশোদ্ভূত লেবাননী, ফিলিস্তীনী, মিশরী ও সিরীয় মুসলমানদের মাধ্যমে। তবে স্থানীয় অধিবাসীদের ইসলাম গ্রহণ করা শুরু হয় মূলতঃ গত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি থেকে। ১৯৯৪ সালে কুইটো শহরে এ দেশে সরকারীভাবে স্বীকৃত প্রথম ইসলামিক সেন্টারটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এর বর্তমান পরিচালক নওমুসলিম সাবেক সেনা কর্মকর্তা জোয়ান ইয়াহইয়া সুকুইল্ল্যো। মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জনকারী এই ব্যক্তি সর্বপ্রথম প্রকাশ্য ইসলাম গ্রহণকারী ইকুয়েডরিয়ান হিসাবে স্বীকৃত। তার পরিবারই ১৯৯৯ সালে প্রথম ইকুয়েডরিয়ান পরিবার হিসাবে হজ্জব্রত পালন করে। শিক্ষা ও সামাজিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে দেশের কয়েক হাযার মুসলিম অধিবাসীদের এগিয়ে নেওয়ার জন্য তাঁর পরিচালিত এ সেন্টারটি নানা কর্মসূচী গ্রহণ করছে। স্প্যানিশ ভাষায় পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছভিত্তিক বিশুদ্ধ ইসলামী বই-পত্র অনুবাদ করে স্থানীয় জনগণের মাঝে বিতরণ করছে। ২০০৪ সালে ইকুয়েডরের বৃহত্তম শহর ও অর্থনৈতিক কেন্দ্র গাইকুইলে দ্বিতীয় ইসলামিক সেন্টারটি স্থাপিত হয়েছে। যার পরিচালক হিসাবে আছেন জোয়ান আব্দুল্লাহ সঊদ নামের আরেকজন নওমুসলিম।

সুইজারল্যান্ডের কট্টর ইসলামবিরোধী নেতার ইসলামগ্রহণ!

সুইজারল্যান্ডের সুইস পিপলস পার্টির সদস্য জনাব **Daniel Streich** অতিসম্প্রতি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। ইতিপূর্বে তিনি সুইজারল্যান্ডে মসজিদ ও মিনার নির্মাণের চরম বিরোধিতা করে আসছিলেন। বর্তমানে মুসলমান হবার পর সুইজারল্যান্ডে একটি নুতন মসজিদ নির্মাণ করে তিনি তার অতীত পাপ থেকে মুক্তি পেতে চান। ইসলামের বিরোধিতার উদ্দেশ্যে পড়াশুনা করতে গিয়েই তিনি ইসলামের আলোকে আলোকিত হন। তিনি বলেন, 'ইসলাম আমাকে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নসমূহের যুক্তিগ্রাহ্য উত্তর দিয়েছে, যা আমি এতদিন খৃষ্টান ধর্মে থেকে পাইনি'। বিষয়টি সুইজারল্যান্ড সহ সারা ইউরোপে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

সাধারণ জ্ঞান

স্পেনের মুসলিম শাসকবর্গের তালিকা (৭১১-১৪৯২ খৃঃ =৭৮০ বছর)।

উমাইয়া শাসনামল (৭১১-৭৫৬ খৃঃ= ৪৫ বছর)

ক্রমিক	শাসকের নাম	হিজরী সন	ঈসায়ী সন
১	তারিক বিন যিয়াদ	৯৩-৯৪	৭১১-৭১২
২	মূসা বিন নুসায়ের	৯৪-৯৬	৭১২-৭১৪
৩	আব্দুল আযীয বিন মূসা	৯৬-৯৮	২১৪-৭১৬
৪	আইয়ূব বিন হাবীব	৯৮	৭১৬
৫	আল-হোর বিন আব্দুর রহমান আস-সাকিফী	৯৮-১০০	৭১৬-৭১৮
৬	আস-সামাহ বিন মালিক আল-খাওয়ালিন	১০০-১০২	৭১৮-৭২১
৭	আব্দুর রহমান বিন আব্দুল্লাহ আল-গাফেক্বী	১০২	৭২১
৮	আম্বাসা বিন সাহিম আল-কালবী	১০২-১০৬	৭২১-৭২৫
৯	আজরাহ বিন আব্দুল্লাহ	১০৬	৭২৫
১০	ইয়াহইয়া বিন সালমা আল-কালবী	১০৬-১০৭	৭২৫-৭২৬
১১	উসমান বিন আলী উবায়দাহ	১০৭-১০৮	৭২৬-৭২৭
১২	উসমান বিন আবী নাস আল-কাসিমী	১০৮-১০৯	৭২৭-৭২৮
১৩	হুযায়ফা বিন আল আহওয়াজ আল-কায়সী	১০৯-১১০	৭২৮-৭২৯
১৪	মারওয়ান বিন মুআল হাইসাম বিন ওবাইদুল্লাহ আল-কিলাবী	১১০-১১১	৭২৯-৭৩০
১৫	মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আল-আশজী	১১১	৭৩০
১৬	আব্দুর রহমান আল-গাফেকী (দ্বিতীয়বার)	১১১-১১৩	৭৩০-৭৩২
১৭	আব্দুল মালিক বিন আল কাতান আল-ফিহরী	১১৩-১১৫	৭৩২-৭৩৪
১৮	ওকবা বিন হাজ্জাজ	১১৫-১২৩	৭৩৪-৭৪১
১৯	আব্দুল মালিক আল-ফিহরী	১২৩	৭৪১
২০	বাল্‌জ বিন বিশর আল কুশাইর	১২৩-১২৪	৭৪১-৭৪২
২১	সালাবাহ বিন সালামাহ আল আমিলি	১২৪-১২৫	৭৪২-৭৪৩
২২	হুসাম বিন দাররার আল-কালবী	১২৫-১২৭	৭৪৩-৭৪৫
২৩	সু'য়াবাহ বিন সালাম আল হাদ্দানী	১২৭-১২৯	৭৪৫-৭৪৭
২৪	ইউসুফ বিন আব্দুর রহমান	১২৯-১৩৮	৭৪৭-৭৫৬

কর্ডোভায় উমাইয়া আমীর ও খলীফাগণ (৭৫৬-১০৩১খৃঃ = ২৭৫ বছর)

ক্রমিক	শাসকের নাম *(আমীরগণ)*	হিজরী সন	ঈসায়ী সন
১	আব্দুর রহমান আদ- দাখিল	১৩৮-১৭২	৭৫৬-৭৮৮
২	হিশাম বিন আব্দুর রহমান	১৭২-১৮০	৭৮৮-৭৯৬
৩	হাকাম আল-মর্তুযা বিন হিশাম	১৮০-২০৭	৭৯৬-৮২২
৪	আব্দুর রহমান বিন হাকাম	২০৭-২৩৮	৮২২-৮৫২
৫	মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান	২৩৮-২৭৩	৮৫২-৮৮৬
৬	মুনজির বিন মুহাম্মাদ	২৭৩-২৭৫	৮৮৬-৮৮৮
৭	আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ	২৭৫-৩০০	৮৮৮-৯১২
	শাসকের নাম *(খলীফাগণ)*	হিজরী সন	ঈসায়ী সন
৮	আব্দুর রহমান আন-নাসির লি দ্বীনীল্লাহ	৩০০-৩৫০	৯১২-৯৬১
৯	হাকাম আল-মুসতানসির বিল্লাহ	৩৫০-৩৬৬	৯৬১-৯৭৬
১০	হিশাম বিন হাকাম আল-মু'আইয়িদ বিল্লাহ	৩৬৬-৪০০	৯৭৬-১০০৯
১১	মুহাম্মাদ আল-মাহদী	৪০০	১০০৯
১২	সুলাইমান বিন হাকাম আল-মুসতাঈন	৪০০-৪০১	১০০৯-১০
-	হিশাম বিন হাকাম (২য় বার)	৪০১-৪০৩	১০১০-১৩
-	সুলাইমান বিন হাকাম (২য় বার)	৪০৩-৪০৭	১০১৩-১৬
১৩	আলী বিন হামুদ	৪০৭-৪০৯	১০১৬-১৮
১৪	আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মাদ	৪০৯	১০১৮
১৫	আল-কাসিম বিন হামুদ	৪০৯-৪১২	১০১৮-২১
১৬	ইয়াহইয়া বিন আলী বিন হামুদ	৪১২-৪১৩	১০২১-২২
-	কাসিম বিন হামুদ (২য় বার)	৪১৩-৪১৪	১০২২-২৩
১৭	আব্দুর রহমান হিশাম	৪১৪-৪১৫	১০২৩-২৪
১৮	মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান	৪১৫-৪১৬	১০২৪-২৫
-	ইয়াহইয়া বিন আলী (২য় বার)	৪১৬-৪১৮	১০২৫-২৭
১৯	হিশাম বিন আব্দুর রহমান	৪১৮-৪২২	১০২৭-৩১

উমাইয়া শাসনের পরিসমাপ্তির পর স্পেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। নিম্নে উল্লেখযোগ্য শাসকবংশের তালিকা দেয়া হল।

ক্রমিক	শাসনস্থান	শাসকবংশের নাম	ঈসায়ী সন
১	কর্ডোভা	বনু জাহওয়ার	১০৩১-৭০
২	মালাগা ও আলজিসিরাস	বনু হাম্মূদ	১০১০-৫৭
৩	গ্রানাডা	বনু জিরি	১০১২-৯০
৪	আলমেরিয়া,	ক্ষুদ্র শ্লাভ বংশ	১০১৩-১১১৫

	মুরসিয়া, দেনিয়া ও বেলারিক দ্বীপপুঞ্জ		
৫	সারাগোসা	বনু হুদ	১০১০-১১১৮
৬	টলেডো	বনু জুন্নুন	১০৩৫-১০৮৫
৭	সেভিল	বনু আব্বাদ	১০২৩-১০৯১

গ্রানাডার বনু নাসর শাসনামল (১২৩২-১৪৯২ খৃঃ = ২৬০):

নিম্নে উল্লেখযোগ্য শাসকগণের নাম উল্লেখ করা হল-

ক্রমিক	শাসকের নাম	হিজরী সন	ঈসায়ী সন
১	মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ বিন আহমদ বিন নসর (১ম)	৬৩০-৬৭১	১২৩২-৭২
২	আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ (২য়)	৬৭১-৭০১	১২৭২-১৩০১
৩	মুহাম্মাদ (৩য়)	৭০১-৭০৯	১৩০১-০৯
৪	আবুল জায়শ নাসর বিন মুহাম্মাদ	৭০৯-৭১৪	১৩০৯-১৪
৫	আব্দুল ওয়ালীদ ইসমাঈল	৭১৪-৭২৫	১৩১৪-২৫
৬	আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল (৪র্থ)	৭২৫-৭৩৪	১৩২৫-৩৩
৭	ইউসুফ বিন ইসমাঈল	৭৩৪-৭৫৬	১৩৩৩-৫৫
৮	মুহাম্মাদ বিন আল-গণী বিল্লাহ বিন ইউসুফ	৭৫৬-৭৫৯	১৩৫৪-৫৯
১১	মুহাম্মাদ বিন আল-গণী বিল্লাহ বিন ইউসুফ (২য় বার)	৭৬৩-৭৯৩	১৩৬২-৯১
২৪	আবুল হাসান আলী	৮৭০-৮৮৬	১৪৬৫-৮১
২৫	মুহাম্মাদ আবু আব্দুল্লাহ ওরফে বোয়াবদিল	৮৮৬-৮৮৮	১৪৮১-৮৩
২৬	মুহাম্মাদ আজ জাগাল	৮৮৮-৮৯২	১৪৮৩-৮৭
-	মুহাম্মাদ আবু আব্দুল্লাহ ওরফে বোয়াবদিল (২য় বার)	৮৯২-৮৯৮	১৪৮৩-৯২

মিসরের ফাতেমী শাসনামল (৮৯৫-১১৭১ খৃঃ = ২৮১ বছর) :

ক্রমিক	শাসকের নাম	হিজরী সন	ঈসায়ী সন
১	ওবাইদুল্লাহ আল-মাহদী	২৯৭-৩২২	৯০৯-৯৩৪
২	আবুল কাশেম আল কায়েম বি আমরিল্লাহ	৩২২-৩৩৪	৯৩৪-৯৪৬
৩	আবু তাহের আল-মানছূর	৩৩৪-৩৪১	৯৪৬-৯৫৩
৪	আবু তামীম আল-মুইজ লি দ্বীনিল্লাহ	৩৪১-৩৬৫	৯৫৩-৯৭৫
৫	আল-আযীয বিল্লাহ	৩৬৫-৩৮৬	৯৭৫-৯৮৬
৬	আবু আলী আল হাকিম বি আমরিল্লাহ	৩৮৬-৪১১	৯৮৬-১০২১
৭	আয-যাহির	৪১১-৪২৭	১০২১-৩৬
৮	আল-মুস্তানসির বিল্লাহ	৪২৭-৪৮৭	১০৩৬-৯৪
৯	আল-মুস্তা'লী বিল্লাহ	৪৮৭-৪৯৫	১০৯৪-১১০১
১০	আল-আমের বি আহকামিল্লাহ	৪৯৫-৫২৫	১১০১-৩০
১১	আল-হাফেয লি দ্বীনিল্লাহ	৫২৫-৫৪৪	১১৩০-৪৯
১২	আয-যাফের বি আমরিল্লাহ	৫৪৪-৫৪৯	১১৪৯-৫৫
১৩	আল-ফায়েয বি নাছরিল্লাহ	৫৪৯-৫৫৫	১১৫৫-৬০
১৪	আল-আযেদ লি দ্বীনিল্লাহ	৫৫৫-৫৬৭	১১৬০-১১৭১

উত্তর আফ্রিকার (মরক্কো) মুসলিম শাসকবর্গ :

আলমুরাবিতুন (আল্লাহর রাস্তায় সদা প্রস্তুত যোদ্ধার দল) শাসনামল (১০৬১-১১৪৭ খৃ):

ক্রমিক	শাসকের নাম	হিজরী সন	ঈসায়ী সন
১	ইউসুফ বিন তাশফীন	৪৭৯-৫০০	১০৬১-১১০৬
২	আবুল হাসান আলী বিন ইউসুফ	৫০০-৫৩৭	১১০৬-৪৩
৩	তাশফীন বিন আলী	৫৩৭-৫৩৯	১১৪৩-৪৫
৪	ইবরাহীম বিন তাশফীন	৫৩৯-৫৪১	১১৪৫-৪৭
৫	ইসহাক বিন আলী বিন ইউসুফ	৫৪১	১১৪৭

আল মুয়াহহিদূন (তাওহীদপন্থীগণ) শাসনামল (১১৪৬-১২৬৯ খৃঃ) :

ক্রমিক	শাসকের নাম	হিজরী সন	ঈসায়ী সন
১	আব্দুল মু'মিন আল-আন্দালুসী	৫৪১-৫৫৮	১১৪৭-৬৩
২	ইউসুফ বিন আব্দুল মু'মিন	৫৫৮-৫৮০	১১৬৩-৮৪
৩	আবু ইউসুফ ইয়াকুব আল মানছূর বিন ইউসুফ	৫৮০-৫৯৬	১১৮৪-৯৯
৪	মুহাম্মাদ আন-নাসির লিদ্বীনিল্লাহ বিন আল-মানছূর	৫৯৬-৬১০	১১৯৯-১২১৩
৫	ইউসুফ আল-মুসতানসির	৬১০-৬২০	১২১৩-২৪
৬	আব্দুল ওয়াহাব আল-মাখলু	৬২০	১২২৪
৭	আব্দুল্লাহ আল-আদেল	৬২০-৬২৪	১২২৪-২৭
৮	ইয়াহইয়া আল-মু'তাসিম বিল্লাহ	৬২৪-৬২৭	১২২৭-২৯
৯	ইদরীস আল-মামুন	৬২৭-৬৩০	১২২৯-৩২
১৪	আবু 'আলা আদ-দাবলাছ	৬৬৮	১২৬৯

সাম্প্রতিক বাংলাদেশ

১. প্রশ্ন : সুপ্রিমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে বর্তমানে বেঞ্চ সংখ্যা কত?
উত্তর : ৪৮টি (জানুয়ারী ২০১০ পর্যন্ত)।

২. প্রশ : 'পুলিশ জাদুঘর' স্থাপিত হচ্ছে কোথায়?
উত্তর : ঢাকার মিন্টো রোডের মহানগর পুলিশ কমিশনারের পুরাতন ভবনে (১৩ জানুয়ারী ২০১০ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়)।

৩. প্রশ্ন : বাংলাদেশের রেলওয়েতে আন্তঃদেশীয় ট্রেন মৈত্রী এক্সপ্রেসসহ মোট কতটি আন্তঃনগর ট্রেন চলাচল করে?
উত্তর : ৭২টি (বেসরকারীভাবে পরিচালিত ট্রেনের সংখ্যা ৬৩টি)।

৪. প্রশ্ন : বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরীর বর্তমান নাম কি?
উত্তর : সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগার (২১ জানুয়ারী ২০১০ নতুন নামকরণ করা হয়)।

৫. প্রশ্ন : বাংলাদেশে প্রথম কবে, কোন ব্যাংক সূদমুক্ত কৃষিঋণ বিতরণ করে?
উত্তর : ২৩ জানুয়ারী ২০১০; জনতা ব্যাংক লি.।

৬. প্রশ্ন : বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় পাঁচ আসামীর ফাঁসি কার্যকর হয় কবে?
উত্তর : ২৭ জানুয়ারী ২০১০।

৭. প্রশ্ন : জাতীয় পরিচয়পত্রের মেয়াদকাল কত?
উত্তর : ১৫ বছর।

৮. প্রশ্ন : আয়তনে দেশের বৃহত্তম বিভাগ কোনটি?
উত্তর : চট্টগ্রাম।

৯. প্রশ্ন : বর্তমান বিশ্বে বাংলাভাষার অবস্থান কততম?
উত্তর : ষষ্ঠ।

১০. প্রশ্ন : ৬৪ যেলার ওয়েব পোর্টাল (তথ্য বাতায়ন) উদ্বোধন হয় কবে?
উত্তর : ৬ জানুয়ারী ২০১০।

১১. প্রশ্ন : ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ৪১তম থানার নাম কি?
উত্তর : গেন্ডারিয়া।

১২. প্রশ্ন : দেশের ১৮তম প্রধান বিচারপতির নাম কি?
উত্তর : বিচারপতি মোহাম্মদ ফজলুল করিম।

১৩. প্রশ্ন : রাঙামাটি পার্বত্য জেলার দুর্গম জনপদ বাঘাইছড়িতে পাহাড়ি ও বাঙালিদের মধ্যে রক্তাক্ত সংঘাত হয় কবে?
উত্তর : ২০ ফেব্রুয়ারী ২০১০।

১৪. প্রশ্ন : জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিভাগ-এর তথ্য মতে, বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার কত?
উত্তর : ৫০.৫%। উলেখ্য, বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মতে, ৪০%।

১৫. প্রশ্ন : বাংলাদেশের সাথে কতটি দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক রয়েছে?
উত্তর : ১৭৯টি।

১৬. প্রশ্ন : জাতীয় সংসদের কার্যক্রম প্রচার করার জন্য কোন টিভি চ্যানেল হচ্ছে?
উত্তর : সংসদ বাংলাদেশ।

১৭. প্রশ্ন : বাংলাদেশের প্রথম ও একমাত্র বেসরকারী মহিলা ডেন্টাল কলেজের নাম কি?
উত্তর : সাফেনা উইমেন্স ডেন্টাল কলেজ।

১৮. প্রশ্ন : ২০১০ সালে কোন রাষ্ট্রপ্রধান প্রথম বাংলাদেশ সফর করেন?
উত্তর : আব্দুলাহ গুল (তুরস্ক)।

১৯. প্রশ্ন : মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বর্তমান নাম কি?
উত্তর : মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয়।

২০. প্রশ্ন : বাংলাদেশের জনপ্রতি বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ কত?
উত্তর : ১৪৯.৫৪ মার্কিন ডলার।

সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক

২১. প্রশ্ন : ২০১০ সালের ডিসেম্বর-জানুয়ারীতে ইউরোপজুড়ে হওয়া তুষার ঝড়ের নাম কি?
উত্তর : ডেইজি।

২২. প্রশ্ন : ক্যারিবীয় অঞ্চলের দেশ হাইতিতে কবে ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়?
উত্তর : ১২ জানুয়ারী ২০১০।

২৩. প্রশ্ন : বিশ্বের কতটি দেশে তথ্য অধিকার আইন রয়েছে?
উত্তর : ১৫৮টি (বাস্তবায়ন হয়েছে ৭২টি দেশে); জানুয়ারী ২০১০ পর্যন্ত।

২৪. প্রশ্ন : ২০১০ সালের EFA গোবাল মনিটরিং রিপোর্ট অনুযায়ী সার্কভুক্ত দেশের মধ্যে স্বাক্ষরতার হারে শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর : মালদ্বীপ; ৯৭%।

২৫. প্রশ্ন : বিশ্বের উচ্চতম বিমানবন্দরের নাম কি?
উত্তর : বামদা বিমানবন্দর (তিব্বত)।

২৬. প্রশ্ন : অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের অষ্টম মহাসচিব কে?
উত্তর : সলিল শেঠি (ভারত)।

২৭. প্রশ্ন : ২৬ জানুয়ারী ২০১০ পৃথিবী থেকে কোন ভাষাটি হারিয়ে যায়?
উত্তর : 'বো' ভাষা।

২৮. প্রশ্ন : কেন্দ্রীয় শাসন নেই কোন স্বাধীন দেশটিতে?
উত্তর : সোমালিয়া।

২৯. প্রশ্ন : গ্রাহক ও নেটওয়ার্কের দিক দিয়ে বিশ্বের বৃহত্তম মোবাইল কোম্পানী কোনটি?
উত্তর : চায়না মোবাইল।

৩০. প্রশ্ন : ২০১০ সালের বিশ্ব অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সূচক-এ বাংলাদেশের অবস্থান কত?
উত্তর : ১৩৭।

৩১. প্রশ্ন : বর্তমানে বিশ্বে সবচেয়ে বেশী কার্বন নির্গমনকারী দেশ কোনটি?
উত্তর : চীন (দ্বিতীয় যুক্তরাষ্ট্র)।

৩২. প্রশ্ন : পাকিস্তানের সামরিক শক্তি ধ্বংসে ভারত কোন আক্রমণাত্মক মতবাদ গ্রহণ করেছে?
উত্তর : কোড স্টার্ট ওয়ার ডক্ট্রিন।

৩৩. প্রশ্ন : বিশ্বের সর্বাধিক বিদেশী মুদ্রা রিজার্ভের দেশ কোনটি?
উত্তর : চীন।

৩৪. প্রশ্ন : ইথনোলগ : ল্যাঙ্গুয়েজেস অব দ্য ওয়ার্ল্ড -এর মতে, বিশ্বে প্রচলিত ভাষা কতটি?
উত্তর : ৬৯০৯টি।

৩৫. প্রশ্ন : ১৯ ফেব্রুয়ারী ২০১০ উদ্বোধনকৃত ইরানের তৈরী প্রথম যুদ্ধ জাহাজের নাম কি?
উত্তর : জামরান।

৩৬. প্রশ্ন : ৪ জানুয়ারী ২০১০ উদ্বোধনকৃত বিশ্বের সর্বোচ্চ ভবনের বর্তমান নাম কি?
উত্তর : বুর্জ খলীফা (দুবাই, আরব আমিরাত)।

৩৭. প্রশ্ন : ২০১০ সালে ইসলাম ধর্মে বিশেষ অবদানের জন্য কে বাদশাহ ফয়সাল আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করে?
উত্তর : রেসেপ তায়েপ এরদোগান (তুরস্ক)।

৩৮. প্রশ্ন : বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুতগতির ট্রেনের নাম কি?
উত্তর : হারমনি এক্সপ্রেস (চীন)।

৩৯. প্রশ্ন : ১৩ ফেব্রুয়ারী ২০১০ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ওবামা মুসলিম বিশ্বের বিশেষ দূত হিসেবে নিয়োগ দেন কাকে?
উত্তর : রাশাদ হাসান।

৪০. প্রশ্ন : বিশ্বের কোন দেশে সর্বাধিক (১০৪টি) পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্প চালু রয়েছে? উত্তর : যুক্তরাষ্ট্র।

আইকিউ

[কুইজ-১ ও কুইজ-২ এর সঠিক উত্তর লিখে নাম-ঠিকানাসহ ৩০ এপ্রিলের মধ্যে পাঠিয়ে দিন। সর্বোচ্চ উত্তরদাতাদের তিনজনকে পুরস্কৃত করা হবে। -বিভাগীয় সম্পাদক]

কুইজ-১

১. কুরআনের কোন সূরা দুটি ফলের নামে শুরু হয়েছে?

২. কোন শাসকের আমলে কাবা শরীফ বর্তমান ভিত্তিতে স্থাপন করা হয়?

৩. সর্বপ্রথম 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' শব্দটি লিখেছিলেন কোন নবী?

৪. সূরা ফাতিহা ছাড়া আর কোন সূরা শুরু হয়েছে 'আল-হামদুলিল্লাহ দ্বারা?

৫. আল্লাহ সর্বপ্রথম কী সৃষ্টি করেন?

৬. ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলার পূর্বনাম কী ছিল?

৭. স্পেনের পূর্বনাম কী ছিল?

৮. 'জিব্রালটার' প্রণালীর পূর্ব নাম কী?

৯. মৌমাছির চোখ কয়টি?

১০. শব্দের গতির চেয়ে আলোর গতি বেশী- এ তত্ত্বটি প্রথম আবিষ্কার করেন কোন মুসলিম বিজ্ঞানী?

কুইজ-২

১. আল্লাহ্র নিকট বান্দার কোন আমল সর্বাধিক প্রিয়?

ক. ছালাত। খ. পিতামাতার সেবা। গ. জ্ঞানার্জন। ঘ. নিয়মিত আদায়কৃত কোন সৎআমল।

২. আল্লাহ্র পথে দাওয়াত প্রদানের হুকুম কি?

ক. ফরযে আইন। খ.ফরযে কেফায়া। গ. সুন্নাতে মুআক্কাদাহ। ঘ. মুবাহ।

৩. একটি সংগঠন টিকে থাকার জন্য অপরিহার্য শর্ত কী?

ক. নেতৃত্ব ও আনুগত্য। খ. অর্থ। গ. সঠিক কর্মসূচী। ঘ. উত্তম লক্ষ্য-উদ্দেশ্য।

৪. 'বদ্চরিত্র মূলত: তিনটি -অহংকার,লজ্জাহীনতা ও হীনমন্যতা'- কথাটি কে বলেছিলেন?

ক. ইবনু তাইমিয়া। খ. ইমাম গাযালী। গ. ইবনুল কাইয়িম। ঘ. ইবনুল আরাবী।

৫. 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর প্রথম জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কবে?

ক. ৫ ফেব্রু, ১৯৭৮। খ. ৬ এপ্রিল, ১৯৮০। গ. ১২ ফেব্রু ১৯৯১। ঘ. ১৩ মার্চ, ১৯৮৫।

৬. সর্বাধিক মুসলিম বাস করে কোন মহাদেশে?

ক. আফ্রিকা। খ. এশিয়া। গ. ইউরোপ। ঘ. আমেরিকা।

৭. স্পেনের প্রথম মুসলিম শাসক কে ছিলেন?

ক. তারিক বিন যিয়াদ। খ. মূসা বিন নুসায়ের। গ. আব্দুর রহমান আদ-দাখিল। ঘ. মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ।

৮. খ্যাতিমান লেখিকা মরিয়ম জামিলা কত সালে ইসলাম গ্রহণ করেন?

ক. ১৯৩৪। খ. ১৯৫৩। গ. ১৯৬৩। ঘ. ১৯৬১।

৯. বাংলাদেশে কতটি উপজাতি রয়েছে?

ক. ৩৫টি। খ. ৪৫টি। গ.৫৫টি। ঘ. ২৫টি।

১০. বর্তমানে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার কত?

ক. ৪০.৫%। খ. ৩৮%। গ.৪২%। ঘ. ৫০.৫%

(উত্তরের জন্য বর্তমান সংখ্যাটি দেখুন)

গত সংখ্যার আইকিউ -এর সঠিক উত্তর

১. গ, ২. গ, ৩. ক, ৪. খ, ৫. খ, ৬. ক, ৭. ক, ৮. গ, ৯. ক, ১০. ক, ১১. গ, ১২. গ, ১৩. গ, ১৪. ক, ১৫. ক, ১৬. ক, ১৭. ক, ১৮. ঘ, ১৯. গ, ২০. ঘ।

শব্দজট

[শব্দজটটি পূরণ করে নাম-ঠিকানাসহ ৩০ এপ্রিলের মধ্যে পাঠিয়ে দিন। সঠিক উত্তরদাতাদের তিনজনকে পুরস্কৃত করা হবে। এবারের শব্দজটটি তৈরী করেছেন ছাদিক মাহমূদ, ইস.স্টাডিজ বিভাগ,রাবি]

১		২			৩		৪
৫					৬		
			৭	৮			
			৯				
১০		১১			১২		১৩
১৪					১৫		

পাশাপাশি :

১. ইসলামের দ্বিতীয় রুকুন ৩. যা ইসলামী শরীআত সমর্থিত/ বৈধ ৫. মর্যাদা/ মাহাত্ম্য ৬. শিরোভূষণ ৭. বার্তা/ সংবাদ বাহক ৯. বিবাহের পাত্র ১০. স্বর্গোদ্যান ১২. তওবা ছাড়া ক্ষমার অযোগ্য পাপ ১৪. রাত্রী ১৫. দ্বারের আবরণ।

উপর-নীচ :

১. যে আমলের প্রতিদান বান্দাকে স্বয়ং আল্লাহ প্রদান করবেন ২. একটি সূরার নাম ৩. যা ইসলামী শরীআত সমর্থিত নয়/ অবৈধ ৪. ভাল/ কপাল ৭. নতুন ৮. শ্রেষ্ঠ ১০. একটি রুকূ-সিজদাহবিহীন ছালাত ১১. পদ্ধতি ১২. গুরুজন ১৩. প্রতারণা/ শঠতা।

গত সংখ্যার কুইজ ও শব্দজট বিজয়ীরা

প্রথম : ইনামুল্লাহ বিন আব্দুর রহীম
২২০ বংশাল রোড, ২য় তলা, ঢাকা-১১০০।

দ্বিতীয় : মুহাম্মাদ মুয্যাম্মিল হক্ব
২৬৩/২ শেরে বাংলা রোড, খুলনা।

তৃতীয় : মুহাম্মাদ হাবিবুল্লাহ
বান্দাইখাড়া উচ্চবিদ্যালয়, আত্রাই, নওগাঁ।

গত সংখ্যার শব্দজট-এর সঠিক উত্তর

পাশাপাশি: ১. কালেমা ৩. দখল ৪. পয়সা ৫. নয়ন ৭. রাখাল ৮. বর্ষণ ৯. কলম ১০ বল্লম ১২. আলাক ১৩. নশ্বর।

উপর-নীচ: ২. মাদরাসা ৪. পচন ৬. নজরান ৯. কলরব ১১. মশক ১২. আন্দোলন।